ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।

শক্তিশালী সমাজ

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক এবং পরিবেশক :
http://www.shaktibad.net

ইন্টারনেট সংস্করণ :
জানুয়ারী ১৪, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশ :
(প্রথম ভাগ) বঙ্গাব্দ ১৩৫৭ সন, ইং ১৯৫০
(দ্বিতীয় ভাগ) মহালয়া, বঙ্গাব্দ ১৩৫৮ সন
(তৃতীয় ভাগ) বঙ্গাব্দ ১৩৫৮ সন

এই পুস্তক সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত।
মূলকে বিকৃত না করে এর প্রচার সর্বথা প্রশংনীয়।

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর প্রবর্তিত শক্তিবাদ ধর্ম আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। আমরা বিশ্বাস করি, যদি ভারতকে আবার জগৎসভায় হৃত আসন ফিরে পেতে হয়, শক্তিবাদই একমাত্র পন্থা। তাই স্বামীজীর রচনাবলীর রক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা সামর্থ্যমত কাজ করে চলেছি এবং এই লক্ষ্যে তাঁর রচনাবলীর এক বিশুদ্ধ সংস্করণ আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই প্রয়াসেরই অঙ্গ আমাদের এই ''শক্তিশালী সমাজ'' প্রকাশ।

শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আমাদের কাছে সাহিত্য গ্রন্থ বা নীতিকথার পাঠ নয়, বরং এক বিজ্ঞান - মানুষের বিকাশের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান গ্রন্থের মত এর প্রত্যেকটি বাক্যের সত্যতা নিরীক্ষণপূর্বক মননই শক্তিবাদে প্রবেশের একমাত্র পথ। অবশ্যই মননের সীমারেখা আছে। তাই নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শক্তিবাদীয় উপাসনা এবং নিজের জীবনে অধীত সত্যকে প্রয়োগ করার নিরন্তর প্রয়াস না থাকলে একসময় শক্তিবাদ আমাদের জীবন থেকে লুপ্ত হতে বাধ্য।

যেহেতু এ এক বিজ্ঞান গ্রন্থ, তাই প্রথাগত সাহিত্য-দৃষ্টিতে একে মার্জিত করার কোন প্রয়াস আমরা করি নি, বরং স্বামীজীর লিখনশৈলী ও ভাষা আমরা যথাসম্ভব অটুট রেখেছি। প্রথাগত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে স্বামীজীর ভাষার যে কোন বৈচিত্র্য আমরা ''আর্ষপ্রয়োগ'' হিসাবে মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কালের গহন গতিতে আজ যাচাই করা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বামীজীর ইচ্ছাকৃত ''আর্ষপ্রয়োগ'' আর কোন্‌টা বা ''প্রেসের ভূত''। তাই ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সামান্য পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেছি। সম্পাদনা ও পরিমার্জন করার সময় যথাসম্ভব কম কলম চালানোর নীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

সমস্ত তৎসম ও ক্ষেত্রবিশেষে তদ্ভব শব্দের বানান মূলে অশুদ্ধ থাকলে, আমরা শুদ্ধ করে নিয়েছি। যেখানে বিভক্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝাচ্ছে বা অর্থহীন ঠেকছে সেখানে আমরা যথাযথ পরিবর্তন করেছি। সর্বনাম পদ বাংলায় সম্মানসূচক (যেমন - ইনি, ইঁহাদের) ও সাধারণ (যেমন - এরা, ইহাদের) এই দুই রকম হয়ে থাকে। ক্রিয়াপদও সেইমত গঠিত হয়। এই ব্যাপারে কোনও অসঙ্গতিকে আমরা যথাসম্ভব পরিমার্জিত করেছি। ক্রিয়াপদ যেখানে কর্তৃবাচ্যের পরিবর্তে কর্মবাচ্যে আছে বা কর্মবাচ্যের পরিবর্তে কর্তৃবাচ্যে আছে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিধায় কোন কোন স্থানে আমরা ব্যাকরণ মাফিক পরিমার্জন করেছি। কিছু স্থানে যতিচিহ্নের কিছু পরিবর্তনও করা হয়েছে।

এর বাইরে আমরা যে কোন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি, সবই পাদটীকায় ''প্রকাশকের নিবেদন'' বলে প্রকাশ করেছি। ''প্রকাশকের নিবেদন'' বলা না থাকলে সেই সব পাদটীকা মূলগ্রন্থের অন্তর্গত।

স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শক্তিবাদ ভারতের বুকে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। সহস্র বছরের অনাচার দগ্ধ ভারত আবার নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারবে। এই লক্ষ্যে যদি আমাদের প্রয়াস কণামাত্রও সাহায্য করে, আমরা আমাদের সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত -
প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

প্রথম ভাগ

১ম অধ্যায়। সমাজ বিজ্ঞান।
জীবে সমাজ ধর্ম্ম, সমাজ ধর্ম্ম লঙ্ঘনকারী জীব
প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধ দেশ ও শক্তিশালী সমাজ
তিন প্রকার সমাজ, সমাজ সংস্কারক, উপাসনা
সমাজবাদ ও প্রচার, সমাজ প্রবর্ত্তক, বিক্ষোভ, নেতা
দুর্ব্বলবাদী খৃষ্টসমাজ ও উহার পরিণতি
মহম্মদ প্রবর্ত্তিত আসুরিক সমাজ ও ইতিহাস
মনু প্রবর্ত্তিত শক্তিশালী সমাজ ও ইতিহাস
শক্তিবাদরাষ্ট্র গঠন, পঞ্চায়েত ও ডেমোক্রেসী
রাজা ও রাষ্ট্রপতির শিক্ষা, ধনীর রাজ্য
অসুরবাদী রাষ্ট্রপতি ও পৌরোহিত্যবাদী মন্ত্রী
কর্ম্মভেদ ও উপাসনা ভেদ
ব্রহ্মণ্যবাদ, পৌরোহিত্যবাদ
পুরুষোত্তমবাদ, অসুরবাদ, সমাজপালন
শোষণবাদ, কায়িক কর্ম্মবাদ, শক্তিবাদ
শক্তিবাদই শ্রেষ্ঠ, দুর্ব্বল ও অসুর রাষ্ট্রপতি
কংগ্রেস, গান্ধি ও শক্তিবাদ নীতি
ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম ও শক্তিবাদ রাষ্ট্র

২য় অধ্যায়। মনোবিকাশে বিভিন্ন স্তরের চিন্তাধারা
গণেশ স্তরের চিন্তাধারা কম্যুনিজম
গণেশবাদ ও গণবিপ্লব, মূষিক
কম্যুনিজম্, ম্লেচ্ছপ্রীতি, হিন্দুবিদ্বেষ
সূর্য্যস্তরের চিন্তাধারা, পৌরোহিত্যবাদ, ভাববাদ
মুসলীম তোষণের ঠিকেদারী শক্তিবাদের শত্রুতা
কোন কোন বয়স সূর্য্যস্তরের বিকাশ
বর্ত্তমান ভারতে সূর্য্য ও শক্তিস্তর। বিষ্ণুস্তর
স্বাভাবিক, আসুরিক ও অপুষ্ট বিষ্ণু

সমাজ ও বিষ্ণুস্তর
অসুর, স্বাভাবিক ও দুর্ব্বল সমাজ গঠন বিজ্ঞান
শক্তিবাদীয় উপাসনার প্রবর্ত্তন। শিবস্তর
শিব ও সূর্য্যস্তরের মহাপুরুষে ভেদ
নিম্নশিব। শক্তিস্তরের চিন্তাধারা
মিশ্রিত শক্তিস্তর, শুদ্ধ শক্তিস্তর, অবতার
৪।০ হইতে ১৬ কলার বিকাশ ও সকলের মিশ্ররাষ্ট্র
৩য় অধ্যায়। সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক
ষ্টেট
অহিংস রাষ্ট্রের স্বরূপ। আল্লার রাষ্ট্র
রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্র। শক্তিবাদহীন রাষ্ট্র সমস্যা। ধর্ম্ম
ঋষিদের সমাজ সেবার আদর্শ। তোষণবাদী সাধু
দার্শনিক ধর্ম্ম পৌরোহিত্যবাদ ইসলাম
সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার। বিবাহ। বর্ণভেদ
সোসিয়ালিজম ও বাধাহীন ভোগবাদী বিবাহ
লিঙ্গকাটা সংস্কার। অশৌচ, উচ্ছিষ্ট, যোগসংস্কার
শিক্ষা। মানব ও অন্যান্য জীবে শিক্ষা
বিচার ব্যবস্থা
বৈজ্ঞানিক উৎসাহ, বিজ্ঞান শক্তির প্রয়োগ
কর্ম্মবণ্টন, বৃহৎ শিল্প, কর্ম্মব্রহ্ম, ষ্টেট কর্ত্তৃত্ব
৪র্থ অধ্যায়। বর্ণাশ্রম সমাজের কথা
রাজা ও ঋষি
পৌরোহিত্যবাদ, শম্বুকের তপস্যা, শবরী, সীতা
নারীরক্ষায় পৌরোহিত্যবাদ, মহাভারতে শক্তিবাদ
পরীক্ষিতের মৃত্যু ও পৌরোহিত্যবাদ
হিন্দুসমাজে পৌরোহিত্যবাদ সম্বন্ধ
শূদ্র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ শূদ্র, মনু
আদি মানব ও নৃকঙ্কাল বিজ্ঞান, বর্ণাশ্রম
ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানশক্তি শর্ম্মণ্
ক্ষত্রিয় বর্ম্মণ্, বৈশ্যগুপ্ত, শূদ্র, কর্ম্ম সমস্যা
ব্রহ্মচর্য্য
নেতার অভাবে হিন্দুর সর্ব্বনাশ
ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী
দন্ত রক্ষা, চক্ষু রক্ষা
সর্ব্বরোগ নাশক ক্রিয়া, শয়নে দিক নির্ণয়
মুখের লাবণ্য, রুচিবিজ্ঞান, উপাসনা, পৌরোহিত্যবাদ
শক্তিবাদীয় উপাসনা

ব্রহ্মনাড়ী
গায়ত্রী, ব্রহ্মস্তুতি, মহামন্ত্র ও অর্থ
সরস্বতী
সহশিক্ষা
গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থাশ্রম
সন্ন্যাস, সন্ন্যাসীর সহিত ব্যবহার
পঞ্চম অধ্যায়। অসুরবাদ
মিথ্যা ইতিহাস
আদিপিতা ঋষি
চারবর্ণ ও ব্রহ্মণ্যবাদ
পৌরোহিত্যবাদ ও আসুরিকতা
বৈশ্য ও শোষণ আসুরিকতা
শ্রমজীবি ও আসুরিকতা
খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজ। আসুরিকতা
কেন্দ্রীয় শাসন ও আসুরিকতা
অসুরবাদ ও উহার সমর্থক অসুরবাদ

দ্বিতীয় ভাগ

ষষ্ঠ অধ্যায়। বেদ ও শক্তিশালী সমাজ
বেদ বিচারে মীমাংসা শাস্ত্র
দেবাসুর মনোবিজ্ঞানে বেদ ও গীতা। বৈদিক যুগের সমাজ
বেদের শক্তিবাদীয় নির্দ্দেশ। তেজ, সহনশীলতা, বল, আয়ু,
সমাজ পালন, অসুরনাশ, অভয়, কর্ত্তব্যে ধর্ম্মনিষ্ঠা, নেতার লক্ষণ
উপনিষদে শক্তিবাদিতা। সমাজ বিপ্লবজ্ঞান। রাষ্ট্র পরিচালনে
ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজনীয়তা
আচার্য্য শঙ্করের পর উপাসনা বিভ্রাট ও ভাববাদে ভারতের সর্ব্বনাশ
ব্রহ্মজ্ঞানের পথে সব বৃত্তিকর্ম্মই জ্ঞানের অনুকূল
বেদবাদীয় সমাজ ও মনুর সমাজের ভেদ
বাংলায় হরিঃ ওঁ। সতীবাদ, শ্রাদ্ধ, সতীজীবন, শক্তিবোধন,
রঘুনন্দন ও চৈতন্য
বেদের মতে মানুষই দেবতা। দেবতা-বংশাবলী শর্ম্মা, বিষ্ণু, বসু,
রুদ্র, দে, দেব, আদিত্য, সোম, ব্রহ্ম, ঘোষ, বর্দ্ধন, মিত্র, শূর, রায়,
চন্দ্র, ভদ্র, সুর, সেন, মিত্র, বিশ্বকর্ম্মা, দাস, বল, সিংহ
বাংলায় বৈদিক সভ্যতা

সপ্তম অধ্যায়। শক্তিশালী সমাজ পৌরোহিত্যবাদ
বেদ ও শাখাবিভাগ, ব্যাসদেব, পৌরোহিত্যবাদ নীতি
বৌদ্ধদের অহিংসা, পুরোহিত মারার উপায়, বেদ নিন্দা,
বৌদ্ধবাদের মৃত্যুবাণ
উপনিষদেই বৌদ্ধবাদ বিদ্যমান। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ বেদবাদে আসিয়া
কর্ম্মহীন হন
অহিংসা অস্ত্রে পুরোহিত মারার প্রতিশোধে শঙ্কর ও পুরোহিত। কাশী,
পুনা, নবদ্বীপ
বেদাধিকারে সাম্যবাদ
নারীর বেদাধিকার ও সন্ধ্যোপাসনা
বংশগত বৃত্তি প্রবর্ত্তনে সমাজ কল্যাণ
অষ্টম অধ্যায়। শক্তিশালী সমাজে ভাববাদ
পৌরোহিত্যবাদ রক্ষণে ভাববাদ ও সমাজের সর্ব্বনাশ
ভাববাদীরা হরিনামের আড়ালে সমাজকে অপদার্থের পদসেবা
ও তোষণ করিয়াছে। রঘুনন্দনের শূদ্রবাদের সমর্থনে দাসবাদ
দাশ দার্শনিকতা অযৌক্তিক
ভাববাদীদের অশাস্ত্রীয় ও বিকৃতদীক্ষা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য
ধর্ম্ম সমন্বয় ও মহাপুরুষের নামে মিথ্যা প্রচার। গীতা ও সর্ব্ব
ধর্ম্ম। আল্লাবাদ, হুর ও গুণ্ডাবাদ
গুণ্ডার তোষণ ও নরনারায়ণ সেবা। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে না কি
বর্ব্বরের পদতলে। ব্রহ্ম ও আল্লাবাদ
রামধুনে আল্লা, ঈশ্বর, রাম, সীতা, ও আল্লানী
জনাব ও শ্রী। অহিংসায় প্রহ্লাদ ও নৃসিংহ স্তুতি
ভাববাদ হইতে পৌরোহিত্যবাদ শ্রেষ্ঠ
নবম অধ্যায়। শক্তিশালী সমাজে বৌদ্ধবাদ
বুদ্ধদেব ও তারা উপাসনা
বুদ্ধিবাদী প্রাচীন সম্প্রদায়
সাধনা সিদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রচারে মতভেদের কারণ
শক্তিবাদ, বৌদ্ধবাদ, ভাববাদ ও ব্রহ্মণ্যবাদীয় সমাজজ্ঞান
বৌদ্ধসাধনা ও তান্ত্রিক সাধনা
গীতা ও বৌদ্ধবাদ
উত্তরগীতা ও বৌদ্ধবাদ
বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধবাদ, যোগদর্শন ও বৌদ্ধবাদ
তন্ত্র শাস্ত্র ও বৌদ্ধবাদ
সগুণ ব্রহ্ম ‘‘শিব ও বিষ্ণু’’ এবং বৌদ্ধবাদ
আচার্য্য শঙ্কর ও বৌদ্ধবাদ। উপনিষদ ও বৌদ্ধবাদ

শক্তিবাদের দৃষ্টিতে বেদবাদ, বুদ্ধিবাদ, শক্তিবাদ, ব্রহ্মবাদ
ও ভাববাদ
মহাযানী ও হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়
দশম অধ্যায়। হিন্দু ধর্ম্মে ধর্ম্ম সংস্কার ও উন্নত বিকাশ বিজ্ঞান
গর্ভাধান রহস্য। বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য কথা
বিবাহ ভোগ এবং সৃষ্টি
গর্ভাধানে যজ্ঞেশ্বর - বায়ু
বাল্য বিবাহ ও রজঃ সংস্কার
পুংসবন বিজ্ঞান ও হোমে চন্দ্র দেবতা
সীমন্তোন্নয়ণ বিজ্ঞান। যজ্ঞেশ্বর - শিব
জাতকর্ম্মবিজ্ঞান। শ্বশুর মন্দির সেবক সন্তান। কুষ্ঠী
যজ্ঞেশ্বর - প্রগলভ দেবতা
নামকরণ বিজ্ঞান। যজ্ঞেশ্বর - পার্থিব দেবতা
নিষ্ক্রামণ রহস্য। কন্যাগণে নিষ্ক্রামণ নিষিদ্ধ
অন্নপ্রাশন বিজ্ঞান। যজ্ঞেশ্বর - ‘‘শুচী’’
চূড়াকরণ। যজ্ঞেশ্বর - সত্য
ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দু ও অহিন্দু
কর্ণবেধ বিজ্ঞান। সংস্কারই অধ্যাত্মবাদ। জড়বাদীরা মূর্খ
বিদ্যারম্ভ বিজ্ঞান। বর্ণমালাই সরস্বতী
বর্ণমালা শিক্ষার বিজ্ঞান। হাম্বারবের ভাষা। ইংরেজী বর্ণমালায়
২৬টী, আরবী বর্ণমালায় ৩৭টীর আলোচনা
বিদ্যারম্ভে বর্ণমালা নির্ব্বাচন বিজ্ঞান
মানুষে ও অন্য জীবে ঘণ্টিকা গঠন
বিকৃত ধ্বনির বর্ণমালা। বালকের শৌচ শিক্ষা
উকুন, ছারপোকা ও কৃমি
উপনয়ন বিজ্ঞান। যজ্ঞেশ্বর - সমুদ্ভব। কুষ্ঠী প্রস্তুত
কন্যাগণে গায়ত্রী দীক্ষা
সন্ধ্যোপাসনা, যজ্ঞসূত্র
বেদারম্ভ। বিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষায় কুফল
সমাবর্ত্তন
বিবাহ। যজ্ঞেশ্বর - যোজক। দাম্পত্য জীবনের নীতি
বিবাহে রায় বিজ্ঞান। পণ গহণা
বিবাহে স্ত্রী আচার। পণ প্রথায় দণ্ড
বিধবা, বিধবার বিবাহ, সংস্কার কার্য্যে ব্যয় সঙ্কোচ
বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস
তান্ত্রিক সংস্কার আলোচনা। বেদ ও তন্ত্র। ক্রান্তা জ্ঞান। তন্ত্রের
প্রচার

সগুণ ব্রহ্ম ও পঞ্চায়েৎ উপাসনা, ত্রিগুণ ও পঞ্চতত্ত্ব
বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষার লক্ষ্য ভেদ
সন্ধ্যোপাসনায় সময় জ্ঞান
শাক্ত দীক্ষা। তত্ত্ব দীক্ষা কেন?
সমাজের পতন। সাম্প্রদায়িক দীক্ষা। অবতার ও মহাপুরুষ উপাসনা
পূর্ণ দীক্ষা। ক্রম দীক্ষা
আচার বিজ্ঞান। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার
কালবৈশাখী। দক্ষিণাচার। সিদ্ধান্তাচার, স্থফী, সহজীয়া বামাচার,
বৌদ্ধবাদ। অঘোরাচার, চীনাচার। যোগাচার, কৌলাচার
সাম্রাজ্য দীক্ষা। মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা
যোগ দীক্ষা। মহাপূর্ণ দীক্ষা। বিরজা সন্ন্যাস
মঠ, আচার্য্য ও সাধনার ধারা
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির আচার্য্য (গৌড়পাদ)
শঙ্করের আবির্ভাব কখন? ব্যক্ত ও অব্যক্ত মঠ
গোবর্দ্ধন, সারদা, জোসী, শৃঙ্গেরী মঠ
অব্যক্ত মঠ - স্থমেরু, গুপ্ত মঠ, আনন্দমঠ
শক্তি উপাসনা ও ভাবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন
দণ্ডী, পরমহংস, বিবিদিষা ও বিদ্বৎ সন্ন্যাস
গোঁসাই জাতি, বৈষ্ণব জাতি। ইহাদের সংস্কার
ত্রিসন্ধ্যা ও মহাসন্ধ্যা
নব রাত্রি ও দুর্গোৎসব। দীপাবলি
কোজাগর পূর্ণিমা। পৌষ সংক্রান্তি
বসন্ত পঞ্চমী। মহাবিষুব সংক্রান্তি
গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব পূজার সন্ধি। অবতার পূজা
৫১ পীঠস্থান ও তীর্থ স্থান
ব্রহ্মণ্যবাদ ও পুরুষোত্তমবাদ
মৃত্যুকালীন সংস্কার
মৃতের সংস্কার। অশৌচ বিধান
শ্রাদ্ধ - শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ
তর্পণ, গয়ার পিণ্ড
রাষ্ট্র ভাষা, হিন্দীর সংশোধন
হিন্দীর অবৈজ্ঞানিক লিখন
বর্ণমালা তন্ত্র
লেখা ও পড়ার বর্ণমালা
বাংলা লেখায় সংশোধন
সরল সংস্কৃত
সংস্কৃত জীবন্ত ও মৃত ভাষা

তৃতীয় ভাগ

একাদশ অধ্যায়। শক্তিশালী সমাজে কুরাণবাদ

মহম্মদ ও লেলিন
বেদ ও কুরাণ। ত্যাগ ও লুণ্ঠন
আর্য্য শাস্ত্র ও যবন
আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা ও কুমারী পূজা
ভারত ভাগ ও যবনবাদ
নমাজ, আল্লাহ্ ও ঈশ্বর
কুরাণে ইমানদার লক্ষণ
আল্লাহ্ মিঞার কাফের বিদ্বেষ
বহিস্তে সুখ দুঃখ
কাফেরের নিকট আল্লার পরাজয়
আল্লাহ্র ও কাফেরের শত্রুতা
কিবলা ও শিবের মন্দির
আসমান। আল্লাহ্ ও ধারের ব্যবসা
ফরিস্তেদ্বারা আল্লাহ্র সাহায্য
আল্লাহ্ ও লুটের সর্দ্দার
আল্লাহ্ ও ঝগড়ার রাজা
সত্যভঙ্গ করিতে আল্লাহ্র আদেশ
রমজান ও ব্যাপক হত্যার আদেশ
কাবার মন্দিরের ইতিহাস। মূর্ত্তিপূজা
আরবে তান্ত্রিকধর্ম্ম, হুলা, আলম্, বম্
হজর অল অস্বদ
মক্কায় হিন্দু তীর্থের প্রমাণ
কাফেরদের শিরচ্ছেদ কর
মহম্মদের পুত্রবধূ বিবাহ
ক্রীতদাসী ও ভার্য্যা। শাহ্জাহান
বাহাত্রামি। কাফেরদের সঙ্গে ঝগড়া
আল্লাহ্ শয়তান সংবাদ
মহম্মদ সাহেবের বিবি ও সম্ভোগ
স্বামী বিবেকানন্দ ও কুরাণবাদ
মহম্মদকে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ

দ্বাদশ অধ্যায়। বাদ্যাতঙ্ক সমস্যা

বিদ্বেষ রোগ
বাদ্যধ্বনি। বেদ, জ্ঞান, ছন্দ, গন্ধর্ব্ববিদ্যা, সমাধি

পূজায় বাদ্যধ্বনি ও অসুর নাশ
ত্রয়োদশ অধ্যায়। বাইবেলবাদ
কুরাণ ও বাইবেল, গড্ ও গণেশ
সৃষ্টিকথা, আদম ও শয়তান
আব্রাহামের লিঙ্গবলি। মনু, নূহ, শিব-পূজন
গড্ ও মূর্ত্তি তোড়ক উপদেবতা
লুণ্ঠন, নরহত্যা, নারী ও শিশু হত্যার বর্ব্বরতা, বিদ্বেষ ও গড
যোহন বাক্য, গডের দাস, স্বর্গের শূদ্র, খৃষ্টবাদ ও রাজনীতি। দুইটী
অসুরবাদে ভারত অবরুদ্ধ
রুটীবাদ ও কম্যুনিজম। অসুরবাদ
শ্রীঅরবিন্দ ও খৃষ্টবাদ

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

শ্রীগুরু পূজা

বাবা,

সে আজ প্রায় ২৬/২৭ বৎসরের কথা। আপনি আমার মুখের উপর নৈরাশ্যের ছায়া দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন। এবং মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন - ''তোমার ভাবান্তর কেন?'' চিরদিন হাসি, উৎফুল্ল ও উৎসাহে ভরপুর থাকিতাম কিন্তু সেই সময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল নিরাশার বিষাদরূপ। সেই মুহূর্ত্তেই আপনার প্রশ্ন। আমি বলিলাম ''পত্রিকায় দেখিলাম মুসলমানেরা অনাচার অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।'' সেই সঙ্গে মনে জাগিতেছিল ''এক হাজার বৎসরের দুর্নীতির ইতিহাস।'' আপনি মনের সব কথাই যেন দেখিতে পাইতেছিলেন। চুনারের বনের মধ্যে সেই নির্জ্জন পবিত্র আনন্দমঠের অশ্বত্থ মূলে, উভয়েই দাঁড়াইয়া। আপনি বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন - ''শুন, ব্যাপারতো খুবই মর্ম্মস্পর্শী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একদিন এইরূপ ব্যাপারে ম্রিয়মাণ হইয়াছিলাম এবং বসিয়া গভীরভাবে ভাবিতেছিলাম। ভাবিতে ভাবিতে ধ্যানে ডুবিয়া গেলাম! একটা দৃশ্য অন্তর জগতে ফুটিয়া উঠিবার পর ধ্যান শেষ হইল। দেখিলাম, বহু রক্তারক্তি ও অশান্তির পর এমন একটা স্থিতি আসিল যে সব মুসলমানেরা হিন্দু হইয়া গেল এবং সব অশান্তির মীমাংসা হইয়া গেল। আমি জানি, এমন দিন আসিবে যে দিন এদেশের মুসলমানেরা সব হিন্দু হইয়া যাইবে এবং এই অশান্তিও থাকিবে না।'' ইহার পর উভয়েই নীরব। এই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জীবনে একটি কথাও হয় নাই। এক বিরাট জমাট জ্যোতি অনুভূতিতে অনেক সময়ই প্রকাশিত থাকিত। আমার সব প্রেরণা ও সব জ্ঞান ঐ জ্যোতি হইতে আসিত। উহা যে বহু জ্ঞান ও বহু কর্ম্মের প্রেরণাময় ''আত্মা'' ইহা আমি বুঝিতে পারিলেও আমি উহার প্রেরণাকে কর্ম্মে দাঁড় করাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। আপনি অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিতেন - ''কিরূপ বোঝ?'' আমি মাত্র একদিন বলিয়াছিলাম - ''তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিলে প্রচলিত সব ধর্ম্মের সঙ্গে টক্কর আসিবে এবং তাঁহার প্রকাশে বহু মতবাদ বিলুপ্ত হইবে''। আপনি লিখিবার কথা বলিতেন - কিন্তু আমি কর্ম্মের দিকে যাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। যাহা হউক সেই অশ্বত্থমূলের মহানস্মৃতি আমার অন্তরে সমানভাবেই জাগ্রত আছে। সেই ঘটনার পর সহস্র সহস্র মর্ম্মস্পর্শী অনাচার, অত্যাচার, অবিচার, সতীর অপমান, নারীর নির্য্যাতন, কুমারীর উপর পশুত্ব, সঙ্ঘবদ্ধ পাশবিক অত্যাচারে নারীর মৃত্যু, শিশুর নিষ্ঠুর হত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, দেবমূর্ত্তির বিধ্বস্তি, গ্রামের বিধ্বস্তি কত সব ঘটনা দেখিলাম; কিন্তু দেখিলাম না শুধু আপনার ঐ ''বাণীর আত্মাটি''। উহাকে দেখিব বলিয়াই এই পূজার আয়োজন। আজ মনে হয়, সেই

স্বয়ম্ভুবের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি একভাবেই বিদ্যমান আছি এবং আমার চক্ষের সামনে এই স্থমহান জাতের উত্থান পতন হইয়া চলিয়াছে। সেই ইতিহাস আহরণ করিয়া এই পত্রপুষ্পের ডালি সাজাইয়াছি। আজ জন্ম দিনে শ্রীপাদপদ্মে ইহাই পুষ্পাঞ্জলি। ইহা আপনার বাণীরই পরিণতি। হে স্থমহান জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎরূপধারী বিশ্বরূপ! হে স্থমহান! আপনার সেই "বাণী" এবং সেই জ্যোতি আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এখন আর আমার সেইরূপ অবাধ্য প্রকৃতি নাই। আজ অর্জ্জুনের ভাষায় আমিও বলিতেছি "করিষ্যেবচনং তব"। আশীর্ব্বাদ করুন সহস্র বৎসরের অনাচার দগ্ধ ভারত যেন নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লয়। ইহা যে সমাজজীবনের শক্তিশালী বিপ্লব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ বিপ্লব শ্রীবুদ্ধ শ্রীশঙ্করের দেশে মোটেই নূতন নহে। এবার প্রণত হই "ওঁ মন্ত্র সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবনিরঞ্জনঃ। গুরুর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরমং পদং॥"

বিন্ধ্যক্ষেত্র। মকরসংক্রান্তি
বঙ্গাব্দ ১৩৫১॥ কলের্গতাব্দা ৫০৪৫॥

প্রণতঃ -
সত্যানন্দ

গ্রন্থ রহস্য

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৩
গীতা অধ্যায় ৪॥

এই অব্যয় যোগ (আত্মস্বরূপ) আমি বিবস্বনকে বলিয়াছিলাম। বিবস্বন্ এই যোগ মনুকে বলিয়াছিলেন। মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন। ১॥

এইভাবে পরম্পরা ক্রমে রাজর্ষিগণ ইহা জানিয়াছিলেন। হে পরন্তপ, মহান কালগতিতে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ২॥

এই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বলিতেছি কারণ তুমি আমার বন্ধু ও ভক্ত। এই যোগ অতীব রহস্যপূর্ণ। ৩॥

টিপ্পনী। এখানে শ্রীকৃষ্ণ যোগবিজ্ঞানের কথা বলিতেছেন। ইহা কর্ম্মযোগ বিজ্ঞান। ইহা অতীব প্রাচীন। আমরা এই গ্রন্থে সেই কর্ম্মযোগ বিজ্ঞানের কথাই বলিব। গীতার কর্ম্মযোগ বিজ্ঞান আমাদের সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিলুপ্তই ছিল। অর্জ্জুনও ইহা জানিতেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আত্মবিজ্ঞান প্রভাবেই ইহা জানিতেন। উহা আবার দাঁড় করাইবার জন্য শক্তিশালী সমাজ নামক গ্রন্থ বলা যাইতেছে। সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এক এক সময় ইহা শুনিয়াছিলেন। আমরা আমাদের সমাজকেই এই যোগ বিধান বলিতেছি। ভারতরাষ্ট্র ও ভারতসমাজ আমাদের অতীব প্রিয়। কাজেই ইহাকে শক্তিশালী করা আমাদের কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন যে ভাবে কর্ম্ম ও দায়িত্বকে উপেক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইভাবেই আজ আমাদের সমাজও কর্ম্মযোগ বিজ্ঞান হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। বেদবাদ, গীতাবাদ ও শক্তিবাদ একই মতবাদের বিভিন্ন নাম। আমরা শক্তিশালী সমাজে বেদবাদেরই ভিত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের এই চেষ্টা যুগোপযোগী। ইহা পাঠকগণ ইহাতে প্রবেশ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সূর্য্য যে এই যোগবিধান নিজের আত্মার কাছেই শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই কথা শ্রীকৃষ্ণ ''অহম্'' শব্দ দ্বারা খুব স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন মানব বিকাশের পূর্ণস্তরে আসিলে

তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত সমাজবাদ গীতাবাদের ভিত্তিতে হইবে। এই গ্রন্থে বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সমাজগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। এই শতাব্দীর সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে শক্তিশালী সমাজ আমাদের কর্ম্ম-রহস্যের অনেক জটীল বিষয় মীমাংসা করিয়া দিবে। শক্তিবাদ, বৌদ্ধবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ, পৌরোহিত্যবাদ, খৃষ্টবাদ, ডেমোক্রেসী, সোসিয়ালিজম্, কম্যুনিজম্ সব মতবাদই আত্মবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান। পাঠকগণ গ্রন্থে প্রবেশ করিলে সব বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

সমাজ বিজ্ঞান

সমাজ কাহাকে বলে?

১। সমষ্টি জীবনের নাম সমাজ। শক্তিশালী চিন্তা-বিজ্ঞানে সমষ্টি জীবন নিয়মিত হইলে, উহার নাম হয় শক্তিশালী সমাজ।

২। কতকগুলি সংস্কারে আবদ্ধ থাকিয়া মানুষ সমষ্টি জীবন যাপন করে। কিছুটা সত্য, কিছুটা মিথ্যা, কিছুটা বৈজ্ঞানিক, কিছুটা অবৈজ্ঞানিক, কিছুটা ভাল, কিছুটা মন্দ, কিছুটা প্রয়োজনীয়, কিছুটা অপ্রয়োজনীয়; এইরূপ অনেক সংস্কারবদ্ধ নিয়মে মানুষের সমষ্টি জীবন নিয়মিত হইয়া থাকে। সমষ্টি জীবন যাপনে মানবে প্রাকৃতিক বিধান রহিয়াছে। সমষ্টি জীবন ত্যাগ করিয়া মানুষের জীবন অসম্ভব। কাজেই মানুষ মাত্রই সমাজ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট জীব।

৩। মানবেতর জীবগণও সমাজ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। প্রত্যেক স্তরের জীবেই সমষ্টিগতভাবে প্রস্ফুটিত কতগুলি নিয়ম বা সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সংস্কারগুলি বা নিয়মগুলি সেই স্তরের জীবের সমাজধর্ম্ম।

৪। কেবল জড়াইয়া গোলাইয়া একত্র থাকাটাকেই কেহ যেন সমাজ-ধর্ম্ম বুঝিয়া ভুল না করেন। কতগুলি সাধারণ নিয়ম একই স্তরের জীবসমষ্টির স্বভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিয়মগুলি সেই জীবসমষ্টির সমাজ-ধর্ম্ম। জড়াইয়া গোলাইয়া থাকুক বা না থাকুক একই সাধারণ সংস্কারে নিয়মবদ্ধ জীবন সমষ্টিই একটি সমাজ।

৫। প্রত্যেক স্তরের সমাজসংস্কার বদ্ধ জীবসমষ্টিতে দুই একটি জীব থাকিতে পারে যাহারা সেই স্তরের সমাজ ধর্ম্মকে যথেষ্ট অমান্য করিয়া চলে, কিন্তু ইহা দ্বারা সেই সমষ্টি জীবনের কোন বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে না, কাজেই সমাজধর্ম্মের সাধারণ নিয়ম ইহাদ্বারা ব্যতিক্রম হইল, বলা যায় না। আমরা প্রত্যেক সূত্রের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকের আকার বৃদ্ধি করিব না। যাহা সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম উহাই বলা হইল।

৬। যে সব নিয়মে মানুষের সমষ্টিজীবন নিয়মিত হয় সেই সব সংস্কারগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, মানুষের জন্য মোটামুটি তিন প্রকারের সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে। ইহারা শক্তিশালী সমাজ, আসুরিক সমাজ ও দুর্ব্বল সমাজ।

৭। যে কোন প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে (দেশে) সে স্থানের জনসমষ্টি দ্বারা একটি শক্তিশালী সমাজ গড়িয়া উঠিবে - ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। যে স্থানে এইরূপ গঠন হয় না

সেইখানে সমাজের উপর ভীতরী ও বাহিরী* বিক্ষোভ বার বার আসিতে থাকিবে; ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম।

৮। একটা প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে যাহাতে শক্তিশালী কর্ম্মবিজ্ঞানে একটা শক্তিশালী সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে, এ জন্য সেই স্থানের অধিবাসীদের সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এই জন্য সমাজ সংস্কারকগণকে দুইটী বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। (১) আসুরিক সমাজ বিজ্ঞান যাহাতে কোনও প্রকারে প্রশ্রয় না পায় এ জন্য চেষ্টা করা। (২) দুর্ব্বল সমাজ বিজ্ঞান যাহাতে প্রশংসিত না হয় এ জন্য অবহিত হওয়া।

৯। মানুষের মনোবিজ্ঞানে দুর্ব্বল স্তরের নীতি-বিজ্ঞান ও আসুরিক স্তরের নীতি বিজ্ঞানের অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক প্রভাব আছে। দুর্ব্বল স্তরের নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে যশ জড়িত থাকে বলিয়া একদল শিক্ষিত জনসমষ্টি উহাতে আকৃষ্ট হয়। আসুরিক নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে স্বার্থের ও ভোগের সুবিধা থাকে বলিয়া ভোগী ও সুবিধাবাদীরা উহাতে জড়াইয়া যায়। ইহাদিগকে যশ ও ভোগের লিপ্সা হইতে কঠোর দণ্ড ভিন্ন ফিরাইয়া আনা যায় না। কাজেই আসুরিক ও দুর্ব্বল স্তরীয় সমাজ, শক্তিশালী সমাজের ভীষণ ক্ষতি করে। যতদিন যশের আনন্দ ও ভোগের সুবিধার ক্ষেত্র থাকে ততদিন দুর্ব্বল ও অসুরবাদীদের বদলাইবার আশা নাই। অতএব শক্তিশালী সমাজ সংস্কারকগণ দুর্ব্বল ও অসুরবাদীয় সমাজ বুঝিতে চেষ্টা করিবেন এবং শক্তিবাদ প্রচারে যত্নশীল হইবেন।

১০। সমাজ সংস্কারকের ব্যক্তিগত চরিত্রই, তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত সমাজবাদের প্রধান কথা। কারণ সাধারণ জনতায় সমাজবিজ্ঞানের মর্ম্ম বুঝিতে পারে এমন লোক অত্যন্ত কম। কাজেই সমাজ সংস্কারকগণ যদি দুর্ব্বলস্তরের চিন্তাশীল হন, তবে সমাজ দুর্ব্বল হইয়া গড়িয়া উঠিবে। সমাজ সংস্কারকগণ যদি আসুরিক হন তবে সমাজ আসুরিক হইবে। সমাজ সংস্কারকগণ যদি শক্তিশালী স্তরের মানব হন তবে সমাজ শক্তিশালী স্তরের সমাজ হইবে।

১১। যাঁহারাই সমাজ সংস্কার করেন তাঁহারাই সেই সমাজ বিধান নিয়মিত করিবার জন্য গ্রন্থও রচনা করেন এবং সেই সমাজ দাঁড় করাইবার জন্য কোন উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। শক্তিবাদীয় উপাসনা, অসুরবাদীয় উপাসনা ও দুর্ব্বল স্তরীয় উপাসনার ভেদ আছে। যশলোভী হতভাগারা - এই তিন প্রকার উপাসনাকে একই উপাসনা বলিতে চেষ্টা করিবে। শক্তিবাদীরা ইহাদের কঠোর সমালোচনা করিবে।

১২। শক্তিশালী সমাজবিধান, শক্তিশালী উপাসনা ও শক্তিবাদী জ্ঞানের (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রতি প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক অন্তরের আকর্ষণ বিদ্যমান। কিন্তু দুর্ব্বল ও অসুরবাদীয় সমাজবিধান বেশী প্রচারে মানুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। শক্তিবাদীয় সমাজবিধান যাহাতে খুব প্রচার করা যায় এ জন্য বহু লোকের চেষ্টা করা প্রয়োজন। নয় তো দুর্ব্বল ও আসুরিক বিধান প্রবল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ জনতার সাধারণ বিচার শক্তি কম।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - অর্থাৎ "ভিতরের ও বাহিরের"।

১৩। শক্তিশালী, দুর্ব্বল ও আসুরিক সমাজ-প্রবর্ত্তকগণ এমনভাবে সমাজের ভিত্তি দান করেন যাহাতে পরম্পরাক্রমে সেই রূপ সমাজ পরিচালক ও কর্ম্মী বরাবর গড়িয়া উঠিতে পারে।

১৪। দুর্ব্বলস্তরের চিন্তাবিজ্ঞানে সমাজ গড়িলে স্বভাবতঃই ফলস্বরূপ অসুরবাদীয় সমাজ উৎপন্ন হইয়া সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করিবে। সেই সমাজ যদি অতি শীঘ্র শক্তিবাদীয় ভিত্তি গ্রহণ না করে তবে অসুর সমাজই থাকিবে এবং দুর্ব্বল সমাজ অস্তিত্বহীন হইয়া যাইবে। অসুরবাদকে সামান্যও সুবিধা দিতে নাই। অসুরবাদকে যতটুকু সুবিধা দান করিবে সমাজকে ততটুকু বিক্ষোভ ও অশান্তি সহ্য করিতে হইবে। অসুরবাদকে সুবিধা দান করাই দুর্ব্বল সমাজবাদের প্রধান লক্ষণ।

১৫। শক্তিশালী সমাজবিধান থাকা সত্ত্বেও দুর্ব্বল স্তরের নেতা ও কর্ম্মীদের অদূরদর্শিতায় সমাজ সাময়িকভাবে দুর্ব্বল সমাজে পরিণত হইবে। শক্তিশালী সমাজ সংস্কারকের প্রভাবে ইহার রূপ বদলাইয়া দেওয়া কঠিন হইবে না, যদি শক্তিবাদীয় উপাসনায় নিষ্ঠাসম্পন্ন কিছু কর্ম্মীর সহায়তা তাঁহার পিছনে থাকে। দুর্ব্বলস্তরের উপাসনা যাহারা ত্যাগ করিবে না তাহারা সহজে শক্তিশালী সমাজ মানিতে পারে না। দুর্ব্বলস্তরের চিন্তার সহিত তাহাদের ধ্যান নিষ্ঠা থাকিবার দরুণ এ সব লোকেদের দৃঢ়তা কমিয়া যায়। দুর্ব্বল স্তরের উপাসকগণের অসুরবাদ সম্বন্ধে কোন দূরদর্শিতা থাকে না এবং ইহাদের অপমান বোধ কম।

১৬। দুর্ব্বলস্তরের কর্ম্মবিধানে নিয়মিত সমাজে শক্তিশালী সংস্কারক প্রভাব বিস্তার করিয়া সাময়িক কিছু কাজ পাইতে পারেন। কিন্তু উপযুক্ত শক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে দুর্ব্বল সমাজবাদ ও দুর্ব্বলস্তরীয় উপাসনার সংশোধন না করিলে সমাজ আবার দুর্ব্বল হইবে এবং উহাতে বিক্ষোভ দেখা দিবে।

১৭। শক্তিশালী স্তরের কর্ম্মীরা আসুরিক সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কখনও কর্ম্মে নামেন না, দুর্ব্বল স্তরের সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিতেও তাঁহারা কর্ম্ম করেন না। কারণ তাঁহারা জানেন অসুরবাদীরা তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই প্রতারণা করিবে এবং দুর্ব্বলবাদীরা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারিবে না। বিরুদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিতে কাজ করা মানে বিক্ষোভের সূত্রপাত করা।

১৮। দুর্ব্বলস্তরের কর্ম্মীরা যদি আসুরিক সমাজবাদকে ভিত্তি করিয়া কোন ভাল কাজ করিতে চেষ্টা করেন তবে দেখা যাইবে তিনি নিজেই প্রতারিত হইয়াছেন। কাজেই ইহা বিক্ষোভেরই চেষ্টা মাত্র।

১৯। যিশুবাদীদের প্রবর্ত্তিত খৃষ্টান সমাজের ভীষণ উত্থানপতন আমরা বিগত ২০০০ বৎসরের ইতিহাসে দেখিতে পাই। এই সমাজের ভিত্তিতে দুর্ব্বলবাদ বিদ্যমান। এ জন্য এই সমাজবিধানে যত বিপ্লব ও বিক্ষোভ হইয়াছে এমন বিপ্লব ও বিক্ষোভ অন্য কোন সমাজবাদেই হয় নাই। ইহার যে কত রূপান্তর হইয়াছে উহার সীমা নাই। ইহাকে ভিত্তি করিয়া মানব সমাজে যে কত দুঃখ আসিয়াছে উহার ইতিহাস ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাসে জানা যাইবে। শেষকালে এই সমাজ ব্যবস্থা হইতে ডেমোক্রেসি ও সোসিয়ালিজম্ আসিয়াছে। ইহা এখন ফ্যাসিজম্-এর দিকে ঝুঁকিয়াছে। ইহারা যিশুবাদকে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে। উহারা আজ যাহা গড়িতেছে ২৫ বৎসর বাদই

উহা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ডেমোক্রেসী, সোসিয়ালিজম্ (কম্যুনিজম্) ও ফ্যাসিজম্ মানুষের বিকাশ বিজ্ঞানে উন্নতির পথ লয় নাই। ইহা এখন আসুরিকতার দিকে ধাবমান। এই যিশুবাদী সম্প্রদায়ই এক একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতেছে এবং মানবের জীবনযাত্রাকে বিকৃতির পর বিকৃতির দিকে লইয়া চলিয়াছে।

২০। মহম্মদ প্রবর্ত্তিত ইসলাম বাদের ইতিহাসও আমরা বিগত ১৩ শত বৎসরের ইতিহাসে দেখিতে পাই। আমাদের মতে ইহা অসুরবাদীয় সমাজবাদ, এ জন্য এই সমাজবাদ যিশুবাদ হইতে শক্ত। এই সমাজবাদের কর্ম্ম, উপাসনা ও দার্শনিক-হীনতা সবই আসুরিক নিয়মে নিয়মিত। ইসলামকে কেন্দ্র করিয়া একদল লোক অন্য সমাজ বাদের উপর কিরূপ পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে উহার ইতিহাস সাংঘাতিক ও মর্ম্মস্পর্শী। এই মতের উপাসক আল্লা নিজেই একজন সাংঘাতিক বিদ্বেষবাদী। ইহা পিশাচ, দেবতা, যম, ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম, এ সম্বন্ধে আমরা অন্য অধ্যায়ে বলিব। যতদিন পৃথিবীতে দুর্ব্বলবাদের প্রাবল্য থাকিবে ততদিন এই সমাজবাদের ভিত্তি শক্ত হইতে থাকিবে। এই মতে ইসলাম বাদ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ইহারা কাহাকেও বাঁচিতে দিবে না। ইহাদের এইরূপ ভীষণ বিদ্বেষবাদ এক সময় খৃষ্ট সমাজকে বিচলিত করিয়াছিল। যাহার ফলে ভীষণ রক্তপাতের সম্মুখীন হইয়া এই মতবাদ ইউরোপের বহু স্থান হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। ভারতবর্ষে এই মতবাদীরা বহুশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে এবং এই অসুরবাদ ভারতের সমাজবাদকে পঙ্কিল করিয়াছে। ভারত যদি আরও কিছুদিন দুর্ব্বলবাদীয় ভিত্তি আঁকড়াইয়া রাখে তবে ভারত নিজের উচ্চ সভ্যতা মূলক সমাজবাদের সব উপাদান হারাইয়া ফেলিবে। ভারতের উপাস্য ব্রহ্মবাদ, ভারতের ব্রহ্মকর্ম্ম ও ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান মূলক উচ্চাঙ্গের সমাজবাদের ভিত্তিতে ভাল ভাবেই দুর্ব্বলতার ঘুণ ধরিয়াছে। কাজেই ভারতের বুকে ইসলামবাদের তাণ্ডব লীলা যে কতকাল স্থায়ী হইবে বলা যায় না। ভারত ইসলামবাদীয় কর্ম্ম, উপাসনা এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের অদার্শনিকতাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না এবং নিজের শক্তিবাদীয় সমাজবাদেও এমন ঘুণ ধরাইয়াছে যে উহার ভিত্তিতে এই অসুরবাদকে নির্ম্মূলও করিতে পারিতেছে না। ভারতের উপর দুর্ব্বলবাদীয় সমাজবাদ ভারতকে এক ভীষণ সমস্যায় দাঁড় করাইয়াছে। ভারত ইসলামের বর্ব্বরতার দীক্ষা লইবে, কি নিজের দুর্ব্বলতার মায়া কাটাইয়া শক্তিবাদের ভিত্তিতে দাঁড়াইবে ইহা আমরা আজও জানি না। একদিকে অসুরবাদীয় করাল রূপ, অন্য দিকে নিজের দুর্ব্বলবাদীয় তামসিকতা এই দুই এর মাঝখানে একটা অত্যন্ত উচ্চস্তরের সভ্যতা অস্তমিত হইয়া সমস্ত মানবসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিতে বসিয়াছে। শক্তিবাদী যোগী ও শক্তিবাদী মহর্ষিদের আশীর্ব্বাদ এই সমাজকে আর কতদিন রক্ষা করিতে পারিবে বলা যায় না। কারণ ভারতের কর্ম্মী ও নেতারা এখন দুর্ব্বলতার চরম অধঃপতন বরণ করিতে চলিয়াছে। হাজার বৎসর ভারত যে ভাবে ইসলামীয় বর্ব্বরবাদের সামনে আত্মরক্ষা করিয়াছে ইহা একটা বিস্ময়কর ঘটনা। যেখানেই ইসলামবাদীদের রাষ্ট্রশক্তি হইয়াছে সেখানেই অন্য সমাজবাদ নির্ম্মম অত্যাচারে নির্ম্মূল হইয়াছে। কিন্তু ভারত আজ ১০০০ বৎসর ইহার সামনে কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবেই আত্মরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ভারতের আর সেইদিন নাই। ভারত আজ ৩ বৎসর যাবৎ স্বাধীন, কিন্তু রাষ্ট্রনায়কগণ দুর্ব্বলবাদে একান্ত ভাবে

দীক্ষিত। কাজেই এই স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নহে। যদি অতি সত্বর দুর্ব্বলতার ক্ষালন না হয় তবে ইহা ভারতের মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ।

২১। মহর্ষি স্বয়ম্ভূব মনু প্রবর্ত্তিত শক্তিশালী সমাজের ইতিহাস ও উত্থান পতনের আভাষ আমরা দিব। লক্ষ লক্ষ বৎসর এই সমাজবাদ অতি সন্তর্পণে ভারতের কল্যাণ করিয়াছে এবং এক ভাবেই সুখে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। একটা সমাজবাদকে একটা শক্তিশালী স্থায়ী ভিত্তিতে রাখিবার জন্য যেরূপ কর্ম্ম বিজ্ঞান, যেরূপ উপাসনা ও যেরূপ দার্শনিকতার প্রয়োজন মনু প্রবর্ত্তিত শক্তিশালী সমাজে সবই বিদ্যমান। ইহাতে বিভিন্ন যুগে যে সব দুর্ব্বল স্তরের সমাজবাদ দেখা দিয়াছে সেই সম্বন্ধে সকলেরই জানা প্রয়োজন। আমরা ভারতবাসীকে আজও বলি, ইহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও চিরস্থায়ী সুখী সমাজ। তোমরা এই সমাজবাদের উপাসনা, ইহার কর্ম্ম ও ইহার দার্শনিকতায় প্রবেশ কর, তোমাদের কল্যাণ হইবে এবং বিশ্বের কল্যাণ হইবে। ইহার কর্ম্মধারা অতীব সহজ, ইহার উপাসনা অতীব সরল এবং ইহার দার্শনিকতা অত্যন্ত নির্ম্মল ও যুক্তিপূর্ণ। আমরা ভারতকে বার বার বলি ইহা মোটেই কঠিন পথ নহে। আমাদের নেতা ও রাষ্ট্রনায়কগণকে মাত্র একটি উপদেশ দিতেছি - শক্তিবাদীয় উপাসনা কর। শক্তিবাদীয় উপাসনার দুই দিক আছে (১) বহিরঙ্গ দিক। (২) অন্তরঙ্গ দিক। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উপাসনার পর পাঠ আরম্ভ করিবার জন্য সরকারের আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা প্রত্যেক দলের নেতাকে শক্তিবাদীয় উপাসনা করিতে অনুরোধ করিতেছি এবং পৌরোহিত্যবাদের গণ্ডী ও ভাববাদের ভণ্ডামীর বাহিরে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিতেছি। উচ্চদার্শনিকতায় প্রবেশ করিবার জন্য অন্তরঙ্গ সাধনায় প্রবেশ করিতে হয়। ইহাতে সকলেরই যাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বহিরঙ্গ উপাসনা সকলেরই করা কর্ত্তব্য এবং সে সঙ্গে শক্তিবাদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

২২। শক্তিবাদীয় কর্ম্মবাদের ইহাই অতি সাধারণ বিজ্ঞান যে কর্ম্মহীন হইবে না। কারণ কর্ম্মহীনের শরীর যাত্রাই চলে না। জ্ঞান অনুশীলন ও প্রচার, যুদ্ধ ও শাসন, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন এবং কায়িকশ্রম - ইহার যে কোন একটি বাছিয়া লইবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের মঙ্গলের দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া সেই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে। যাহাতে সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তিশালী থাকে এবং অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা সকলের জন্য সহজলভ্য হয় এ জন্য কর্ম্মব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিবে না। রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাষ্ট্রপতি যদি দুর্ব্বল নীতি বা অসুরনীতির প্রবর্ত্তন দ্বারা সমাজের ক্ষতির কারণ হয় উহাকে সংশোধন করিবার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিবে। রাষ্ট্রবাদ দুর্ব্বল হইলে সমাজে অসুরবাদ নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইবে। অসুরবাদ অধ্যায় দেখ।

২৩। শক্তিবাদীয় জ্ঞান বা দার্শনিকতার প্রচুর উপাদান শক্তিশালী সমাজে স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রায় ২২/২৩ খানা দর্শনশাস্ত্র আছে। রাষ্ট্রবাদ বা সমাজবাদ ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শনবাদই শ্রেষ্ঠ দর্শন। দর্শনশাস্ত্র বিচারের ইহাই বিজ্ঞান। গীতা পড়িলে রাষ্ট্র, সমাজ ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সামঞ্জস্য পূর্ণ দার্শনিকতার ভিত্তি পাওয়া যায়। গীতার শক্তিবাদ টিপ্পনী দেখ।

২৪। শক্তিশালী সমাজের রাষ্ট্রগঠনবিজ্ঞান, বর্ত্তমান ডেমোক্রেটিক বিধানের মত নহে। ঋষি, রাজা ও বিশেষ বিধানে নির্ব্বাচিত মন্ত্রীর সমষ্টিতে রাষ্ট্রগঠন হইত। জনতার ইহা

ভালভাবে বুঝা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্র সুন্দর, শক্তিশালী ও সকলের বিকাশের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। সমাজের মুটের সংখ্যা এত বেশী যে ডেমোক্রেটিক শাসন কখনও সুন্দর হইতে পারে না। ভারতবাসীর কর্ত্তব্য এই বিধানকে খৃষ্টানদের দেশে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং নিজস্ব শক্তিবাদ রাষ্ট্রবিধান প্রবর্ত্তন করা।

২৫। শক্তিবাদরাষ্ট্রগঠন বিজ্ঞানকে পঞ্চায়েৎ বলে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ইঁহারা পঞ্চায়েৎ। মনোবিজ্ঞানের বিচারে ইঁহারা বিভিন্ন স্তরের লক্ষণ সম্পন্ন মানুষ (ক্রম বিকাশ দ্রষ্টব্য) এবং সমাজ তত্ত্ব বিচারে ইঁহারা সমাজের বিভিন্ন বিভাগ। গণেশ - বিচার ও স্থপতি বিভাগ। সূর্য্য - শিক্ষা, প্রচার, চিকিৎসা, কলা ও জ্যোতিষ বিভাগ। বিষ্ণু - শাসন ও ব্যবসায়ী, বৃহৎ শিল্প ও কৃষি বিভাগ। শিব (নিম্ন) - কায়িক শ্রম বিভাগ। শিব (উন্নত) - ঋষি ও যোগী বিভাগ। শক্তি - সেনানায়ক বিভাগ। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দ্বারা নির্ব্বাচিত মন্ত্রীরাই সিংহাসনের পঞ্চায়েৎ। ইহাদের মধ্যে কেহ অযোগ্য হইলে জনসাধারণ ও উক্ত বিভাগ আন্দোলন করিতে পারিবে। নির্ব্বাচিত মন্ত্রী নিজের যুক্তিদ্বারা সমাজকে তুষ্ট করিবেন। যদি অক্ষম হন তবে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলিবেন। সেই বিভাগ তখন নূতন মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবেন।

২৬। শক্তিবাদে রাষ্ট্রপতি বংশ পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। আমরা ইহা লইয়া কোন বিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু জনতার জানা প্রয়োজন যে বংশ পরম্পরাগত রাষ্ট্রপতি জন কল্যাণের বেশী অনুকূল। ইহাতে রাষ্ট্রপতি কে হইবেন জানা যায় এবং তাঁহাকে দীক্ষায় শিক্ষায় সংস্কৃত করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতির চরিত্র গঠনে ঋষিগণ বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় ব্রহ্মচর্য্যবিধানে থাকিতে হইত। অযোগ্যকে রাষ্ট্রপতি করা হইত না। অযোগ্যতার জন্যই জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতি অনেক স্থানে আসুরিক হইয়াছেন। দেখা যায়, তাঁহারা ঋষিগণের সমর্থন পান নাই। রাবণ ঋষিদের রক্ত লইয়াও তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। অসুর রাজারা পঞ্চায়েতবিধান বিলোপ করিয়া দিয়াছেন।

২৭। ডেমোক্রেটিক বিধানে রাষ্ট্রপতি ধনী ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না। কে কখন রাষ্ট্রপতি হইবেন ইহা না জানা থাকিবার দরুন তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের ব্যবস্থাও করা যায় না। এই কারণে ডেমোক্রেটিক বিধানে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন সমাজ-জীবনের সুখের কারণ হয় না। দলতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতিও সমাজসুখের কারণ হন না। কারণ ইহাদিগকে একটা দলকে ও পত্রিকা গুলিকে সমাজের উপর ট্যাক্স বসাইয়া পুষিতে হয় এবং ডেমোক্রেটিকের মত ইহাতেও অযোগ্য লোকের হাতে শাসন থাকিয়া যায়। ডেমোক্রেটিক অন্যদল সহ্য করে, দলতন্ত্রে অন্যদল নির্ম্মূল হয়। পঞ্চায়েৎ বিধানে রাজা দুর্ব্বল বা অসুর হইলে তাঁহার স্থানে অন্য রাজা বসাইবার ব্যবস্থা আছে। কাজেই ঋষি, রাজা ও পঞ্চায়েৎ বিধান বেশী সুন্দর।

২৮। অসুরবাদীয় রাষ্ট্রপতিরা পৌরোহিত্যবাদী ব্রাহ্মণগণকে হাতে রাখিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ সেনা ও পুলিশ বিভাগই ইহাদের প্রধান সহায়ক থাকিত। পঞ্চায়েৎ হীন রাষ্ট্র গঠন যেমন সমাজ কল্যাণের প্রতিকূল, ঠিক সেইরূপ ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভা এবং দলতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি ও দলতান্ত্রিক মন্ত্রীসভাও

সমাজ বিকাশের প্রতিকূল। ঋষি, রাজা ও পঞ্চায়েৎ বিধানে নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রগঠনবিজ্ঞান সব রকমেই সুন্দর।

২৯। শক্তিবাদ রাষ্ট্র বিধানে কোন প্রকার অসুরবাদকে কোন রকমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। বৈদিকযুগে দৈব ও অসুর মনোবিজ্ঞানে মানবকে ও তাহাদের সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করা হইত। এই যুগেও বৃত্তি ছিল কিন্তু উহা বংশ পরম্পরাগত ভাবে ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে বৃত্তি বংশ পরম্পরাগত ভাবে নিয়মিত হইত। বৃত্তি ভেদের যুগে জ্ঞানানুশীলন ও প্রচার, যুদ্ধ ও শাসন, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন এবং কায়িক শ্রম, বেশীর ভাগই বংশ পরম্পরায় নিয়মিত হইত। কর্ম্মবিভাগ থাকিলেও উপাসনা সকলের জন্য একই ছিল। কাজেই সমাজজীবনে বিদ্বেষ বা ভেদ দেখা দেয় নাই। ঐ যুগে দৈব ও অসুর ভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত গণকে দৈব ও অসুরবাদী বলা হইত। গীতায় ১৬ অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। যাহা হউক যে যুগে কর্ম্মের ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও কায়িক কর্ম্মের বিভাগে সমাজ ভেদ গড়িয়া উঠিয়াছিল সেইযুগেও অসুরবাদ ছিল, এখনও আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়িক শ্রমিকগণ নিজেদের স্বাভাবিক কর্ম্ম দ্বারা সমাজের সেবা করিতেন। চার প্রকার কর্ম্মভেদ হইতে কি ভাবে চার প্রকারের অসুরবাদ আসিয়াছে ঐ সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

৩০। গুণকর্ম্মজাত জ্ঞানবাদ বা ব্রহ্মণ্যবাদ। এক শ্রেণীর মানব তপস্যা দ্বারা এই সত্যলাভ করেন যে মানব (জীব) মাত্রই এক আত্মার বিকাশ। মানব মাত্রই বিকাশের জন্য সমাজজীবনের সব রকম সুবিধা পাইবে। যাহারা মানবের এই বিকাশবিজ্ঞানের নীতি অস্বীকার করে এবং ইহার বিরুদ্ধতা করে তাহারা অসুরবাদী। সমাজজীবন হইতে ইহাদের বহিষ্কার প্রয়োজন। এইরূপ মতবাদই ব্রহ্মণ্যবাদ। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান এবং বেদোক্ত অসুরধ্বংসবাদই ব্রহ্মণ্যবাদের অভিব্যক্তি। এই শ্রেণীর জ্ঞান যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহারাই ঋষি বা ব্রাহ্মণ। বেদের বহু মন্ত্রের মধ্যে নারী, ক্ষত্রিয় ও কায়িক শ্রমকারী মানুষ আছেন। দর্শন শাস্ত্রগুলি ব্রহ্মবাদীয় অভিব্যক্তি। ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয়গণ যে এই মতবাদ খুব বেশী অনুশীলন করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

৩১। ব্রাহ্মণ্যকর্ম্মজাত পৌরোহিত্যবাদ। ইহা একটী অসুরবাদ। চণ্ডীতে বৈপ্রচিত্ত দানবের কথা আছে। ইহারাই সেইরূপ দানব কিনা আমরা জানি না। এই মতবাদ আমাদের দেশে বহুবার উঠিয়াছে এবং গিয়াছে। বৌদ্ধবাদের পূর্ব্বে এই মতবাদ খুব প্রবল ছিল। ব্যাসের বেদবিভাগ ও শাখা বিভাগ এবং কর্ম্মমীমাংসার যাগযজ্ঞ বিধানকে কেন্দ্র করিয়া পৌরোহিত্যবাদ প্রবল হয়। বৌদ্ধবাদের পতনের পর এই নব্য স্মার্ত্তবাদ আবার দেখা দেয়।

৩২। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ সম্পূর্ণরূপে পৌরোহিত্যবাদীয় নীতিদ্বারা পরিচালিত। নবদ্বীপ, কাশী ও পুনায় ইহাদের প্রধান আড্ডা। এই মতে বেদ, ধর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞ, পূজা, মন্ত্র সব কিছুরই ইহারা এবং ইহাদের বংশধরগণ অধিকারী এবং তাহারা ভিন্ন সব মানবই ইহাদের চাকর বাকর। আমাদের সমাজের পতনের এবং সমাজ জীবনের দুর্দ্দশার জন্য এই মতবাদ বিশেষভাবে দায়ী। ইহাই হিন্দু সমাজের উপাসনায় ভেদ সৃষ্টি করিয়া ভেদবাদ ও শূদ্রবাদ প্রবল করিয়াছে। উচ্চ বংশীয় বৌদ্ধগণকে এই মতবাদীরা কলে কৌশলে শূদ্রের কোঠায় ফেলে। ইহার ফলে বাংলার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবাদ নিস্তেজ

হয়। ইহা সমস্ত ভারতের উচ্চ প্রতিষ্ঠ বৌদ্ধগণকে দ্বিজাতি সংস্কার হইতে আজও বহিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। আমরা ভেদভাবের সমর্থক পৌরোহিত্যবাদ মানি না। কিন্তু সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষের জ্ঞান ও শান্তির উন্মেষের জন্য ব্রাহ্মণ্য বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ সমর্থন করি। আমরা পৌরোহিত্যবাদ মানি না কিন্তু পৌরোহিত্য কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ অসমর্থন করি না।

৩৩। ক্ষত্রিয়গুণকর্ম্মজাত পুরুষোত্তমবাদ। ব্রহ্মণ্যবাদকে সমাজজীবনে দাঁড় করাইবার জন্য যে বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মকুশলতার প্রয়োজন উহাই পুরুষোত্তমবাদ। ব্রহ্মণ্যবাদ যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন সমাজজীবনে উহা দাঁড় করাইবার অনুষ্ঠানই পুরুষোত্তমবাদ। ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী মানবগণ এই মতের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষক। গীতার পুরুষোত্তমবাদ এবং শক্তিবাদ এবং বেদবাদ একই কথা। এই মত স্থাপনায় ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসীম পরিশ্রম করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ এই মতের সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

৩৪। ক্ষত্রিয়বৃত্তিজাত অসুরবাদ। ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ এই মতবাদে জড়াইয়া গিয়াছিলেন। রাবণ, দুর্য্যোধন এবং বৈদিক যুগের ত্রিপুর ও বৃত্রাসুর প্রভৃতিগণ এই মতের উপাসক ছিলেন। বর্ণভেদ স্থাপিত হইবার পর মাঝে মাঝেই ক্ষত্রিয়গণে অসুরবাদ বেশী দেখা দিয়াছে।

৩৫। বৈশ্যগুণকর্ম্মজাত সমাজপালনবাদ। বাণিজ্য, বৃহৎ শিল্প, কৃষি ও পশুপালন দ্বারা সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করা এবং দান করা রূপ কার্য্য দ্বারা মানব ও ধর্ম্মরক্ষা বৈশ্যগণ যুগ যুগান্তর করিয়াছেন।

৩৬। বৈশ্যবৃত্তিজাত শোষণবাদ। শোষণবাদ আমাদের দেশে বিশেষ শক্তিশালী হইতে সুবিধা পায় নাই। ইউরোপের ডেমোক্রেটিক যুগে শোষণবাদ অত্যন্ত প্রবল হয়। ইহাকে ধনতন্ত্রবাদ বলে। ইহাদের দ্বারাই পৃথিবীতে অন্ন, বস্ত্র ও কর্ম্মসমস্যা দেখা দিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর এবং এই দেশে দুর্ব্বলবাদীয় শাসন প্রবর্ত্তনের ফলে আমাদের দেশের বৈশ্যরা কালা কারবার ও শোষণলীলা জমাইয়াছে। ইহাতেই সোসিয়ালিজম্ ও কম্যুনিজমের আস্ফালন বৃদ্ধি হইয়াছে। শক্তিবাদীয় শাসন আসিলে ইহা থাকিবে না।

৩৭। শূদ্রগুণকর্ম্মজাত কায়িক কর্ম্মবাদ। কায়িক কর্ম্ম দ্বারা শিল্প ও সমাজ রক্ষা এই শ্রেণীর স্বভাব বৈশিষ্ট্য। কম্যুনিজমের প্রভাব দ্বারা কথায় কথায় কর্ম্মত্যাগ বা স্ট্রাইক করিয়া সমাজব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই স্ট্রাইক লীলা সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বিভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই শূদ্রবৃত্তিজাত অসুরবাদ। আমরা ইহাদিগকে শক্তিবাদ বুঝিতে বলি এবং সমাজসেবায় তৎপর হইতে বলি। জনসংখ্যা বিচার করিলে এই স্তরের মানবের সংখ্যা সব স্তরের তুলনায় অনেক বেশী। কাজেই ডেমোক্রেসীর শেষ পরিণতিতে কায়িকশ্রমবাদীর শাসন আসিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের নেতারা যেভাবে তোষণের ক্রমবিকাশে চলিয়াছেন তাহার ফলে ভীষণ গৃহযুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই দেখা যায় গৃহযুদ্ধের পরই হয়তো শক্তিবাদ আসিবে। ব্রহ্মণ্যবাদ, পুরুষোত্তমবাদ, সমাজপালনবাদ এবং কায়িক কর্ম্মবাদ থাকিবে কিন্তু পৌরোহিত্যবাদ, অসুরবাদ, শোষণবাদ এবং কর্ম্মত্যাগবাদ ও পূর্ব্বোক্ত ইসলামবাদ সমাজে থাকিবে না, ইহাই শক্তিবাদ।

৩৮। বিচার করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে রাষ্ট্রবাদের শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী পরিকল্পনাই শক্তিবাদ। বৈদিকযুগে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এবং পরবর্ত্তী যুগে শক্তিশালী রাজা ও মহর্ষিগণ শক্তিবাদীয় রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়াছিলেন। গীতায় শক্তিবাদকেই পুরুষোত্তমবাদ বলা হইয়াছে।

৩৯। রাষ্ট্র পরিচালনা এমন বিজ্ঞানে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে দেশের মধ্যে কোন স্তরের মানবে অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, কার্য্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ধর্ম্মসমস্যা দেখা দিতে না পারে। এবং যে রাষ্ট্র নীতির দুর্ব্বলতায় কোন প্রকার অসুরবাদ প্রশ্রয় পায় না উহার নাম শক্তিবাদ।

৪০। সত্য, অভয়, শান্তি, প্রেম এবং তেজ (অসুর বিরোধিতা) - গীতার ২৬টি দৈবী সম্পদের মধ্যে এই ৫টির সামঞ্জস্যময় রাষ্ট্র-চরিত্রকে শক্তিবাদ রাষ্ট্র বলা যায়। অসুরবাদীয় রাষ্ট্রচরিত্র মিথ্যা-ছলনা ও বর্ব্বরতা দ্বারা নিয়মিত হয়। দুর্ব্বল রাষ্ট্রচরিত্রে অসুর তোষণই মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্রের দীক্ষা লইয়া ইহারা আত্ম প্রবঞ্চনা ও রাষ্ট্রের আত্মহত্যা করে। ইহাকে নিস্তেজ রাষ্ট্রবাদ বলা যায়। ইহা আত্মহন্তক রাষ্ট্রবাদ। রাষ্ট্রনায়কের চরিত্র দ্বারাই রাষ্ট্রচরিত্র বুঝিতে পারা যায়।

৪১। আমাদের সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রনায়কদের চরিত্র তিন প্রকারের পাওয়া যায়। (১) শক্তিবাদীয় রাষ্ট্রনায়ক; ইন্দ্রাদিগণ, মনুগণ, দশরথ, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, জনক, শিবাজী, রাণাপ্রতাপ, গুরু গোবিন্দ। (২) অসুরবাদীয় রাষ্ট্রনায়ক; ত্রিপুরাসুর, বৃত্র, মহিষাসুর, রাবণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি। (৩) দুর্ব্বলবাদী রাষ্ট্রনায়কের যুধিষ্ঠিরের নাম করা যায়। ইঁহার দুর্ব্বলতায়, দায়িত্ব জ্ঞানহীনতায় এবং অদূরদর্শিতায় রাজদণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া দুর্য্যোধন শক্তিশালী হইতে সময় ও সুযোগ পান। দুর্য্যোধন এতটা নীতিহীন হইয়াছিলেন যে প্রকাশ্যসভামধ্যে দ্রৌপদীকে উলঙ্গ করিয়া অপমান করিতে একটুও লজ্জা বোধ করেন নাই। যদি মহাভারতের যুদ্ধ না হইত তবে মানব সভ্যতার মানদণ্ডই নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু মহাভারতের মহাসমরের ফলে ভারতের কম সর্ব্বনাশ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকে শেষকালে এই সমরের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের তোষণনীতি কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। মহারাজ পৃথ্বিরাজ তোষণনীতি দ্বারা মহম্মদ সাহাবুদ্দিন গজনীর* নীতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া ভারতের পতনের কারণ হন। বিগত ৩০ বৎসর ধরিয়া ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণও কুৎসিত দৌর্ব্বল্য ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ইহারও পরিণতি সমাজকে ভালভাবেই ভোগ করিতে হইবে।

৪২। স্বয়ম্ভূব মনু প্রবর্ত্তিত সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনবিজ্ঞান বা কনষ্টিটিউসন, অসুরবাদ বিজ্ঞান, উপাসনা, দার্শনিকতা, বৃত্তি বা কর্ম্মবণ্টন সম্বন্ধে মোটামুটি বলা হইল। এই সমাজ প্রবর্ত্তনের পর ইহার একটা লম্বা যুগ চলিয়াছিল, যাহাতে অসুরবাদের বিরোধিতা ও ব্রহ্মণ্যবাদের প্রসারতায় কাটিয়াছে। ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে পৌরোহিত্যবাদ দেখা দিয়াছিল। বৌদ্ধবাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পৌরোহিত্যবাদ প্রবল হইয়াছিল। ইহার পর ইহাতে বৌদ্ধবাদীয় সমাজবাদ প্রবল হয়। বৌদ্ধবাদীয় সমাজবাদ আচার্য্য শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত সমাজবিপ্লবে ভাসিয়া যায়। আচার্য্য শঙ্করের পর এই সমাজে

* প্রকাশকের নিবেদন - এখানে মহম্মদ ঘোরীর কথা বলা হয়েছে।

পুনঃ পৌরোহিত্যবাদ প্রবল হয়, এবং যাহাতে পৌরোহিত্যবাদ এই সমাজে স্থায়ী হয় এ জন্য এই সমাজ ভাববাদ প্রবিষ্ট করানো হয়। পৌরোহিত্যবাদ এবং ভাববাদে দুর্ব্বল হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজে ইসলামবাদ আঘাত দেয়। বহু শত বৎসর ইসলামের আঘাতেও এই সমাজ পৌরোহিত্যবাদ ও ভাববাদের যুগ অতিক্রম করিতে পারে নাই। ফলে ইসলামের বর্ব্বরতা ইহাতে দিনের পর দিন বৃদ্ধি হইতেই লাগিল। এমন সময় ইংরেজ আসিল। ইংরেজকে এই দেশে বসাইয়া ইসলামের বর্ব্বরতা কমাইবার চেষ্টা সফল হইল। ইংরেজ প্রায় ২ শত বৎসর রাজত্ব করিল। ইংরেজকে বহিষ্কার করিবার আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল। গান্ধীর নেতৃত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেসের নীতিবিধি মোটামোটি শক্তিবাদের নীতি ধরিয়াই চলিল। ইহার পর এই শক্তিবাদীরা একদিকে ইংরেজ ও অন্যদিকে গান্ধীবাদীদের চাপে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। ঘটনা চক্রে ইহারা সমাজের সমর্থন উপেক্ষা করিয়াই কাজ করিয়া চলিল। বঙ্গদেশ এই শক্তিবাদীয় নীতি যতটা পারিল ধরিয়া রাখিল এবং বহু নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত হইতে লাগিল। প্রকাশ্য রাজনীতিতে ইসলাম প্রবর্ত্তিত মুসলিম লিগ এবং তোষণবাদী কংগ্রেস প্রবল হইতে লাগিল। শক্তিবাদীরাও গোপনে গোপনে প্রবল হইতে লাগিল। উহা গত মহাযুদ্ধে নেতাজীর নেতৃত্বে শক্তিশালী রূপ লইল। ইংরেজ দুই দিকের তাপে ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে দেশকে তিন টুকরায় ভাগ করিয়া এই দেশ ছাড়িল। শক্তিবাদীদের সংঘ ভারতের মধ্যে শক্তিশালী ছিল না। কাজেই ভারতের শাসন দুর্ব্বলবাদীদের হাতে গেল। এবং পাকিস্থানের ভার গেল মুসলিমলিগের হাতে। ভারতের দুইদিকে মুসলিম রাষ্ট্রের হিন্দু অশেষ নির্য্যাতনে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গও শীঘ্রই হিন্দুশূন্য হইবার পথে চলিয়াছে। দুর্ব্বলবাদীরা এখনও ভারতে প্রবল। কাজেই ভারতের ভাগ্যে অনেক দুর্দ্দশা, অনেক দুর্ভিক্ষ, অনেক নির্য্যাতন আছে। আমরা জানিনা শক্তিবাদী দলগুলি এক হইয়া ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তনে সময়মত সাহায্য করিতে পারিবে কিনা। সোসিয়ালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, কংগ্রেস, সকলেরই নীতি পাকিস্থানকে তোষণের অনুকূলে। আমাদের মনে হয় শক্তিবাদীরা এখনও দুর্ব্বল। কাজেই ভারতের ভাগ্য কতদিনে নির্ম্মল হইবে তাহা বলা কঠিন। আমরা শক্তিবাদিগণকে এক মতে ও সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে বলি। শক্তিবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিধান, ইহার জন্য পথ করিয়া দেওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। কাজেই উচ্চ স্তরের যোগী মহাত্মাদের আশীর্ব্বাদে ইহার অনুকূলে সময় আসিবার সম্ভাবনা আছে। দুর্ব্বলবাদীদের মূর্খতার শাসনে মুসলমান প্রাধান্য হওয়া, কাশ্মীরে পাকিস্থান রাজ্য হওয়া, ভারতব্যাপী স্থায়ী দুর্ভিক্ষ হওয়া, গৃহযুদ্ধে ভারতের সর্ব্বনাশ হওয়ার লক্ষণও দেখা দিয়াছে। শক্তিবাদের প্রবল প্রচার হওয়া প্রয়োজন। শক্তিবাদ গৃহযুদ্ধে সর্ব্বনাশ চায় না। আবার দুর্ব্বলবাদে আত্মহত্যার দ্বারা যবন রাজ্যও চায় না। দুর্ব্বলবাদীরা শাসনে থাকিলে যবন রাজ্য অনিবার্য্য। যদি যবন রাজ্য হয় তবে আর মনু প্রবর্ত্তিত উচ্চ সমাজবাদের নামও এই পৃথিবীতে থাকিবে না। দুর্ব্বলবাদীরা অধঃপতনের এমন এক স্তরে আসিয়া গিয়াছে যে ইহাদের সংশোধনের আর পথ নাই। ইহারা শক্তিবাদকেও উঠিতে দিবে না। ইহারা প্রচ্ছন্ন যবনবাদের দীক্ষা লইয়াছে। কোথায় স্বয়ম্ভুব মনু আর আজ কোথায় যবনের পদে তৈল মর্দ্দনকারী পাপিষ্ঠদের

শাসন। একই সমাজের দুই প্রান্ত দেখিয়া ভাব এবং সমাজের উত্থান পতনের গতি বোঝ।

৪৩। মনু প্রবর্ত্তিত সমাজবাদীরা আজ ডেমোক্রেসী, সোসিয়ালিজম্ ও কম্যুনিজম এর দীক্ষা লইয়াছে। ইতিমধ্যে ইহারা মুসলমানদের বর্ব্বরতার সামনে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া ভারতকে ভাগ করিয়া দিয়াছে। আমরা ঐ সব হতভাগ্য ও মূর্খ নেতা, কর্ম্মী ও পত্রিকাগুলিকে বলি শুধু জনসংখ্যায় - মানবের সমাজ নহে। মানুষ মনোবিকাশ সম্পন্ন জীব। এই মনোবিকাশের ৪।০ হইতে ১৬শ কলার বিকাশ হয়। ইহাদের মধ্যে ৪।০ কলার বিকাশ সম্পন্ন মানবের সংখ্যা অন্যান্য সব স্তরের সমষ্টিগত সংখ্যা হইতেও ১০০০ গুণ বেশী। কাজেই সমাজে যদি সুখ ও শান্তি চাও তবে মূর্খতা ছাড়িয়া দাও। এবং ৪।০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬শ কলার মানবের সমষ্টিভূত পঞ্চায়েৎ বিধানের শাসনে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমরা ভাল ভাবেই জানিয়া রাখিও জন সংখ্যায় রাষ্ট্র কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র নহে। সমস্ত স্তরের বিকাশ-সম্পন্ন-মানব রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভাগ লইবে। রাষ্ট্র সমস্ত স্তরের বিকাশের অনুকূল হইয়া গঠিত হইবে তবেই পৃথিবীতে মঙ্গল আসিবে। প্রকৃতি মানবসমাজকে ৪।০ হইতে ১৬ কলার ক্ষেত্র করিয়াছেন। মানবের রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্ম ঐ বিজ্ঞানে দাঁড়াইলেই তাহা পূর্ণতার রূপ লইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোবিকাশে বিভিন্ন স্তরের চিন্তাধারা

সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্র প্রথমে বলা হইয়াছে। এইবার চিন্তা জগতের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে বলা হইবে। ইহা দ্বারা দুর্ব্বল, আসুরিক ও শক্তিশালী সমাজ বুঝা যাইবে। মানুষের মনোবিকাশের স্তর আছে। এই সব স্তরের বিস্তারিত আলোচনা আমরা ক্রমবিকাশ ও শক্তিবাদ নামক গ্রন্থে করিয়াছি। এই গ্রন্থে ইহার সংক্ষেপ আলোচনা হইবে। বৈদিক পঞ্চদেবতার ধ্যান গুলিকে ভিত্তি করিয়া আমরা বিকাশের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে বলিয়াছি। ইহারা আমাদের পঞ্চ সগুণ ব্রহ্ম। ইঁহাদিগকেই আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চায়েৎ বলা হইয়াছে। হিন্দু সমাজের সমস্ত প্রকারের সমাজ বিজ্ঞানে এই সব বিকাশের স্তরগুলিই ভিত্তি। মানুষ ক্রমবিকাশে এই পাঁচটী বিকাশ ভূমি অতিক্রম করিবার পর নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান ভূমি লাভ করেন। আমরা পাঠকগণকে ক্রমবিকাশ পাঠ করিতে বলি এবং এই সব বিকাশস্তরগুলি কিরূপ অকাট্য মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি, উহা বুঝিতে আহ্বান করি।

১। গণেশ স্তরের চিন্তাধারা। এই স্তরের চিন্তাধারার বিশেষতা এই যে ইহা মানুষকে অন্যায়বিরোধী, ত্যাগী, যুদ্ধপ্রিয়, উদার মনোবৃত্তি সম্পন্ন, একগুঁয়ে প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেমী, প্রগতি বাদী, কষ্ট সহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ, দৃঢ়ভাষী ও জড়বিজ্ঞানে নিষ্ঠাসম্পন্ন করে। যাঁহারা উন্নত বিকাশ চাহেন তাঁহাদের চরিত্রে এসব লক্ষণ ভাল কাজ দেয়। বিচারক, স্থপতি, বৈজ্ঞানিক, যন্ত্র পরিচালক, প্রগতিনেতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই স্তরের মানুষ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্যকালে এবং পরে ১৬ হইতে ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে এই স্তরের বিকাশ যে কোন উন্নত বিকাশসম্পন্ন মানুষে প্রবল হয়।

২। সোসিয়ালিজম ও কম্যুনিজম এই স্তরের চিন্তাবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা সমাজ চলে না, ষ্টেটও চলে না; কাজেই রুষের লাল বিপ্লবের পর ঐ দেশের কম্যুনিজমের মূল নীতির পরিবর্ত্তন হইয়া চলিয়াছে। জার্ম্মান আক্রমণের সময় ইহারা সোসিয়ালিষ্ট রণধ্বনি ত্যাগ করিয়া জাতীয়তাবাদ রণধ্বনি গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের উন্নত দার্শনিকতার টক্কর খাইয়া নিজের নাস্তিক দার্শনিকতা পরিত্যাগ করে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময় ইহাদের তিনটী প্রধান শাখা আছে। কম্যুনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট এবং র‍্যাডিক্যাল পার্টি। অর্থনীতি সম্বন্ধে এই তিনটি মতের কোন ভেদ নাই। কিন্তু দার্শনিকতা সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। আসল কথা ইহা কম বিকশিত চিন্তাধারায় নিয়মিত বলিয়া এই মতকে কেন্দ্র করিয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে। ইহা লইয়া আরও মতভেদ দেখা দিবে। এখন অর্থনৈতিক ভিত্তিই ইহার প্রধান ভিত্তি। চীনের বিপ্লবের পর ইহারা চীনের প্রাচীন

সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। ফলে ইহা চীনে অধিক জনপ্রিয় হইয়াছে। কম্যুনিজমের জীবন যুদ্ধে এই সামঞ্জস্য কম্যুনিজমকে এক ধাপ উন্নত করিয়াছে। কিন্তু ইহার পরও চীন হইতে দুর্ভিক্ষ যাইবে না। কম্যুনিজম অর্থে রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রবাদ। কিন্তু এখন কম্যুনজিম দলতান্ত্রিক রাষ্ট্রবাদে পরিণত হইয়াছে। আমরা ইহাদিগকে শক্তিবাদ ও শক্তিবাদ রাষ্ট্র বিজ্ঞান বুঝিতে অনুরোধ করি। ভারত স্বাধীন হইবার পর ভারতরাষ্ট্র পরিচালকগণ শক্তিবাদের দিকে আসেন নাই। যদি শক্তিবাদের দিকে আসিতেন তাহা হইলে গণেশবাদের প্রাধান্য ভারতে আর থাকিত না। ভারতরাষ্ট্র পরিচালকগণ এখন এমন একস্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন যে ইঁহারা কখন কোন দিকে ঝুঁকিবেন বলা যায় না। ইহারা কর্তৃত্ব হাতে রাখিবে এবং মুসলমানদের সমর্থন পাইবার জন্য পাকিস্থানকে তোষণ করিবে। এইটুকু করিয়া ইহারা দেখিবে কোন দলকে হাতে পাইলে ইহারা কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। সুবিধা বুঝিয়া তাহারা সেই দলের নীতিতে ঝুঁকিবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অযোগ্য সরকার আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জার্ম্মানি ও জাপানের পরাজয় করাইবার পূর্ব্বে ইংরেজ ও আমেরিকার ধারণা ছিল - জার্ম্মানি ও রুশ যুদ্ধ করিয়া দুইই শেষ হইয়া যাইবে এবং যুদ্ধের পর সমস্ত পৃথিবীটা ইংরেজ ও আমেরিকা লুটিয়া খাইবে। হের হিটলার যখন দেখিলেন ইংরেজ ও আমেরিকা জার্ম্মানির অস্তিত্ব নাশে অটল তখন তিনি হাতে যথেষ্ট শক্তি থাকিতেও পরাজয় বরণ করিয়া রুশকে আর ভাঙ্গিলেন না। আমরা শক্তিবাদ পুস্তকে স্পষ্টই বলিয়া ছিলাম - এই যুদ্ধ হইতে ইংরেজ আস্ত বাহির হইতে পারিবে না। হিটলারের প্রথম ভুল ইংরেজকে না ভাঙ্গিয়া রুশের দিকে অগ্রসর হওয়া। তাহা হইলে হয়তো আমেরিকা যুদ্ধে নামিত না। যাহা হউক মহাযুদ্ধে ইংরেজ নিজের নাক কাটিয়াও জার্ম্মানির যাত্রা ভঙ্গ করিল। যুদ্ধের পর জার্ম্মান, ভারত, কোরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ ভাগ করা হইল এবং রুশকে এসব দেশকে এক করিবার ফন্দিতে আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার সুযোগ দান করা হইল। চীন, কোরিয়া, ভারত ও জার্ম্মানির ভবিষ্যৎ দুঃখময় ও অশান্তিময় করিয়া ইহারা বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ স্থাপন করিল। ইংরেজ ও আমেরিকার দুর্নীতি কাশ্মীরের যুদ্ধেও স্পষ্ট হইল। ইহারা কাশ্মীরকেও পাকিস্তানে দিবার ফন্দি করিল।

৩। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির ইতিহাসও আমরা কিছু বলিব। প্রথমটায় ইহা বেশ ভাল প্রভাব দান করিয়াছিল কিন্তু পরে এই দল প্রকাশ্য ভাবে হিন্দু বিরোধী দলরূপে পরিণত হইল। যখন কম্যুনেল এ্যাওয়ার্ড ভারতের শাসনরূপে পরিণত হইল তখন ইহারা উহার সমর্থক হইল। যখন সুভাষ বসু ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করিলেন তখন ইহারা উহা প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইল। যখন পাকিস্তান প্রস্তুত হইয়া ভারত খণ্ডিত হইল তখন ইহারা ভারত খণ্ডনের পক্ষে দাঁড়াইল। যখনই মুসলমানেরা ভারত জুড়িয়া গুণ্ডামি করিয়াছে তখনই ইহারা সেই গুণ্ডামীর পক্ষে ও হিন্দুদের বিপক্ষে গিয়াছে। পাকিস্থান হইবার পর যখন পশ্চিম ভারত হিন্দুশূন্য হইল, কোটি কোটি নরনারী নিঃস্ব, লক্ষ লক্ষ নারী লাঞ্ছিতা হইল তখন এই দলের মধ্যে কোনই সাড়া পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা যখন নির্য্যাতনে মৃত্যুর পথে, তখনও এই দল প্রকাশ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে গিয়াছে। ইহারা নাকি নিঃস্বদের বড় বন্ধু। কিন্তু হিন্দুদের নিঃস্ব অবস্থা ইহাদের মনকে দ্রবিত করে না। হিন্দুদের উপর শত্রুভাব ইহাদের এত

মজ্জাগত কেন আমরা আজও জানিতে পারি নাই। হিন্দুগণকে আমরা বলি নিজেদের পায়ে দাঁড়াও এবং শক্তিদ অবলম্বন কর; ইহাতেই তোমাদের কল্যাণ হইবে।

৪। গণেশবাদ ভারতের অতীব পুরাতন মতবাদ। গণেশ মূর্ত্তিতে এই মতবাদ জাগ্রত করা হইয়াছে। যে কোন ব্যবসায়ীর গৃহদ্বারে মূষিকপ্রভু গণেশদেবতা দেখিতে পাওয়া যায়। গণেশ গণবিপ্লবের দেবতা। মূষিক শস্যচোর জীব। ব্যবসায়ীরা যখন চোরাকারবার আরম্ভ করে তখন সমাজে গণেশ স্তরের বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। হঠাৎ দেখা গেল বাজারে কোন খাদ্যদ্রব্য নাই এবং ব্যবসায়ীরা অতিসামান্য মাল লইয়া বসিয়া আছে, এবং উহা দ্বিগুণ বা তিনগুণ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ঋষিরা ব্যবসায়িগণকে সতর্ক করাইবার জন্য গণেশ পূজা করিতে বলিয়াছেন। অর্থাৎ কালাকারবার করিও না, গণ বিপ্লবের বন্যায় তোমরা নিশ্চিহ্ন হইবে। কম্যুনিষ্টরা যাহা বুঝাইতে চায়, ভারতীয় শক্তিবাদে উহার স্থান পূর্ব্বাবধিই আছে। গণেশবাদ প্রাচ্যবিজ্ঞানে হইলে আমরা ইহাকে আপনারই করিয়া লইতাম এবং তাহারাও এইরূপ ভাবে হিন্দুধর্ম্মের শত্রুরূপে মাথা তুলিত না। কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, র‍্যাডিকাল সবই হিন্দুদের সঙ্গে ও হিন্দুদের জন্য হৃদয়হীন। ইহা ভাবিতে আমাদের সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়। আমরা এখানে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ভারতের কম্যুনিষ্টদের দুইটা কথা বলি। জ্যোতিষ মতে মঙ্গল গ্রহের মতবাদই কম্যুনিজম। ইহা যুবক ও যুদ্ধের গ্রহ। কিন্তু মঙ্গল তুঙ্গ হন শনির গৃহে। শনি অত্যন্ত প্রাচীন ও বৃদ্ধ গ্রহ। আমরা কম্যুনিষ্ট গণকে বলি তোমরা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে ভিত্তি কর। হিন্দু সমাজের কর্ম্মবিজ্ঞানের ভিত্তি লও। দেখিবে তোমরা বল পাইবে। শক্তিবাদই হিন্দুসমাজের প্রাচীনতম মতবাদ। এই মতবাদ চোরা, শোষক, ধোকাবাজ, ঘুসখোর ও দুর্ভিক্ষের রাজ্য সমর্থন করে না। পাশ্চাত্যের বিদ্বেষবাদ লইবার তোমাদের মোটেই প্রয়োজন নাই। তোমরা শক্তিবাদের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া অসুরবাদ বিরুদ্ধ-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হও।

৫। গণেশবাদীরা যত দিন পশ্চিমের ভিত্তিতে থাকিবে তত দিন এই মতবাদে হিন্দুবিদ্বেষ, ম্লেচ্ছবাদ প্রীতি, ধনীবিদ্বেষ এবং নারী ফুসলাইবার দুর্নীতি প্রবল ভাবেই থাকিবে। আমরা হিন্দুগণকে শক্তিবাদ বিজ্ঞানে দাঁড়াইতে অনুরোধ করি। ইহার ফলে গণেশবাদী সম্প্রদায় সমাজের অনুকূলে থাকিবে। গণেশ শক্তিরই পুত্র। হিন্দুরা শক্তিবাদে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে গণেশবাদ বিলুপ্ত হইবে। হিন্দুরা দুর্ব্বলবাদ গ্রহণ করিবার দরুণ আমাদের দেশে গণেশবাদ আসিয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্তিবাদীয় উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়া দিতে অনুরোধ করি। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ উপাসনা প্রবর্ত্তন করিলে তিন বৎসরও কম্যুনিজম এদেশে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। ইহা তখন শক্তির পুত্রের মত শক্তিবাদী রাষ্ট্রের অনুকূলে আসিবে। সমাজ শক্তিবাদীয় নীতিতে দৃঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কংগ্রেস, সোসিয়ালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, চোরাবাদী ও ধোকাবাদী সব সম্প্রদায়ের রূপ বদলাইয়া যাইবে॥ গণেশবাদকে শক্তিবাদে ৫ কলার সমাজবাদ বলা হইয়াছে।

৬। সূর্য্যস্তরের চিন্তাধারা। ইঁহারা প্রেমী, কোমল স্বভাব, হিসেবী, সামান্য কৃপণ, একটু মেয়েলী প্রকৃতি, মেধাবী, যশস্বী, বিশ্বাসবাদী, ভাবপ্রবণ হন। ইঁহাদের প্রধান দুর্ব্বলতা অসুর সমাজকে যশের লোভে তোষণ করা। একদিকে শক্তিবাদ ও অন্যদিকে আসুরিকতা

এইরূপ দুইটী মতবাদের মধ্যস্থলে পড়িলে ইঁহারা দুইপক্ষেরই প্রিয় হইবার চেষ্টা করেন এবং বেশ গুছাইয়া মিথ্যা সত্য কথা বলেন। শক্তিবাদীরা এ স্তরের সমাজবাদীকে সব সময়ই অসুরবাদ হইতেও ক্ষতিকর মনে করেন। কারণ, ইহারাই অসুরবাদকে গড়িয়া তুলিয়া শক্তিশালী করে। এই চিন্তাধারা গণেশ চিন্তাধারার মতই অদূরদর্শী। কারণ ইহা খুব ভাল বিকশিত চিন্তাধারা নহে। সমাজের মধ্যে ইহারা বহুদিন পর্য্যন্ত অসুর সমাজের গুপ্তচর বৃত্তি করে। ভীরুতা যদিও এ স্তরের বিশেষত্ব কিন্তু কথায় ইহারা খুব সাহসের ভাব দেখায়। ইহারা কৃপণ প্রকৃতির কিন্তু দেখাইবে দাতার ভাব। এই স্তরের মানুষের এবং সমাজের চরিত্র অসুরবাদের যশের সামনে কিরূপ রূপ লইবে ইহা বুঝা কঠিন। অসুরবাদীদের বুদ্ধির নিকট ইহারা একটা বালকের তুল্যও নহে। মেয়েদের মধ্যে এ স্তরের বিকাশ থাকিলে স্নেহশীলা হন। শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, ব্যবহারজীবি, রাজদূত, গায়ক, কবি, সেবাশ্রমবাদী, ধর্ম্মসমন্বয়বাদী, অহিংসবাদী, কেরাণী, রেলওয়ে কর্ম্মচারী, ডাকখানা কর্ম্মচারী, পুরোহিত ও জ্যোতিষীগণের মধ্যে এস্তরের বিকাশসম্পন্ন মানুষ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তরের মানুষের মোহ অত্যন্ত বেশী কিন্তু ইহারা দেখাইবে মোহহীনতা।

৭। আমাদের দেশের পৌরোহিত্যবাদ সূর্য্যস্তর হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌরোহিত্যবাদ আমাদের সমাজকে বহুবার ধর্ম্মের নামে শাসন করিয়াছে। রামায়ণের শম্বুক উপাখ্যানে পৌরোহিত্যবাদের কথা আছে। শম্বুক একজন শূদ্র ছিলেন। শম্বুক তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহা বড় কথা নহে, কিন্তু বড় কথা একটা চাঞ্চল্যের চিত্র যাহা রামায়ণ চিত্রিত করিয়াছে। এই চাঞ্চল্য এত ব্যাপক যে স্বর্গের দেবতা ও মর্ত্তের ব্রাহ্মণরা ইহা দ্বারা বিচলিত হইয়া পড়েন। শেষ কালে শ্রীরামচন্দ্রকে সেই শূদ্রের মস্তক ছিন্ন করিতে হইয়াছিল। তবেই ব্রাহ্মণ বেচারার পুত্রটি বাঁচিয়া উঠিল। পৌরোহিত্যবাদের আর এক চিত্র আমরা পরীক্ষিতের মৃত্যুকালীন ইতিহাসে দেখিতে পাই। ঋষিপুত্র পরীক্ষিতকে শাপ দেন। এই শাপটি যাহাতে ফলীভূত হয় এজন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধতার কথা পদ্মপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ পুত্রের জীবনপ্রাপ্তি খুবই সুখের সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাদের শাপে রাজার অকাল মৃত্যু হয় এমন সম্প্রদায়কে সমাজ কেন সম্মান করিবে?

পৌরোহিত্যবাদ বৌদ্ধবাদের পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধবাদকে খণ্ডন করিয়াছিলেন তাই আবার পৌরোহিত্যবাদ এদেশে প্রবল হয়। সেই অবধি আমাদের দেশে পৌরোহিত্যবাদ বেশ প্রবল ভাবেই বিদ্যমান। ইহার পর আমাদের দেশে ভাববাদের প্রচার খুবই জোর হইয়াছিল। ফলে পৌরোহিত্যবাদ সমর্থকদের দল এদেশে অত্যন্ত শক্তিশালী। পৌরোহিত্যবাদের সমর্থনে কোনও সঙ্ঘ উঠিলে উহাকে ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পূর্ণ সমর্থন ও ধনদানে শক্তিশালী করিয়া লয়। পৌরোহিত্যবাদ ও ভাববাদ একই সূর্য্যস্তর হইতে আসিবার দরুণ - এই দুইটা চিন্তার একটি অন্যটিকে খুব শক্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।

৮। সূর্য্যস্তরের আরও নবীন সংস্করণ আমাদের সমাজ স্থান পাইয়াছে। ইহারা ভারতের আধুনিক বহু ভক্ত সম্প্রদায়; সমস্ত ভারত জুড়িয়া আধুনিক ভক্ত সম্প্রদায় বিদ্যমান। আসামে এসব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ অবতার নামে খ্যাত। বঙ্গদেশে নবীন

সূর্য্যস্তরীয় সম্প্রদায়গুলির প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রভু নামে খ্যাত। ভারতের সমস্ত প্রান্তেই ভক্ত সম্প্রদায় আছে। শিখ সম্প্রদায়ও এক যুগে সূর্য্যস্তরের ভক্ত সম্প্রদায় ছিল। গুরুগোবিন্দ ইহাদিগকে শক্তিবাদী করেন।

বঙ্গদেশের ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণবাদী সম্প্রদায়, সবই সূর্য্যস্তরে আটকাইয়া গিয়াছে। এসব সম্প্রদায়ই মুসলিম তোষণের যেন ঠিকেদারী লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কাজেই জিন্না যখন মুসলমান বর্ব্বরদের সংঘবদ্ধ করিয়া ভারত জুড়িয়া অত্যাচার আরম্ভ করিলেন তখন ভারতের আত্মরক্ষা ও নারীর মর্য্যাদা রক্ষার মত কোন শক্তিশালী ব্যবস্থা কেহ করিতে পারিল না। যাহারাই বর্ব্বরগণকে কঠোর প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহারাই নিন্দিত ও নির্য্যাতিত হইতেছিল।

৯। সূর্য্যস্তরের চিন্তার শেষ ও সর্ব্বনাশকর সংস্করণের প্রতিষ্ঠা দেন গান্ধিজী। ইহা মোটেই আশ্চর্য্যের কথা নয় যে মুসলমানেরা জিন্নাকে নেতা করিল এবং হিন্দুরা নেতা করিল গান্ধীকে। সূর্য্যস্তরের চিন্তাধারা ভারতের কোণে কোণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যাহার ফলে গান্ধিকে যাহারা বহিষ্কার করিতে পারে এমন শক্তিবাদীরা এই মূর্খদের সমালোচনার সামনে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ভারতের কম্যুনিষ্ট সোসিয়ালিষ্টরা পর্য্যন্ত গান্ধির নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া চলিল, এবং জিন্না পন্থী বর্ব্বরদের বর্ব্বরতা কালে ইহারা যত রকমে পারে বর্ব্বরদের সহায়ক হইল। সূর্য্যস্তরের চিন্তার কিরূপ প্রাবল্য ছিল ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। শক্তিবাদীয় চিন্তাধারা যে ছিল না, ইহাও বলা যায় না। কিন্তু তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই এবং সূর্য্যস্তরীয়গণ সংঘবদ্ধ ভাবে তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ হইতে দেয় নাই॥ ইহার ফলে ৩০ বৎসর ভীষণ গুণ্ডামী, নরহত্যা, নারীর লাঞ্ছনা, লুট ও গৃহদাহের পর ভারত ভাগ হইল। পূর্ব্ব পশ্চিম পাকিস্থানের হিন্দুদের একেবারে সর্ব্বনাশ হইল। ভারতের মুসলমানেরা দুই ভাগে ভাগ হইয়া একদল কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া শাসন বিধানে প্রতিশতে ৫০টি আসনের সমর্থন করিতে লাগিল এবং অন্য দল জিন্নার নেতৃত্বে বর্ব্বরতা ও ভারত ভাগের দলে গেল। সূর্য্যস্তরের এইরূপ প্রবলতার যুগে ইংরেজ ভারত ছাড়িল এবং সূর্য্যস্তরীয়গণের হাতে রাজ্যভার গেল। এই স্তরের উপর ভারতের যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা তাহাতে ভারতের ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না। আমরা শক্তিবাদে স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া রাখিয়াছি সমাজের কর্ত্তৃত্ব যদি সূর্য্যস্তরের হাতে থাকে তবে চোর, চোট্টা, গুণ্ডাদের রাজত্ব হইবে। কিন্তু ভারত আজ কেবল চোর চোট্টারই রাজ্য নহে, ইহা আজ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সর্ব্বনাশ গ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। এই স্তরের শাসন যদি ভারতে আরও কিছুদিন থাকে তবে ভারত আবার যবনের রাজ্য হইবে।

১০। সূর্য্যস্তরের চিন্তাধারাকে আমরা শক্তিবাদে ৬ কলার চিন্তা নাম দিয়াছি। ৫ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক নরনারীতে এই চিন্তা অত্যন্ত প্রবল রূপ ধারণ করে। বয়সের এই ভাববাদিতা বালক বালিকাগণকে দুর্ব্বল করিয়া দিলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এ জন্য মহর্ষিগণ এই ভাববাদিতার কালে, ৫ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে, প্রত্যেক বালক বালিকাকে গায়ত্রী দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পৌরোহিত্যবাদ এই শক্তিশালী দীক্ষাকে সমাজ হইতে বিলোপ করিয়াছে এবং শূদ্রবিদ্বেষের ভিত্তিতে সমাজ গড়িয়া ভারতের শক্তিবাদের অসীম ক্ষতি করিয়াছে।

ভাববাদী মহাত্মারা এই দীক্ষাকে অগ্রাহ্য করাইয়া দিবার যে কত ফন্দী করিয়াছেন উহা নবীন ভক্তিশাস্ত্র পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে ও বালিকা বিদ্যালয়ে ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ গায়ত্রী উপাসনা প্রবর্ত্তনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। আজ ভারত স্বাধীন। একটা স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব ভাববাদে রক্ষিত হইতে পারে না। ইহার ভিত্তিতে শক্তিবাদীয় কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান বাদের ভিত্তি দৃঢ় করা প্রয়োজন। ঋষিগণ এই বিজ্ঞান বুঝিতেন। পৌরোহিত্যবাদীরা ও ভাববাদীরা এই বিজ্ঞান হইতে দেশকে বঞ্চিত করিয়াছেন। শক্তিবাদীরা অগ্রসর হও এবং সমাজকে শক্তিশালী ভিত্তি দিবার জন্য প্রবল প্রচারে নামিয়া যাও। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ সুবিধা হইতে সমাজ জীবনের সুখ সুবিধা বেশী দেখাই শক্তিবাদীর শক্তিবাদিতা। নির্ভয়ে নামিয়া এসো। সমাজব্রত গ্রহণ কর। দুর্ব্বল পন্থিগণকে ভুলিয়া যাও। ইহারা অসুরতোষক এবং সমাজের ভীষণ সর্ব্বনাশ কারক। ইঁহারা আজ ভারতের স্বাধীনতা আনিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। ইঁহারা স্বাধীনতা তো কখনও আনেন নাই বরং ভারতের ভাগ ও সর্ব্বনাশ আনিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা আনিয়াছেন শক্তিবাদীরা যাঁহারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রক্ত দান করিয়াছেন এবং দেশে বিদেশে শত্রু নাশের কার্য্য করিয়াছেন। যেদিন ভারত তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিবে, সেইদিনই ভারতের সুদিন আসিবে, ইহার পূর্ব্বে নহে। যেদিন ভারতের এই সব দুর্ব্বল পন্থীরা তিরস্কৃত হইবে, সেইদিন ভারতের সু প্রভাত দেখা দিবে।

১১। বিষ্ণু স্তরের চিন্তাধারা। এই স্তরের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা মানুষকে কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি দান করে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, গম্ভীরস্বভাব ও চক্রী করে। ইহারা কথায়, কার্য্যে ও চিন্তায় এক প্রকারের নহে। ইহারা সন্দিগ্ধ চিত্ত হইলেও লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। ইহারা সংগঠনশক্তি সম্পন্ন ও ভোগীচরিত্র হন। ইঁহারা আদর্শবাদে বদ্ধ থাকেন না। শত্রুদমনে যখন যেমন প্রয়োজন তেমন নীতি গ্রহণ করিতে পারেন। বিষ্ণু স্তরের চিন্তাধারাকে আমরা তিন প্রকারে ভাগ করিয়াছি। দৈবী বিষ্ণু, আসুরিক বিষ্ণু ও অপুষ্ট বিষ্ণু।

স্বাভাবিক বিষ্ণু (দৈবী বিষ্ণু)। কোমল হৃদয়, সমাজ হিতৈষী, দাতা এবং উদার।

১২। আসুরিক বিষ্ণু। নিষ্ঠুর হৃদয়, উৎপীড়ক, গুণ্ডাদের নায়ক, বর্ব্বরের পরিচালক, অসুরসমাজ পরিচালক, শোষক ও সুবিধাবাদী।

রাজা, জমিদার, নির্ব্বাচিত মন্ত্রী, শাসন কর্ত্তা, রাজ প্রতিনিধি, গোয়েন্দা, পুলিশ কর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও আসুরিক বিষ্ণু পাওয়া যাইবে।

১৩। অপুষ্ট বিষ্ণু। ইহা কোন বিকাশের স্তর নহে। নিম্ন স্তরের শিব বা সূর্য্য স্তরের বিকাশ সম্পন্নগণ সংঘ বা রাজশক্তির প্রশ্রয় পাইয়া বিষ্ণুস্তর আয়ত্ত করে। অপুষ্ট বিষ্ণুগণ অত্যন্ত দুর্জ্জন প্রকৃতির লোক হয়। পৌরোহিত্যবাদিতা অপুষ্ট বিষ্ণুরই বিকাশ। আমাদের দেশের ৬ কলা পুষ্ট আন্দোলনকারী নেতাগণ হাতে রাজ শক্তি পাইয়া বিষ্ণু চরিত্র আয়ত্ত করিয়াছেন। ইঁহারাও অপুষ্ট বিষ্ণুতে আসিয়া গিয়াছেন। জনতা ইঁহাদের সম্বন্ধে ক্রমে অনেক কিছুই জানিতে পারিবে। আমরা ইঁহাদের দুর্ব্বলতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। ইহারা সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের ভীষণ ক্ষতির কারণ হয়।

নির্লজ্জ, মিথ্যুক, চাটুকার, অত্যন্ত স্বার্থপর, চোর ও গুণ্ডাদিতে এবং নিম্ন স্তরের পুলিসে এ স্তরের মানুষের সংখ্যা খুব বেশী। যাহারা অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া ভিক্ষা করে এবং অঙ্গহীন মক্কেল জুটাইয়া ভিক্ষার ব্যবসা চালায় ইহারা সব অপুষ্ট বিষ্ণু কলার লোক। পৌরোহিত্যবাদীরা প্রায় সকলেই অপুষ্ট বিষ্ণুর বিকাশস্থল হয়। সূর্য্য সমাজের সেবক বিভাগ, এই বিভাগ পৌরোহিত্যবাদের প্রসাদে সমাজের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছে। কাজেই ইহা অপুষ্ট বিষ্ণুর স্তরে দাঁড়াইবেই। যেখানেই দেখা যায় সূর্য্য কলার লোক সমাজ বা রাষ্ট্র কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে সেইখানেই তাহারা অপুষ্ট বিকাশ আয়ত্ত করিয়াছে। ইহারা কর্ত্তৃত্বের অযোগ্য, এ জন্যই ইহারা অপুষ্ট চরিত্র আয়ত্ত করিতে বাধ্য হয়। পৌরোহিত্যবাদীরা অপুষ্ট কলার বিকাশ ইহা সত্য, কিন্তু পুরোহিত বৃত্তিধারিগণ সূর্য্য কলার লোক। অপুষ্ট বিকাশীরা অত্যন্ত চালবাজ লোক হয়।

১৪। বিষ্ণু স্তরের চিন্তাধারার উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিক বিষ্ণু স্তরের চিন্তাবিজ্ঞানে সমাজ গঠিত হইলে, উঠা স্বাভাবিক সমাজ। আস্থরিক বিজ্ঞানে সমাজ গঠিত হইলে উহা আস্থরিক সমাজ হয়। স্বাভাবিক সমাজ বেশীদিন স্থায়ী হয়। উহা ভাঙ্গা দশায়ও বহুদিন থাকিয়া যায়। আস্থরিক সমাজ একদিন না একদিন ভাঙ্গিবেই। প্রায়ই দেখা যায় একটি আস্থরিক সমাজ অন্য একটি আস্থরিক সমাজকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ইহা যখন ভাঙ্গিবে তখন নিশ্চিহ্ন হইয়াই ভাঙ্গিবে।

১৫। আস্থরিক কর্ম্মবিজ্ঞানে পরিচালিত সমাজের বিভিন্ন দিক অপুষ্ট বিষ্ণু স্তরের লোক দ্বারা বেশীর ভাগ পরিচালিত হইয়া থাকে। এইরূপ সমাজে গণেশ ও সূর্য্য স্তরের চিন্তার কোনই প্রভাব থাকে না। অপুষ্ট চিন্তা ও আস্থরিক চিন্তা হাত ধরাধরি করিয়া অবস্থান করে। ইহারা একটি অন্যটির অনুপূরক ও পরিপূরক। পৌরোহিত্যবাদে ও ভাববাদে যেমন মিতালী আছে, ঠিক সেইরূপ আস্থরিকবাদের সঙ্গে অপুষ্টবাদে বিশেষ মিল থাকে। অপুষ্ট বাদীরা যে কোন প্রকার অস্থরবাদীদের আশ্রয়ে থাকিতে ভালবাসে।

১৬। স্বাভাবিক সমাজও বিষ্ণু স্তরের লোক দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। উন্নত স্তরের শিব বা ঋষিগণ ইঁহাদিগকে পরামর্শ দেন। গণেশ ও সূর্য্য স্তরের লোক গণ এবং নিম্নস্তরের লোকগণ ইহাদিগকে সাহায্য করেন। এইরূপ সমাজে আস্থরিক বিকাশ ও অপুষ্ট বিকাশের সুবিধা কম থাকে। কাজেই ইহা খুবই সুখময় সমাজ। উন্নত শিবস্তরের স্থানে পুরোহিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃত্ব করিবার দরুণ এই সমাজ বর্ত্তমান সময় দুর্ব্বল সমাজে পরিণত হইয়াছে। এখন ভাববাদিগণ এই সমাজের পৃষ্ঠে দুষ্টক্ষত রূপে এই সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

১৭। স্বাভাবিক সমাজবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ অস্থরবাদী নেতা দ্বারা বেশীদিন চলিতে পারে না, কারণ সমাজের বহু মত উহা সমর্থন করে না।

১৮। স্বাভাবিক বিজ্ঞানে গঠিত সমাজকে সূর্য্য স্তরের লোক পরামর্শ দিলে ঐ সমাজ দুর্ব্বল সমাজের মত নিস্তেজ হয়। ইহা স্বাভাবিক সমাজের ভাঙ্গা দশা মাত্র। পৌরোহিত্যবাদীরা (সূর্য্যস্তর) এই সমাজের পরামর্শদাতা হইবার দরুণ এই সমাজ এখন বিক্ষোভের সম্মুখীন হইয়াছে। ইহাকে ভাববাদী নেতারা আরও সর্ব্বনাশের স্তরে নামাইয়া দিয়াছেন। ভাববাদ, গান্ধিবাদ, সোসিয়ালিজম্, কম্যুনিজম, যুক্তিহীন ধর্ম্মসমন্বয়বাদ, খৃষ্টবাদ ও ইসলাম সবই স্বয়ম্ভূব মনু প্রবর্ত্তিত শক্তিশালী সমাজের উপর ভীষণ

সর্ব্বনাশকর বিক্ষোভ মাত্র। ইহাকে আবার শক্তিশালী করিবার জন্য প্রথম কাজ পৌরোহিত্যবাদের প্রধান আশ্রয়, উপাসনার বৈষম্যবাদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া। অর্থাৎ সমাজের সব স্তরে শক্তিবাদীয় উপাসনা বা গায়ত্রী উপাসনা প্রবর্ত্তন করা এবং খৃষ্টবাদ ও ইসলামীগণকে ঐ উপাসনায় দীক্ষিত করিবার জন্য জোর আন্দোলন সৃষ্টি করা। ভারতের বাইরেও এই একই উপাসনা প্রবর্ত্তনের জন্য ধর্ম্ম প্রচারক পাঠাও। গোত্র প্রবর্ত্তন, ১০ দিন অশৌচ প্রবর্ত্তন, গায়ত্রী উপাসনা, ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান, ব্রহ্মস্তুতি ও মহামন্ত্র প্রবর্ত্তনে চিন্তা ও শক্তি নিয়োজিত কর। দেখিবে, সমাজের দুর্ব্বল রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। সমাজ যদি পৌরোহিত্যবাদে আঘাত দিতে পারে তবে ভাববাদে আটকাইবে না। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে একই উপাসনা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতে হইবে। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ শক্তিবাদীয় উপাসনা জাতির ও সমাজের মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া দিবে। আজকাল সকলে জনশিক্ষার কথা বলে। আমরা বলি, উপাসনা ও ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান শিক্ষা দাও। ইহার ফলে রাষ্ট্রপতি হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বালক পর্য্যন্ত শক্তিশালী ও মহান হইবে। ইহার গণশিক্ষার মূল।

১৯। শিবস্তরের চিন্তাধারা। এই স্তরের চিন্তাধারাকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। উন্নত শিব এবং নিম্নস্তরের শিব। উন্নত স্তরের শিবের চিন্তাধারা যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, ত্যাগী, সন্ন্যাসী তপস্বিগণে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল এস্তরের মহাপুরুষের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। যখন হইতে ভারতে পৌরোহিত্যবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে তখন হইতে উন্নত শিবস্তরের মহাপুরুষদের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে। পৌরোহিত্যবাদীরা অপুষ্ট বিষ্ণু বিকাশ হইবার দরুণ অত্যন্ত স্বার্থপর ও নীচ প্রকৃতির মানুষ হইয়া থাকে।

উন্নত শিব স্তরের মহাত্মারা কখনও তোষক হন না। রাজা, সমাজকর্ত্তা ও শাসকগণকে তিরস্কার করিতে ইঁহারা কখনও ইতস্ততঃ করেন না। পৌরোহিত্যবাদীরা ও অপুষ্ট কলার শাসকগণ উন্নত শিবের সংস্পর্শে থাকিতে ভালবাসেন না। পৌরোহিত্যবাদী ও ভাববাদিগণ সূর্য্যস্তরের মহাত্মাগণকে বেশী শ্রদ্ধা দেখান। ইহার কারণ সূর্য্যস্তরের মহাত্মাগণ যশের কাঙাল হইয়া থাকেন। শিবস্তরের মহাপুরুষগণ কঠোর তপস্বী, শান্ত ও তেজস্বী হন। ইঁহারা গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, আসুরিক বিষ্ণু ও অপুষ্ট বিষ্ণু বিকাশ হইতে অনেক বেশী বুদ্ধিমান হইয়া থাকেন। অনেকের ধারণা উন্নত স্তরের ঋষিগণ হিমালয় প্রদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে তপস্যায় অতিবাহিত করেন। আমরা বলি, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী, বিশ্বামিত্র, অষ্টবক্র প্রভৃতির মত সমাজ হিতৈষী ও তেজস্বী মহাত্মারাই আমাদের সমাজের প্রধান পুরুষ। যাঁহারা বলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে মহাপুরুষ আছেন তাঁহারা ঐ কল্পনা ত্যাগ করিলেই ভাল করিবেন। আমরা অনেক দুষ্ট শাসক ও দুষ্ট পৌরোহিত্যবাদীকে সূর্য্যস্তরের মহাপুরুষদের পায়ে তৈল মর্দ্দন করিতে দেখিয়াছি। যাঁহারা নিজেদের সমাজ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্ব্বনাশ করেন তাঁহারা যদি কখনও উন্নত শিবস্তরের মহাপুরুষের সম্মুখীন হন তবে ভালভাবেই ধমকানি খাইয়া আসিবেন। ভারতের বুকে উন্নত শিবস্তরের সমাজহিতৈষী মহাত্মা সমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কালে বড়ই প্রয়োজন। শক্তিবাদে উন্নত শিবস্তরকে ৮ম কলার বিকাশ বলা হইয়াছে। ইঁহারা প্রাকৃতিক জীবন ভালবাসেন।

২০। নিম্ন শিবস্তরের বিকাশ খুবই কম বিকাশ। শক্তিবাদে ইহাদিগকে ৪।০ কলার বিকাশ বলা হইয়াছে। মুটে, মজুর, রাঁধুনী, চাপরাশী, পূজারী, পেয়াদা, চাকর, গাড়োয়ান, মেথর, ঝাড়ুদার, কম্পোজিটার, দপ্তরি, ভিস্তি, পাংখা কুলি প্রভৃতির মধ্যে এ স্তরের বিকাশ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও প্রাকৃতিক জীবন যাপন করে।

২১। শক্তিস্তরের চিন্তাধারা। রাজর্ষিদের মধ্যে এই স্তরের বিকাশ সম্পন্ন মহাপুরুষ অনেক হইয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, স্বয়ম্ভূব বৈবস্বত আদি মনুগণ, মহারাজ ইক্ষ্বাকু, রাজর্ষি জনক, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি এই স্তরের মহাপুরুষ। এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুদের সমাজবিজ্ঞান এমন শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে ইহাতে উন্নত শিবস্তরের ও শক্তি স্তরের মহাত্মার উদ্ভব হইতে পারে এবং তাঁহাদের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রও হইতে পারে। অন্য কোন দেশের সমাজবিজ্ঞানেই এই বিধান নাই। পাঠক জানিয়া রাখিবেন সব স্তরের মানব সব সমাজ বিধানে উৎপন্ন হয় না এবং উন্নত স্তরের মানবের কর্ম্মধারা গ্রহণ করিবার মত ব্যবস্থা সব সমাজবিধানে সম্ভব নহে। থিয়োসফিষ্টগণের ধারণা ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধনা সব দেশের সমাজ বিধানেই প্রচলিত হইতে পারে। আমরা বলিতে পারি তাঁহাদের দ্বারা প্লাবিত চিন্তাধারা সমাজের কোনই কল্যাণ করিতে পারিবে না যদি দুর্ব্বল ও অসুরবাদীয় সমাজবিধানগুলির পাশাপাশি শক্তিবাদীয় সমাজ তাঁহারা গড়িয়া না তোলেন। তাঁহারা গোত্র সংস্কার, ১০ দিন অশৌচ সংস্কার ও উপাসনা প্রবর্ত্তনে মন দিন, সমাজ কল্যাণকর ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে। যাহা হউক শক্তি স্তরের চিন্তাশীলগণের মধ্যে দুই প্রকারের চিন্তাশীল দেখিতে পাওয়া যায়। (১) উন্নত শিবস্তর মিশ্রিত শক্তিস্তর - বিশ্বামিত্র, অষ্টাবক্র, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি। (২) বিশুদ্ধ শক্তিস্তর - ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, স্বয়ম্ভূব আদি মনুগণ, ইক্ষ্বাকু, জনক, শ্রীকৃষ্ণ।

২২। শক্তিবাদে ও ক্রমবিকাশ বাদে শক্তিস্তরকে ১৬শ কলার বিকাশ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এ স্তরের বিকাশে খুব নিখুঁত বিভূতি। ৮ম হইতে ১৬শ কলার মধ্যবর্ত্তী আরও কতকগুলি কলার বিকাশ আছে। উহাদের নাম অবতার কলা। ৯ম হইতে ১৪শ পর্য্যন্ত অবতার কলা। ১৫শ ও ১৬শ পূর্ণ কলা। এই পূর্ণকলার একটী অর্থাৎ ১৫শটি যোগ ও সমাধির পথ হইতে নামেন না। এবং কোনই কর্ম্ম করেন না। শিষ্যও করেন না উপদেশও দেন না। ১৬শ কলার বিকাশে বিকশিতগণ কর্ম্ম করেন। অবতার কলার বিকাশে বিকশিতগণ গণেশ, সূর্য্য বা বিষ্ণু স্তরের মত চরিত্র প্রাপ্ত হন এবং অসুরবাদ ভাঙ্গিবার জন্য কোন বিশেষ কর্ম্ম করেন। ৮ম কলাকে শান্তি কলা বলে এবং ১৫ কলাকে পূর্ণ কলা বলে। ৮ কলার মহাত্মাগণ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মিগণকে শক্তিবাদীয় উপদেশ দান করিয়া অসুরবাদ ধ্বংস করান। এদিকে ভাববাদিগণ অনেক নাচন, কোঁদন ও খোকন বাদী মহাত্মাকে অবতার দাঁড় করাইয়াছেন। পাঠক জানিয়া রাখুন এ সব অবতার লক্ষণ নহে। অসুরবাদ ধ্বংসই অবতার লক্ষণ। অষ্টম কলায় বিকশিত হইবার পর মানবের জীবন্মুক্তির জ্ঞান হয়। এই অষ্টম কলা বিকাশের পর যাঁহাদের কর্ম্ম প্রবৃত্তি আসে তাঁহারা সকলেই অবতার। জীবন্মুক্তির পর কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসেন বলিয়া ইঁহারা অবতার। অনেকের ধারণা ঈশ্বর কাউকে পাঠান এবং তিনিই অবতার। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শান্তি কলার বিকাশের পর কর্ম্ম কলায় আসাই অবতার কলা। ইহা বিকাশেরই কলা। অবতার সব সময় হন না, সুতরাং অবতার কলা শক্তিশালী সমাজবাদে কোনও

প্রয়োজনীয় কথা নহে। কাজেই অবতার সম্বন্ধে কোনও কথা এখানে আলোচিত হইবে না। অবতার কলা একটী বিশেষ কলা। সমাজবিকাশবিধানে ইহাদিগকে টানিবার কোনই প্রয়োজন দেখি নাই। ইহারা গণেশ, সূর্য্য বা বিষ্ণু চরিত্র লাভ করে বলিয়া আমাদের সমাজ বিধানে ইহাদিগকে গণেশ, সূর্য্য বা বিষ্ণু স্তরে ধরিলেই চলিবে। গণেশ ৫ কলা কিন্তু অবতার হইলে ইঁহারাই ৯ এবং ১০ হন। সূর্য্য ৬ কলা, অবতার হইলে ইঁহারাই ১১ এবং ১২ হন। বিষ্ণু ৭ কলা, অবতার হইলে ইঁহারাই ১৩, ১৪ হন। শিব ৮ কলা, পূর্ণ অবস্থায় ইঁহারাই ১৫, ১৬ হন। এইজন্য ৪৷০, ৫, ৬, ৭, ৮ কলাকে এক রেখায় আনিলে সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান ১৬শ কলায় বা শক্তিবাদে দাঁড়ায়। এইরূপ রাষ্ট্রগঠনই শক্তিবাদ রাষ্ট্র। ইহাই পঞ্চায়েৎ গঠনের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানভিত্তি।

২৩। এই পর্য্যন্ত আমরা যে সব বিকাশের স্তরগুলি পাইলাম তাহারা এই রূপ:- (১) নিম্ন শিব। ইহাতে বিকাশ ৪৷০ কলা। (২) গণেশ। ইহাতে বিকাশ ৫ কলা। (৩) সূর্য্য। ইহাতে বিকাশ ৬ কলা। (৪) বিষ্ণু। ইহাতে বিকাশ ৭ কলা। (৫) আসুরিক বিষ্ণু। ইহাতে বিকাশ ৭৷৷০ কলা। (৬) অপুষ্ট বিষ্ণু। বিকাশ নিম্ন শিব বা সূর্য্য কলা। (৭) উন্নত শিব। ইহাতে বিকাশ ৮ কলা। (৯) উন্নত শিব ও শিব প্রধান শক্তি। বিকাশ ৮ কলা। (১০) অবতার কলা। বিকাশ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ কলা। পূর্ণ বিকাশ ১৫ কলা। (১১) বিশুদ্ধ শক্তি স্তর। বিকাশ ১৬ কলা।

ভারতীয় পঞ্চায়েৎ বিধানে রাজাকে বংশ পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ মানা হইয়াছে। নিম্ন শিব, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, উন্নত শিব ও শক্তি স্তরের কর্ম্মীদের সংমিশ্রণে সিংহাসনের পঞ্চায়েৎ গঠন করা হইত। প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্মিগণ নির্ব্বাচিত মন্ত্রী পাঠাইতেন। এই সব মন্ত্রীরাই সিংহাসনের পঞ্চায়েৎ। ঐরূপ ভারতীয় ডেমোক্রেসী যে মানবের রাষ্ট্র বিধানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা ইহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। আমরা রাষ্ট্রবিধান খুব শক্তিশালী ও অসুরবাদবিরোধী চাই এবং রাষ্ট্রবিধান সব মানুষের বিকাশের অনুকূল চাই। আমরা প্রগতি, অগ্রগতি, বক্রগতির রাষ্ট্রবাদের ফন্দীতে না পড়িয়া জনতাকে শক্তিবাদের দিকে আকর্ষণ করি।

জনতা যদি বংশগত রাষ্ট্রপতি না চায় গণভোটেই রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন হইবে। জনতা যদি দলপতি চায় তবে আমরা তাহাই মানিব। কিন্তু পঞ্চায়েৎ বিধানে মন্ত্রীসভা ভিন্ন রাষ্ট্রের সুখ নাই।

২৪। আমরা মনোবিজ্ঞানকে আরও সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম বিভাগ করিয়া দিতে পারি। প্রত্যেকটী স্তরকে পঞ্চীকরণ বিভাগে পাঁচ ভাগ করিয়া এবং পঞ্চীকৃত প্রত্যেকটীকে ত্রিবিধ করণে আরও তিন ভাগ করিয়া দিলে মানুষের মনোবিজ্ঞান ও সমাজের কর্ম্ম বিধানের আরও ভাগ করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজবিধানের জন্য আমরা যেরূপ ভাগ করিলাম তাহাই যথেষ্ট। ভোট বাদের মূর্খতায় না জড়াইয়া আমরা জনতাকে শক্তিবাদীয় রাষ্ট্রগঠন বিধানের দিকে আকর্ষণ করি।

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক

এই অধ্যায়ে মানবের সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন দিকগুলির আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন মানবের সমাজ ব্যবস্থার সবগুলি বিধানই মনোবিজ্ঞানের সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তর মাত্র। আজকাল জড় বিজ্ঞানের খুবই উন্নতি হইয়াছে। আমরা শিক্ষিত সমাজকে মনোবিজ্ঞানও বুঝিতে বলি। ইহার ফলে আমাদের সমাজবিধান সুন্দর ও মহান হইবে। সোসিয়ালিজম, কম্যুনিজম, ডেমোক্রেসি প্রভৃতি মতবাদকে অত্যন্ত অল্প মনোবিকাশের স্তর হইতে টানা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে পাঠকগণ সমাজের বিভিন্ন কর্ম্মবিভাগগুলির সঙ্গে অন্তর বিকাশের স্তরগুলির সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন।

১। সমাজ ব্যবস্থার প্রধান দিক - ''কেন্দ্রীয় শাসন''। আজকাল শাসন ব্যবস্থার এদিকটার নাম ''ষ্টেট''। কেন্দ্রীয় শাসনই আসল সমাজ। যে কোন প্রকারেই ষ্টেট গড় না কেন, উহা দুর্ব্বল, আসুরিক বা শক্তিশালী এই তিনের একটির লক্ষণ যুক্ত হইবেই। কর্ম্ম বিকাশে যাহা শক্তিস্তর সমাজজীবনে উহারই নাম ''ষ্টেট'' বা কেন্দ্রীয় শাসন। বর্ত্তমান যুগে ষ্টেট্‌কে গড়িবার নানা প্রকার কর্ম্ম বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। রাজতন্ত্র, রাজা ও প্রজা মিশ্রিত তন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং দলতন্ত্র ইহাদের অন্যতম। এখন মানুষ দলতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। যে কোন কর্ম্মবিজ্ঞানেই ষ্টেট্ গড়িয়া উঠুক না কেন, উহার কেন্দ্রীয় পরিচালক বিষ্ণুস্তরের লোক হইবেনই হইবেন। কাজেই এই কেন্দ্রীয় পরিচালক শক্তিশালী চিন্তার প্রভাবে চলিলে উহা শক্তিশালী ষ্টেট্ হইবে, আসুরিক চিন্তার প্রভাবে চলিলে উহা আসুরিক হইবে এবং দুর্ব্বল চিন্তার প্রভাবে পরিচালিত হইলে দুর্ব্বল ষ্টেট্ হইবে।

২। আমাদের দেশের অহিংস নামীয় একদল বিচিত্র বুদ্ধি ধারী মনুষ্য ভারতে দুর্ব্বলবাদীয় শাসন চালাইয়াছেন। ইহারা আপনাদিগকে ভীষণ চালাক ও ভারত হিতৈষী মনে করেন। ইহাদের মায়া কতদিনে জনতা ভুলিতে পারিবে তাহা আমরা জানি না। যদি অতি শীঘ্র এই সব স্বার্থপর ও অদূরদর্শীদের রাজ্য না যায় তবে ভারতের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হইবে। ইহারা হিংসা পন্থী বা অহিংসা পন্থী অথবা ইহারা হিন্দু বিদ্বেষী সম্প্রদায় ইহা বুঝা সহজ নহে।

৩। অসুরবাদীয় ভিত্তিতে কোরানবাদীরা ষ্টেট্ গড়িবার পরিকল্পনা করে। ইহা আল্লামিঞারই রাজত্ব। এই রাজত্বে কাফেরদের স্থান নাই। আল্লা মিঞার স্বর্গরাজ্যে কাফেরদের জন্য অগ্নি ও অত্যাচারের ব্যবস্থা আছে। মর্ত্তরাজ্যে আল্লাবাদীদের

অত্যাচারে আরব, পারশ্য, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্থান সবই কাফের শূন্য হইয়াছে। পাকিস্তানও অতি দ্রুত কাফের শূন্য হইতে চলিয়াছে। পৃথিবীর বুকে এই আল্লাবাদী বর্ব্বরদের বর্ব্বরতার প্রতিশোধ দিবার মত কাফেরশক্তি উঠিয়া পৃথিবীর সব দেশ হইতে এই বর্ব্বরবাদের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে কিনা উহা আমরা জানি না। আমরা যে কোন সমাজ হইতে এই আল্লাবাদীদিগকে বহিষ্কার কামনা করি। ইহারা কোরানের মতে আল্লা মিঞার আইন ভিন্ন অন্য কোন রাষ্ট্র বিধান মানিতে পারে না।

৪। কেন্দ্রীয় শাসনহীন সমাজব্যবস্থা কম্যুনিষ্টরা আবিষ্কার করে। কিন্তু শেষকালে দেখা গেল ইহারা শ্রমজীবিদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবী বিজয়ে বহির্গত হইয়াছে। আল্লা মিঞার রাজত্বের সব নীতির সঙ্গে এই মতবাদীদের সব নীতিরই সামঞ্জস্য আছে। আল্লা মিঞার রাজ্যে ইমানদার ভিন্ন অন্যের স্থান নাই। এই রাজ্যেও এই দলের বাহিরের কোন মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়া হয় না। ইহারা ক্রমে ক্রমে নীতি বদলাইতেছে। শেষকালে ইহারা কোথায় দাঁড়াইবে ইহা আমরা জানি না। যেমন এক যুগে মক্কাবাদীরা ভারতবর্ষের টক্করে আল্লামিঞার রাজ্য বিস্তৃতিতে বাধা পাইয়াছিল ঠিক সেইরূপ ইহারাও ভারতের সংস্কৃতি ও শক্তিবাদের টক্করে প্রবল বাধা পাইত। কিন্তু ভারতের নেতারা নিজেরাই অসুর তোষক ও শক্তিবাদের শত্রু। কাজেই ইহারা এদেশের মাটিতে এখনও শক্তিশালী হইবে। কিন্তু আমরা জানি একদিন শক্তিবাদের টক্করে কম্যুনিষ্টদের মতবাদে ভালভাবেই ঘুণ ধরিবে। যদি পরিস্থিতি অনুকূল হয় তবে বিপ্লবের পূর্ব্বে ভারতে শক্তিবাদ আসিবে। আর যদি দুর্ব্বলবাদীরা গদী ধরিয়া থাকে তবে দুর্ভিক্ষ ও গৃহযুদ্ধ ব্যাপক ভাবে দেখা দিবে। এবং শক্তিবাদের যুগ ইহার পরে আসিবে। জনতার জানা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় শাসনহীন সমাজ চলিতে পারে না। এবং শক্তিবাদীহীন শাসনও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। এজন্য জনতাকে বার বার আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইতেছে। মানব সমাজে শক্তিবাদ বিজ্ঞানহীন শাসন এক ভীষণ সমস্যা।

৫। সমাজ ব্যবস্থার দ্বিতীয় দিক - ধর্ম্ম। বিকাশে যাহা উন্নত শিবস্তর, সমাজ জীবনে উহারই নাম ধর্ম্ম। মনকে উন্নত ও শান্ত করিবার জন্য এবং মনের অধ্যাত্ম পিপাসা মিটাইবার জন্য মন্ত্র, হট, লয়, ও রাজযোগাদির অনুশীলনই ধর্ম্ম নামে খ্যাত। নানা প্রকারের ধর্ম্মমত এই পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। ''বেদ'' ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ। তপস্যা বৈদিক যুগের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান বিবেচিত হইত। তপস্যার দ্বারা মানুষের লৌকিক ও অলৌকিক উভয় প্রকার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রচারের কেন্দ্র স্বরূপ সর্ব্বত্র ঋষিগণের তপোবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখন মন্ত্র, হট, লয় ও রাজযোগাদির অনুশীলনই তপস্যার স্থান লাভ করিয়াছে। মানুষে উচ্চ বিকাশ ও উন্নত স্তরের জ্ঞানের আলোক দিবার জন্য যোগানুশীলনকে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাবিভাগ জানিতে হইবে। পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুদের মধ্যে এই বিধানের কঙ্কাল এখনও বিদ্যমান।

৬। এই ধর্ম্মবিভাগের উন্নত চিন্তাশীল মহাত্মাগণ সমাজ কর্ত্তা ও সমাজকে শক্তিশালী করিবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিতেন। পূর্ব্ব যুগে এই সব মহাত্মাগণ ঋষি নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ক্রমোন্নত সংস্কারগুলিকে আমরা ''হিন্দুধর্ম্মে

ধর্ম্ম-সংস্কার এবং উহাতে উন্নত বিকাশ বিজ্ঞান'' নামে একটা অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছি। উপযুক্ত প্রচারকের অভাবে হিন্দু ধর্ম্মের এই আনুষ্ঠানিক অংশ নানা প্রকারেই লোকচক্ষুর আকর্ষণের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ঋষিগণ সমাজের নিকট দুর্ব্বল, আসুরিক ও শক্তিশালী সমাজবিজ্ঞানের প্রধান প্রদর্শক ছিলেন। আমাদের সমাজের ধর্ম্মের এই শক্তিশালী অংশে ঋষির নামটাই আছে। পরবর্ত্তী যুগে পৌরোহিত্যবাদী ও ভাববাদী মহাত্মারা সমাজ গঠনের এই বৈজ্ঞানিক সূত্র হারাইয়া ফেলেন। এখনও নব্য ভাববাদী ও পৌরোহিত্যবাদী মহাত্মাগণের আশ্রম আছে। উঁহারা সমাজকে দুর্ব্বল করিবার কর্ম্মবিজ্ঞানে জড়াইয়া গিয়াছেন। প্রতিষ্ঠিত নেতা, ধনী লোক ও রাজকর্ম্মচারীদের তোষণ করাই এই সব আশ্রমবাদীদের ব্যবসা হইয়াছে। ঋষিদের চরিত্র সেইরূপ ছিল না। তাঁহারা অসুরবাদী রাজা, রাজকর্ম্মচারী, শোষক ও তোষণবাদের সমর্থন করিতেন না। শক্তিশালী স্তরের মহাত্মা গণ্ডায় গণ্ডায় হন না। কাজেই এই জন্য দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। শক্তিশালী কর্ম্মবিজ্ঞান ও সমাজবিধান আবার জাগ্রত হইবে। আজ দুর্ব্বলতার বীজ যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহারাই ঘটনার চাপে শক্তিশালী সমাজ গড়িবার সহায়ক হইতে বাধ্য হইবেন।

৭। দার্শনিকতাই ধর্ম্মের মূল বিষয়। সত্য হউক মিথ্যা হউক, যুক্তিযুক্ত হউক বা অযৌক্তিক হউক, মানুষের মন যতক্ষণ একটা বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে ততক্ষণ উহা তাহার ধর্ম্মেরই (?) কথা বুঝিতে হইবে। এই জন্যই মানুষের সমাজে শক্তিশালী, আসুরিক ও দুর্ব্বল, তিন প্রকারেরই ধর্ম্মবিধান প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সোসিয়ালিষ্টদের নাস্তিকতা, ইসলামের কাফের বিদ্বেষবাদ, পৌরোহিত্যবাদের অব্রাহ্মণ বিদ্বেষবাদ ও ভাববাদীদের ভাবপ্রবণতার মূলে যুক্তি কিছু থাকুক বা নাই থাকুক, মোহ ত আছে! কাজেই মোহও একটা প্রকাণ্ড দার্শনিকতা। মিথ্যা দার্শনিকতায় যখন আর মনের তৃপ্তি হয় না তখন সেই ছেঁদোবাদের লেজ ধরিয়াও মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে চায় এবং সমাজে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হয়। সে জন্য যত চেষ্টা, যত কর্ম্ম, যত প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় কিন্তু শেষকালে দেখা যায় মানুষ ধর্ম্মের মূল সূত্র যুক্তিবাদে পরিবর্ত্তন করিয়াছে। কাজেই আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। আমরা যাহা গড়িবার উহা গড়িবই, যাহা ভাঙ্গিবার উহা ভাঙ্গিবই, দুর্ব্বল ধর্ম্ম ও বর্ব্বর ধর্ম্ম ভাঙ্গিবেই।

৮। সমাজ ব্যবস্থার তৃতীয় দিক - সংস্কার। বিকাশের পথে যাহা বিক্ষুব্ধস্তর, কর্ম্ম জগতে উহারই প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কারের প্রয়োজন। বিবাহ বিধান সংস্কার ধর্ম্মের প্রধান অংশ। বিবাহ বিধানের সহিতই ৪ বর্ণব্যবস্থা জড়িত হইয়া গিয়াছে। গুণ, কর্ম্ম ও বৃত্তিভেদে যে বর্ণ ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছিল, বিবাহ বিধানে যাইয়া উহা স্থিতিতে দাঁড়াইয়াছে। গুণ ও কর্ম্মভেদ এখন অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কেহ বড় একটা এদিকে খেয়াল করে না; কিন্তু বিবাহটা ঠিক ঠিক স্ববর্ণে হওয়ার কথাটাই এখন বেশী ভাবে। ব্রাহ্মণের শূদ্রের বৃত্তি বা শূদ্রের ব্রাহ্মণ বৃত্তির গ্রহণ কেহই বিশেষ ভাবে না। আয় ও ধন ব্যবস্থাটা দেখা ও নিজের বর্ণ দেখিয়া বিবাহ দেওয়াটাই বর্ণ সংস্কার। বিবাহ সংস্কারকে কেন্দ্র করিয়াই ৪ বর্ণ হইতে ৪০০ বর্ণে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সমাজে গুণ ও কর্ম্মবিভাগে ৪ বর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু বিবাহ সংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া ৪০০ বর্ণের

উৎপত্তি হইয়াছে। ১ হইতে ৪ হওয়া এবং ৪ হইতে ৪০০ হওয়া দোষের কি? আমরা বলিব, ''না''। ৪০০ হইতে ৪ হওয়া দোষের হইবে কি? আমরা বলিব ''না''। ৪ হইতে ১ হওয়া দোষের হইবে কি? আমরা বলিব ''না''। হিন্দুরা যদি খৃষ্টান বা মুসলমান কন্যা বিবাহ করে কোন দোষের হইবে কি? আমরা বলিব ''না''। আমরা বিবাহ বিধানের নিয়ম লইয়া মাথা ঘামাইব না। আমরা শক্তিশালী সমাজ চাই। আমরা পৌরোহিত্যবাদীয় সমাজ ভাঙ্গিয়া দিব। আমরা শতবর্ণভেদের মধ্যেও বৈদিক সংস্কারের প্রবর্ত্তন চাই। বিভিন্নতার মধ্যেও হিন্দুরা যে এক একথা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিব। হিন্দু সভ্যতায় যে অন্য সভ্যতাকে গিলিয়া ফেলিবার শক্তি আছে উহা আমরা শত মুখে ফুটাইয়া তুলিব। কাহারও শক্তি নাই শক্তিশালী সমাজের গতি রুদ্ধ করিতে পারে।

৯। হিন্দুদের মধ্যে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, সমাবর্ত্তন, ও বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কার রহিয়াছে। ইহাদিগকে চলিত কথায় ১০ সংস্কার বলে (সংখ্যায় এই সংস্কারগুলি ১০ এর বেশী)। ইহা ভিন্নও শাক্তদীক্ষা, পূর্ণদীক্ষা, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্যদীক্ষা, মহাসাম্রাজ্যদীক্ষা, যোগদীক্ষা, মহাপূর্ণ দীক্ষা ও সন্ন্যাস নামক উচ্চ জ্ঞানযোগে প্রবেশসংস্কার রহিয়াছে। এই দীক্ষা নামক সংস্কারগুলি ধর্ম্ম বিভাগের অন্তর্গত। যোগসংস্কার এবং বিবাহ পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি সমাজ বিভাগের অন্তর্গত সমাজসংস্কার বলিয়া জানিতে হইবে। হিন্দুদের সংস্কারগুলি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সংস্কার অধ্যায় দেখুন।

১০। সোসিয়ালিষ্টরা বিবাহসংস্কার ভাঙ্গিয়া দিয়া অবাধ ভোগসংস্কার সমাজে স্থাপনা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা জন্মকালে সন্তানগণকে পিতামাতার কোল হইতে স্থানান্তরে রাখিয়া প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহারা এত মূর্খ যে ইহারা একটা সাধারণ মনোবিজ্ঞানও জানে না। সন্তান কেবল স্তনই খায় না, সন্তান মায়ের স্নেহও আহরণ করে। ওই সব মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিহীন বিজ্ঞানবাদ আলোচনা করিয়া আমরা সময় নষ্ট করিতে চাই না। প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে বিবাহ সময় পর্য্যন্ত কিছু না কিছু সংস্কার আছেই। উহাতে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকুক বা না থাকুক মানুষ পবিত্র জ্ঞানে উহা সম্পন্ন করে। ইহুদিবাদী ও ইসলামবাদীরা বালকের লিঙ্গকাটা (খতনাঃ) সংস্কারটি পর্য্যন্ত অতি পবিত্র ধর্ম্মাঙ্গ মনে করে।

১১। হিন্দুদের সামাজিক দশবিধ সংস্কার ভিন্ন চাতুর্ব্বর্ণ্য সংস্কার, উচ্ছিষ্টজ্ঞান সংস্কার ও অশৌচ বিধি সংস্কারও রহিয়াছে। আমরা অশৌচবিধি ও উচ্ছিষ্টজ্ঞান সংস্কারকে ব্রাহ্মণ বর্ণে প্রচলিত নিয়মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সমস্ত হিন্দুকে অনুরোধ করিব। হিন্দুদের উচ্ছিষ্টজ্ঞান সংস্কার অত্যন্ত উন্নত স্তরের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সংস্কার। ইহাতে হিন্দুদের বিশেষ নিষ্ঠা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিতে থাকিয়া দেখিয়াছি, ছাত্ররা পান ও আহারে উচ্ছিষ্টবিধান মান্য করে না। চা ও আহারের দোকানগুলিতে উচ্ছিষ্টবিধান অত্যন্ত অন্যায় ভাবে লঙ্ঘিত হয়। জীবাণুতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার যুগে সকলেরই উচ্ছিষ্টবিজ্ঞানে নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। হিন্দুদের ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ঋষিগণ, ধর্ম্ম সংস্কার, দর্শন, যোগবিধান ও সাধনা প্রভৃতি

প্রত্যেকটিই যে এই পৃথিবীস্থিত অন্য সমস্ত সমাজ বিধান হইতে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক ইহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। আমরা হিন্দুকে শক্তিশালী সংস্কারে সংস্কৃত করিতে চাই। শক্তিশালী ও দূরদর্শী সংস্কারকের অভাবে আমাদের সমাজ বহুদিন ব্যাপকভাবে সংস্কৃত হয় নাই বলিয়া ইহাতে বিক্ষোভ যথেষ্ট দেখা দিয়াছে। শক্তিবাদ বুঝিলে ইহার প্রতিকার কঠিন হইবে না।

১২। সমাজ ব্যবস্থার চতুর্থ দিক - শিক্ষা। ইহা সূর্য্য স্তরের চিন্তার বহির্ব্যবস্থা। মানবসমাজে শিক্ষার আশ্চর্য্যকর বিধান রহিয়াছে। মানুষের ভাষাকে অক্ষরের আকারে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ও উহাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন খুবই আশ্চর্য্যকর অনুষ্ঠান। মানব ভিন্ন অন্য কোন জীবেই শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। ধর্ম্ম ও প্রাকৃতিক সংস্কার সব জীবেই কিছু না কিছু বিদ্যমান। উহা না থাকিলে এক স্তরের জীব অন্য স্তরের জীবের নকল করিয়া লইত, কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা একমাত্র মানুষেই রহিয়াছে। আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশই দিলাম না। মানুষের লৌকিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, গৃহ ও স্বাস্থ্য এবং অলৌকিক সম্পদ - মনের উন্নত স্থিতি লাভ করিবার বিজ্ঞান, শিক্ষার মধ্যে এই দুইটি দিকই থাকা প্রয়োজন। মানুষের লৌকিক প্রয়োজনকে মিটাইবার জন্য উন্নত স্তরের মনোবিকাশের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। উহা ভিন্ন রাজধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, শিক্ষাদান, বিজ্ঞান ও কর্ম্মবণ্টন কোনটাই সুসম্পন্ন ও বিকাশের অনুকূল হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যয়নই শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। প্রাচীন হিন্দু শিক্ষা বিধানে ষড়ঙ্গবেদের অধ্যয়ন প্রারম্ভিক শিক্ষা ছিল। এখন যেমন দেশ, কাল, পাত্র ও প্রয়োজন সেইরূপ দৃষ্টি রাখিয়া সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন-বিধানের অনুকূল শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইবে। যাহাই প্রবর্ত্তন করা হউক না কেন উন্নত মনোবিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

১৩। সমাজ ব্যবস্থার পঞ্চম দিক - বিচারব্যবস্থা। ইহা গণেশ স্তরের কর্ম্মবিধান। সমাজকে অপুষ্ট বিষ্ণু, গুণ্ডামী ও আসুরিকতা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য শাসন বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহাতে নিরপরাধ ব্যক্তির উপর শাসনের কোপ পতিত না হয় এবং অপরাধীরা কঠোর দণ্ড ভোগ করে, এজন্য বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা বিশেষ শক্তিশালী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন। শাসক ও নির্ব্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসন ক্ষমতা যেমন স্বাধীন করিয়া দিতে হইবে, তেমনই অন্যায় করিলে তাঁহারাও অত্যন্ত কঠোর দণ্ড সহ্য করিবেন। রাজকর্ম্মচারী ও নির্ব্বাচিত মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নাগরিক পর্য্যন্ত সকলের জন্য দণ্ড বিধানের শক্তিশালী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া মানুষের স্বাভাবিক জীবন শান্তি ও সুখময় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

১৪। সমাজ জীবনের ষষ্ঠ দিক :- ''বৈজ্ঞানিক উৎসাহ''। গণেশ স্তরে 'বিজ্ঞানই' কর্ম্মবিধান। অনেকের ধারণা অভাব হইতেই আবিষ্কার হইয়া থাকে। বাস্তবিক উহা ঠিক কথা নহে। বিজ্ঞানপ্রতিভা এক স্তরের মানুষের জন্মগত প্রতিভা। উহার উৎসাহ দেওয়া এবং উহার জন্য কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা কেন্দ্রীয় নীতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। প্রাচীন হিন্দু যুগে ইহা স্থাপত্য বিভাগের অন্তর্গত বিভাগ ছিল। শিক্ষাবিধানের মতে বিজ্ঞান বিধানও মানুষের অত্যাশ্চর্য্য বিধান বলিতে হইবে। মানবেতর জীবের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান জীব অতি অল্পই রহিয়াছে যাহারা হাতে তুলিয়া একটি ঢিল ছুঁড়িতে পারে বা

একটি লাঠির সাহায্যে কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে। মানুষ সেই করণ শক্তিকে কিরূপ বিপুল শক্তিতে শক্তিমান করিয়া দিয়াছে, উহা দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। কলকব্জা, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, সমুদ্রপোত, বিমান, যুদ্ধের ব্যূহ, শহর ও প্রাসাদাদির পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ, বেতার, তারসংবাদ সবই বিজ্ঞান বিভাগের পরিকল্পনা জানিতে হইবে। প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই বিভাগ সমাজের যেরূপ সেবা করিয়াছে উহার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হইবে। এই বিজ্ঞানসম্পদকে আসুরিকগণ মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত করে। এই বিজ্ঞান সম্পদ দ্বারা শক্তিশালীরা সমাজ সেবা করিয়া থাকেন এবং এই বিজ্ঞান সম্পদের বলেই আসুরিক আক্রমণও প্রতিহত হয়, অথবা এই বিজ্ঞান সম্পদ দ্বারাই অসুরকে ধ্বংস করিতে হয়। বর্ত্তমান সভ্য সমাজের করণে সর্ব্ব উপাদান ইহাদের দান।

১৫। সমাজ ব্যবস্থার সপ্তম দিক - কর্ম্মবণ্টন ও বৃত্তি ব্যবস্থা। কর্ম্মবণ্টন ও বৃত্তি ব্যবস্থা অনেক স্থানে এখন কেন্দ্রীয় নীতির অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কলকব্জার অসম্ভব উন্নতির জন্য মানুষের ব্যষ্টিকর্ম্মশক্তির একটা বিশেষ অংশ কলকারখানাগুলি সম্পন্ন করে। কাজেই মানুষের কর্ম্মজীবনের কুটীর শিল্প ধ্বংস হইয়া যাইতেছে এবং বেকার সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে। উৎপাদন, কর্ম্ম ও বণ্টন ব্যবস্থার সামঞ্জস্যের জন্য সমাজকে কেন্দ্রীয় শক্তির ব্যবস্থার জন্য নির্ভর করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে বৃত্তিব্যবস্থার বেশীর ভাগই বংশ পরম্পরাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন আর ঐটুকুতে নির্ভর করা চলিতে পারে না। কারণ আন্তর্জ্জাতিক স্থিতির দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু কুটীর শিল্প ও বংশগত কর্ম্মবিভাগ যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় বরং কতকটা গড়িয়া উঠিতে পারে এবং যাহা আছে উহা রক্ষিত হয় সেই জন্য কেন্দ্রীয় বিভাগের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বংশগত বৃত্তিবিভাগ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বিজ্ঞান ও কর্ম্মবণ্টন বিজ্ঞান ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। যুদ্ধকালে বৃহৎ শিল্পব্যবস্থাতে শত্রুরা যত শীঘ্র আক্রমণ করিতে পারে হস্তশিল্পে উহা সম্ভব হয় না। কুটীর শিল্প বংশ পরম্পরায় যেরূপ আছে উহা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। গোপালন, চাষ, আবাদ, মাছধরা, কাঠকাটা, মুটেবৃত্তি, বৃক্ষরোপণ, মজুর বৃত্তি, কর্ম্মজীবির কেহই কর্ম্মত্যাগ করিবে না, উহা দ্বারা নিজেরা বিপদগ্রস্ত হইবে। কোন কর্ম্মই হীন কর্ম্ম নহে বা কোন কর্ম্মই উচ্চ কর্ম্ম নহে। সব শ্রেণীর হিন্দুরাই গায়ত্রীসংস্কার গ্রহণ করিবে কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। কর্ম্মকে হীন বুঝাইবার চেষ্টা যাহারা করিতেছে তাহারা হইতেছে পৌরোহিত্যবাদী। কর্ম্ম ব্রহ্ম, অন্ন ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্ম, মানব ব্রহ্ম ইহা মনে রাখিবে। শোষণবাদীরা হিন্দুদের বংশগত বৃত্তির বহু অংশ ভাঙ্গিয়া দিয়া ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এখনও যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে উহাকে নিজেরা ত্যাগ করিবে না। কম্যুনিষ্ট ও সোসিয়ালিষ্টগণের মতে উৎপাদনের করণগুলিকে ষ্টেটের হাতে দিলে সমাজে অন্ন ও বৃত্তি পরিস্থিতি সরল ও সুখের হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জনতাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে ইহার ফল অত্যন্ত খারাপ হইবে। ষ্টেটের হাতে কোন কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া সমাজের সুখের হইবে না। বংশগত বৃত্তি ও কর্ম্মবণ্টন এবং ছোট ছোট কারখানা থাকা সমাজ জীবনের বেশী অনুকূল। কোন প্রকারেই ষ্টেটের হাতে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফল সমাজের মঙ্গল জনক হইবে না। আমরা জনতাকে

টেলিফোন, ডাকবিভাগ ও রেলগাড়ীর পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ব্যবস্থায় মানুষের সুখ ও দুঃখের বিচার করিতে বলি। ষ্টেট্ যে কোন বিভাগ হাতে গ্রহণ করে উহাই নরক তুল্য হয় এবং নরক তুল্য হইতে বাধ্য। অযোগ্যের হাতে শক্তি ছাড়িয়া দেওয়াই ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজম। সমাজ যদি প্রত্যক্ষ নরক চায় তবে ঐ সব মূর্খতায় জড়াইবে। যে গাড়ীখানায় ৮০ জনের আসন থাকে তাহাতে চালান দেওয়া হয় ৮০০ জনকে। দুই পয়সার খামখানার দুই আনা মূল্য হইয়াছে। কিন্তু ডাকখানার অব্যবস্থা ৮ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৬। আজকাল সকলেরই ঝোঁক পড়িয়াছে রাজকার্য্য বা চাকুরি লইবার দিকে। রাজকার্য্যে সর্ব্ব সম্প্রদায় হইতে যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইবে ইহা বাঞ্ছনীয়। ইহা দ্বারা সমাজ হইতে শূদ্রাচার সংস্কার বহিষ্কার করিতে সুবিধা হইবে এবং সমাজে শক্তিবাদ সংস্কার বৃদ্ধি করিতে সুবিধা হইবে। কিন্তু ইহা করিতে যাইয়া কেহ কর্ম্ম বিশেষকে নিরুৎসাহিত করিবে না। কর্ম্ম বিশেষ ত্যাগ করিলে কেহই উচ্চ বর্ণ হইয়া যাইবে না। উচ্চ সংস্কার প্রতিষ্ঠা কর এবং ক্ষত্রিয়ের তেজ বীর্য্যকে সমাজে উদ্দীপন কর। সে সঙ্গে সবরকম কর্ম্মকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উহা নিশ্চল ভাবে সম্পন্ন কর এবং অহিন্দু ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া যে সব সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে সেইগুলিকে গিলিয়া ফেলিবার কথাই ভাব। পৌরোহিত্যবাদ প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথা তোমার ভেদেরই কারণ এবং উহারও সংশোধন করিতে হইবে। আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য প্রভাবে এখন জমিদার উচ্ছেদের পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফলে সমাজে উচ্চ সভ্যতার অনেক ভিত্তিই ভাঙ্গিয়া যাইবে। পরে উহা আর দাঁড়াইবে না।

১৭। সমষ্টি জীবনে সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আমরা অতীব সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। আমাদের সমাজ জীবনের কতসব সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞান সম্মত ভিত্তি রহিয়াছে, উহা না বুঝিতে পারিলে আমরা আমাদের সমাজ জীবনকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিব না। একদিন সমাজব্যবস্থার সর্ব্বদিকই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার সংশোধনের মধ্যে চলিয়া যাইবে। আমরা আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও সমাজকে শক্তিশালী করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিলে শীঘ্রই এই চিন্তা হিন্দুস্থানকে প্লাবিত করিবে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন শক্তিশালী ও সুখের হইবে। আমরা সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক ও সমাজ কর্ম্মিগণকে এই সমাজ বিধানকে সংশোধন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম সমাজের কথা

১। বর্ণাশ্রম সমাজ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে বৈদিক যুগীয় সমাজ ও প্রাকৃতিক সমাজ ছিল। বৈদিক যুগের সমাজের কঙ্কাল বঙ্গদেশে এখনও বিদ্যমান। প্রাকৃতিক সমাজও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এখনও আছে। প্রাকৃতিক সমাজ ভারতের বহুস্থানে অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। মহারাজ স্বয়ম্ভূব মনু যে সমাজ প্রবর্ত্তন করেন উহা এখন বর্ণাশ্রম নামে খ্যাত। ইহাই এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান সময় সব চেয়ে বৈজ্ঞানিক ও শক্তিশালী সমাজ। ইহা যে কত প্রাচীন তাহা অনুমান করা সহজ নহে। এই বিধানে রাজারাই সমাজকর্ত্তা ও সমাজনেতা এবং ঋষিগণ ছিলেন এই সমাজ বিধানের পরামর্শদাতা। এই বিধানে সমাজ পরিচালিত হইলে সমাজ যে শক্তিশালী সমাজে পরিণত হয়, ইহা পাঠকগণ সমাজ বিজ্ঞান অংশ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন। সমাজকর্ত্তারা ঋষির নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে আসুরিক বলিয়া অভিহিত হইতেন। পরে এই সমাজই পৌরোহিত্যবাদীদের নির্দ্দেশে পরিচালিত হইবার দরুণ দুর্ব্বল সমাজে পরিণত হইয়াছিল। স্বয়ম্ভূব মনু হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিত পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের হিন্দু সমাজের ইহাই ইতিহাস যে ইহা শক্তিশালী ভিত্তি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে এই সমাজবিধানের কোন কোন অংশে আসুরিক পরিচালকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পৌরোহিত্যবাদীরা এই সমাজকে নিজের স্বার্থের কামধেনু প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা বহুদিন চেষ্টা করিবার পর সফল হয় এবং ইহাকে দুর্ব্বল সমাজে পরিণত করে।

২। স্বয়ম্ভুব, স্বরোচিষ, উত্তমজ, তামশ, রৈবত, চাক্ষুষ এই ছয় জন মনু গত হইয়াছেন। এখন সপ্তম মনুর মন্বন্তর চলিতেছে। এইটা মহারাজ বৈবস্বত মনুর মন্বন্তর। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজাগণের আদিপুরুষ। মহারাজ ইক্ষ্বাকু, দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি মহামানবগণ এই বংশের বংশধর। গীতায় আছে মহারাজ বৈবস্বত নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুকে শক্তিশালী কর্ম্মযোগ বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। (গীতা, ৪র্থ অধ্যায় ১)। স্বয়ম্ভূব হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রবংশের মহারাজা পরীক্ষিত পর্য্যন্ত রাজত্বকালের ইতিহাস রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সুদীর্ঘকালের হিন্দুসমাজের ইতিহাসে কখন কিরূপ আসুরিক উত্থান ও পৌরোহিত্যবাদের নগ্নমূর্ত্তির তাণ্ডবলীলা হইয়াছিল উহা প্রকাশ করিলে হিন্দু সমাজ বিশেষ উপকৃত হইবে। মহারাজ পরীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়া সাহাবুদ্দিন গৌজনী অর্থাৎ মহারাজ পৃথ্বিরাজের সময় পর্য্যন্ত এই ৪০০০ বৎসর কালের ইতিহাস অর্থাৎ পৌরোহিত্যবাদ, বৌদ্ধবাদ ও

ভাববাদের সহিত শক্তিশালী সমাজের টক্কর কাহিনীকে আমরা পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণকে প্রকাশ করিতে বলিতেছি। এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে আমরা ইহা লইয়া বিশেষ আলোচনা করিতে পারিব না।

৩। শক্তিশালী সমাজে আসুরিক রাজার আবির্ভাব হইয়াছে এবং উহা মিটিয়াও গিয়াছে। কিন্তু পৌরোহিত্যবাদ যে হিন্দু সমাজের মুখে কালিমা মাখাইবার জন্য বহুদিন হইতে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল ইহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। মহারাজ রামের রাজত্বকালে এই পৌরোহিত্যবাদের নগ্ন ছবি আমরা শম্বুক উপাখ্যানে দেখিতে পাই। শম্বুকের তপস্যায় কেবল পৌরোহিত্যবাদিগণ শঙ্কিত হয় নাই; দেবতারা পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। ইহাতে এরূপ প্রমাণ হয় না যে শম্বুকের তপস্যা করিবার অধিকার ছিল না। শম্বুকের তপস্যা করিবার অধিকার ছিল এবং ঐ তপস্যাফলকে তিনি পাইবার উপযুক্তও ছিলেন ইহাই প্রমাণ হয়। যাহা হউক রামকে ইহাই বুঝানো হইয়াছিল যে শম্বুকের তপস্যার ফলে এক ব্রাহ্মণের পুত্র মারা গিয়াছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে এইরূপ তপস্যার কথা নিষিদ্ধ হইলেও কলির জন্য নিষিদ্ধ হয় নাই। ইহা মন্দের ভাল সন্দেহ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের অন্ত্যজ কন্যা বৃদ্ধা শবরীকে তপস্বিনী বলা হইয়াছে। তাঁহার তপঃপ্রতিভা ঋষিগণের সমতুল্য ছিল। তাঁহার তপস্যায় কেন কোন ব্রাহ্মণ পুত্র মারা গেল না তাহা বুঝা গেল না। রামায়ণে মানুষ তো দূরের কথা, পশুপক্ষীদের পর্য্যন্ত তপস্যায় অধিকারের কথা আছে। কাজেই শম্বুক উপাখ্যান অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয়। আমাদের মতে ইহা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা।

৪। রামায়ণ মহাকাব্যে পৌরোহিত্যবাদের দ্বিতীয় পাঠ সীতা চরিত্রে দেখিতে পাই। শ্রীরাম সীতার উপর অবিচার করিয়া সমস্ত হিন্দু সমাজে পৌরোহিত্য চিন্তার গোড়া পত্তন করিয়া যান। সীতাকে রাম লঙ্কায় সর্ব্বসমক্ষে অগ্নি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অযোধ্যায় আসিবার পর বৃথা লোকনিন্দায় তাঁহাকে রাম অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত ত্যাগ করেন। তাঁহাকে ছলনা করিয়া বনে পাঠাইয়া দেওয়া হিল। তাঁহার রক্ষার বা অন্নবস্ত্রের ও গৃহের ব্যবস্থাও রাম করিলেন না। রাম রাজত্বে যাঁহারা রামকে পরামর্শ দিতেন তাঁহারা কি তখন পরামর্শ দিতে পারেন নাই? শম্বুক উপাখ্যানে যাঁহাদের প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছিল সেইসব মহাত্মারা কোথায় ছিলেন? ইহার পরও অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে সীতাকে রাম আবার পরীক্ষায় আহ্বান করিলেন। সীতার চরিত্রে ইহাই সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ হইল যে তিনি পরীক্ষাও দিলেন, হতভাগ্য সমাজও ত্যাগ করিলেন। রাজার আসনে বসিয়া একজন বিচারক এইরূপ তিনটী অবিচার করিতে পারেন কি? একটা মামলায় একই আসামীকে একই অপরাধের জন্য বার বার তিনবার জেলের ব্যবস্থা করিতে পারেন কি? এমন মধুর রাম চরিত্রে সীতার উপর অবিচারের নিষ্ঠুর কাহিনী এতই প্রাণস্পর্শী যে ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয় না। রাম না হয় প্রজার সুখের কথা ভাবিয়া ছিলেন। কিন্তু পাত্রমিত্রগণ কোথায় ছিলেন? বলা বাহুল্য সীতার উপর অত্যাচার ও শম্বুকের মাথাকাটার উপাখ্যানই হিন্দু সমাজের আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তেজ, ত্যাগ, বীরত্ব, নারীর মর্য্যাদা ও নারীরক্ষার আনুষ্ঠানিক জীবন হিন্দু ১০০০ বৎসর ভাল রকমই ভুলিয়া গিয়াছে। এই ১০০০ বৎসর কাল মক্কাবাদীয় বর্ব্বরতা যে কত লক্ষ সতীর লাঞ্ছনা করিয়াছে উহার সীমা নাই। কিন্তু এই বর্ব্বরবাদকে সংস্কার করিয়া শুদ্ধ করিবার কোন

শক্তিশালী চেষ্টাই হইল না। মহাভারতের ব্যাসদেব শক্তিশালী সমাজের আদর্শ চিত্র বেশ ভালভাবেই আঁকিয়া দিয়াছেন। সেখানে পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতির জন্মের পাত্তাও নাই; অথচ ইঁহারাই হইতেছেন মহাভারতের যুগে মহাপুরুষ। কাজেই দেখা যায় বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কার গ্রহণ করিলে যে কোন লোক, তাহার জন্ম যেরূপ ভাবেই হউক না কেন, উন্নতি ও সমাজপ্রতিষ্ঠার চরম স্থানে দাঁড়াইতে পারে। সীতা হরণের প্রাক্কালে সীতা লক্ষণকে অন্যায়ভাবে তিরস্কার করিয়াছিলেন। লক্ষণ যদি সীতাকে সঙ্গে করিয়া রামের খোঁজে বাহির হইতেন তবে ব্যাপারটা এত গড়াইত না। আবার রামও সীতাকে অযোধ্যায় আনিয়া অসহায় অবস্থায় বনে পাঠাইয়া আরও একটি সীতা হরণের ব্যাপার দাঁড় করাইলেন। আমরা হিন্দু ইতিহাস হইতে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিবার জন্য এই সব কথার আলোচনা করিতেছি। রাম মন্দোদরীকে বিভীষণের রাণী করিলেন, তারাকে সুগ্রীবের রাণী করিলেন, কিন্তু সীতার বেলায় এক ঝুরি অবিচার করিলেন, সে কি পৌরোহিত্যবাদকে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য?

৫। মনে রাখিবেন সীতার মত গরীয়সী মহিলা হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিবেন যে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরীর স্থান সমাজে সীতার মতই সম্মান্য। রাজার আসনে বসিয়া রাম যাহা করিয়াছিলেন উহাতে প্রজারঞ্জনের আদর্শ ভিন্ন সীতার সঙ্গে রামের ব্যবহারের মধ্যে কোনও যুক্তিবাদ নাই। রাম একদিকে নিজের স্ত্রীর উপর অবিচার করিয়াছেন। অন্যদিকে আবদারী প্রজার মনোরঞ্জন করিয়াছেন। আমাদের বিচারে রামের ন্যায় করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হইলেও রাজা হিসাবে রামকে আমরা শ্রদ্ধা করি; কিন্তু পৌরোহিত্যবাদকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না। সাধারণের জন্য রামের আদর্শ নিজের স্ত্রীর জন্য কখনও অনুকরণীয় নহে।

৬। মহারাজা পরীক্ষিতের মৃত্যুকালীর ইতিহাসেও পৌরোহিত্যবাদের নির্লজ্জ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণ মহাভারতে ও ভাগবতে ঐ অধ্যায় পাঠ করুন। দেখিতে পাইবেন, শমীকপুত্রের শাপকে পরীক্ষিতের জীবনে ফলাইবার জন্য কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। যাহারা হিংস্রক প্রকৃতির লোক এবং যাহারা যজমানগণকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখে তাহাদের কৃত দৈব অনুষ্ঠান কখনও কাহারও জন্য শক্তিপ্রদ হইতে পারে না। আমরা পৌরোহিত্যবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী চিন্তাবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত একদল পুরোহিতকে গঠিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

৭। হিন্দুরাজা বা হিন্দু সমাজকর্ত্তারা এই পৌরোহিত্যবাদকে ভাঙ্গিয়া দিবার কোন শক্তিশালী সংস্কার আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অনেক স্থানে দেখা যায় রাজারা এই শ্রেণীকে বিশেষ কোন মূল্য দিতে চান নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহারা নিজেদের গান গাহিতে বিরত হন নাই।

৮। পুরোহিতরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাও নহে অথবা কর্ত্তাও নহে। এই সমাজের প্রবর্ত্তন করেন মনুগণ। ইঁহারা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোক নহেন, ইঁহারা ছিলেন ক্ষত্রিয়। হিন্দু সমাজ মূর্খ যে তোমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে! তোমরাও এত অদূরদর্শী যে হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া লইয়া নিজেদের প্রতিপত্তি প্রসার করিতে পার নাই! শক্তিস্তরের বিকাশ সম্পন্ন কর্ম্মীরাই হিন্দুসমাজ প্রবর্ত্তন করেন। মধ্যযুগে রাজারা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিফলিত করিয়া এই সমাজকে প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে পারেন

নাই। ইহা তাঁহাদেরই দোষ। এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের সমাজকর্ত্তারাও এই সমাজকে সংস্কার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। যখন দেখা গেল বর্ণধর্ম্ম বংশগত ভাবে প্রতিফলিত হয় না, তখনই ইহার সংস্কার করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ছিল। অথবা অন্য কোন নবীকৃত বিধানও ইহাতে প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ছিল। ''শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জাতবন্তঃ বিদ্যাদ্বৈশ্যাস্তথৈবচ॥'' (মনু ১০॥ ৬৫) অর্থাৎ ''চার বর্ণের যে কোন বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে কেহ যে কোন বর্ণের স্বভাবগুণ ও কর্ম্মলাভ করে সে সেই বর্ণ প্রাপ্ত হয়।'' ঋষি সন্তানগণ যে বিজ্ঞানে চারবর্ণে পরিণত হইয়াছিল, এই মনুস্মৃতি সেই কথাই পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তনের কথা বলিতেছে। আমরা বলিতে পারি, প্রতি বৎসর বা প্রতি যুগে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা মোটেই সহজ নহে। কাজেই আমরা মাত্র ইহাই বলিব - ''দ্বিজাতীকরণ সংস্কার'' প্রত্যেক বর্ণে ছড়াইয়া পড়িবে এবং শূদ্রবর্ণ উঠিয়া যাইবে। নারীদেরও গায়ত্রী সংস্কার হইবে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্রমেই প্রসার হইতে থাকিবে। শেষকালে ব্রাহ্মণের অশৌচবিধান ও ক্ষত্রিয়ের তেজবীর্য্যমাত্র থাকিবে। কর্ম্মভেদ বা বৃত্তিভেদ কেহই আর রক্ষা করিতে পারিবে না। এ বিধানে অন্য সব বিধান সংশোধন হইতে বাধ্য হইবে। সমাজ পৌরোহিত্যবাদের আঘাত খাইবার পূর্ব্বে যদি এরূপ বিধান প্রবর্ত্তিত হইত তবে এই সমাজ আঘাতের পর আঘাত ও বিক্ষোভের পর বিক্ষোভ সহ্য করিত না। বৈদেশিক রাজশক্তি বিদ্বেষবাদ এতটা ছড়াইয়া দিয়াছে যে কেহ শূদ্র থাকিতে চায় না। আবার অর্থসমস্যা এমন প্রবল হইয়া গিয়াছে যে চর্ম্মকারের কাজ করিতেও ব্রাহ্মণসন্তান উদ্বেগ বোধ করে না। আরও দেখা যায় উচ্চ সংস্কার না থাকিবার দরুণ সমাজ নিস্তেজও হইয়া যাইতেছে। পার্শ্বস্থিত সমাজ সেই সুযোগও লইতেছে এবং ভাববাদ, প্রেতবাদ অধিক কি যবনের কবর পর্য্যন্ত অসংস্কৃত হিন্দুদের পূজ্য বস্তুরূপে পরিণত হইতেছে। মোটামুটি বর্ণাশ্রম সমাজের ইহাই ইতিহাস।

৯। নৃকঙ্কাল তত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের ধারণা যে আর্য্যরা হিন্দুস্থানের বাহির হইতে আসিয়া থাকিবে। আমরা তাঁহাদিগকে উহার উত্তরে ইহাই বলিতে চাই যে তাঁহাদের ধারণা ভুল। ঋষিগণ দ্বারা মানব বংশ প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহাদের মস্তিষ্ক গঠনের বিভিন্নতায় বিভিন্ন প্রকারের মস্তিষ্ক কঙ্কালের বিভিন্নতা হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যত প্রকারের মস্তিষ্ককঙ্কাল পাওয়া যায় উহাদের প্রায় সবগুলি কঙ্কালই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত। অতএব ভারতকে কেন্দ্র করিয়াই যে মানব সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে ইহাতে মোটেও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময় হিন্দু সমাজে যে রূপ গোত্র প্রবর্ত্তিত আছে ইহাই যে আদি মানবের বংশের ক্রমধারা, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ অনেক খণ্ড প্রলয় এবং অনেক প্রকারের সমাজ বিজ্ঞানের উত্থান পতনের আমাদের এই সুপ্রাচীন ও সুমহান জাতির ইতিহাসে হইয়া গিয়াছে। কাজেই গোত্রপ্রবর্ত্তন যখন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে সেইরূপ ভাবে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। অসংস্কৃত মানব সমাজকে নূতন করিয়া সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাবে গোত্র সংস্কার দান করিতে হইবে। যে যাঁহার নিকট সংস্কৃত হইবে সে তাঁহারই গোত্র ধারণ করিবে অথবা সে কোন নূতন গোত্র গ্রহণ করিবে।

১০। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা চার বর্ণ। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারটি আশ্রম। বৃত্তি ও কর্ম্মবণ্টনের নীতিই চার বর্ণ এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত উচ্চ জীবন যাপনের নীতির নাম চার আশ্রম।

১১। ব্রাহ্মণ। সাত্ত্বিক গুণবিশিষ্ট সমষ্টি সমাজের এক অংশের নাম ব্রাহ্মণ। ইহারা জ্ঞানপ্রধান সমাজকর্ম্মী (বৈদিক ধর্ম্মবিধানে উপনয়ন সংস্কারহীন জ্ঞানীকে স্মার্ত্তবাদ ''ব্রাহ্মণ'' মানে নাই)। মানুষের মাথা খারাপ হইয়া গেলে মানুষের মনুষ্যত্ব বলিয়া যেমন কোন পদার্থ থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানশক্তিহীন সমাজ সমাজতত্ত্বহীন সমাজ মাত্র। জ্ঞানশক্তিহীন সমাজ যদি রাষ্ট্র শক্তির অধিকারী হয় তাহা হইলে সেই সমাজ আসুরিক সমাজে পরিণত হইয়া যায়। আবার রাষ্ট্রশক্তিহীন সমাজ যদি জ্ঞানযুক্ত হয় তবে উহাও ভেড়ার পালে পরিণত হয়। ভাবপ্রবণতা ও জ্ঞান এক বস্তু নহে, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। জ্ঞান শিবস্তরের লক্ষণ; ভাবপ্রবণতা সূর্য্য স্তর মাত্র। দুর্ব্বলতা বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ স্তরের জ্ঞান হইতে আসিয়া থাকে। এই তিনটি স্তরের জ্ঞানীরা দুর্ব্বল স্তরের জ্ঞানী মাত্র। মানুষের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া গেলে সেই মানুষ দ্বারা যেমন কোন শক্তিশালী কাজ হইতে পারে না (মাথায় মধ্যম নারায়ণ টিপিতে টিপিতে হয়রাণ হইতে হয়) সেইরূপ দুর্ব্বল জ্ঞানী পরিচালিত সমাজ দ্বারাও সমাজ রক্ষার কোন কাজই হয় না। এই ব্রাহ্মণ বা জ্ঞান শক্তির অংশ দুর্ব্বল হইয়া পৌরোহিত্যবাদরূপে পরিণত হইয়াছিল। আবার অন্য পথেও দুর্ব্বল স্তরের জ্ঞানিগণকে এবং ভাববাদী মহাত্মাগণকে কেন্দ্র করিয়া যে সব কর্ম্ম বিজ্ঞান আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহাদের প্রভাবে আমাদের সমাজ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতে চলিয়াছে। ভাববাদিগণকে জ্ঞানী বলা যায় না। আবার পৌরোহিত্যবাদও অজ্ঞানের লক্ষণ মাত্র। শক্তিশালী সমাজের জন্য সমাজস্থিত এই জ্ঞানশক্তি-অংশ বর্ত্তমান স্থিতির মধ্যে বড়ই সমস্যার কথা। ত্যাগের আদর্শে জীবন যাপন করা, সমাজকে দুর্ব্বল হইতে না দেওয়া ও সমাজকে শক্তিশালী হইতে সাহায্য করা রূপ কর্ম্মই ব্রাহ্মণদের কর্ম্মের প্রধান দিক। ইঁহারা সমাজের প্রকৃত মঙ্গলকারক অংশ বলিয়া ইঁহারা ''শর্ম্মন্'' নামে অভিহিত হন। ইঁহারা সমাজের মধ্যে উন্নত শিবস্তরের জ্ঞানশক্তি। শক্তিশালী জ্ঞানীরা অত্যন্ত পূজনীয় ও আদরণীয়, কিন্তু পৌরোহিত্যবাদীরা ঘৃণার যোগ্য। ইহা সকলের মনে রাখা প্রয়োজন।

১২। ক্ষত্রিয়। সমাজের সত্ত্ব + রজঃ গুণ মিশ্রিত কর্ম্মশক্তি। সমাজশৃঙ্খলা রক্ষা করা, সমাজ মধ্যস্থিত গুণ্ডা দমন করা, শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা, পার্শ্ববর্ত্তী আসুরিক শক্তিবিজ্ঞানে সঙ্ঘবদ্ধ দেশকে জয় করিয়া উহাতে শক্তিশালী সমাজ স্থাপনা করা রূপ কর্ম্ম ইঁহাদের কর্ম্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শাসন ও সৈন্য বিভাগীয় সমস্ত প্রকার কর্ম্মশক্তির বিগ্রহ ক্ষত্রিয়ত্ব। ইঁহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকেন বলিয়া ইঁহাদিগকে ''বর্ম্মন্'' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে সমাজপীড়কগণই অসুর ও রাক্ষস নামে অভিহিত হয় এবং এই শ্রেণীর সমাজ হিতৈষীগণই ''পুরুষোত্তমবাদী''।

১৩। বৈশ্য। সমাজস্থিত রজঃ + তমোগুণ সম্পন্ন কর্ম্মী সম্প্রদায়। ধনই ইহাদের প্রধান সহায়। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য দ্বারা সমাজকে সমৃদ্ধশালী করা এবং ধনকে গোপনে রাখা ইহাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া ইহাদিগকে 'গুপ্ত' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ইহাদের মধ্যে যাহারা শোষক তাহারা ঘৃণার যোগ্য এবং সমাজ হিতৈষী ও দাতাগণ আদরণীয়।

১৪। শূদ্র। সমাজস্থিত তমোগুণ প্রধান কর্ম্মী সম্প্রদায়। সেবা ও শিল্পই ইঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। শরীর খাটাইয়া ইঁহারা সমাজ সেবা করেন। ইঁহারা সমাজ সেবায় অত্যন্ত শক্তিশালী অংশ। বর্ত্তমানে ইঁহাদিগকে মজুর সম্প্রদায় বলা হয়। পৌরোহিত্যবাদীরা ''শূদ্র'' শব্দটীকে অত্যন্ত ঘৃণাসূচক শব্দতে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই ''দাস ও শূদ্র'' শব্দ বর্ত্তমানে অপমান শব্দে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর যে কোন দেশের কথাই ধর না কেন, সমাজ সেবা এই চার ভাবেই হইয়া থাকে। এই স্তরের মানবে যাঁহারা অনলস কর্ম্মী তাঁহারা আদর যোগ্য। কিন্তু শূদ্রত্ব হইতে তামসিকতা ও গুণ্ডামী আসিয়া থাকে। তামসিকতা ও গুণ্ডামী দমনযোগ্য কুৎসিৎ অভ্যাস। চারবর্ণের ব্যবস্থা থাকুক আর না থাকুক গুণানুসারে কর্ম্মের এই চার প্রকার ভেদ থাকিবেই থাকিবে। আমরা চার বর্ণের বংশপরম্পরা অংশকে তিন বর্ণে পরিণত করিবার পরামর্শ দিতেছি। আমরা উহা বলি আর নাই বলি তিন বর্ণে হিন্দুদের পরিণত হইতেই হইবে। এখন প্রশ্ন এই যে ইহা দ্বারা সমাজের কর্ম্মব্যবস্থা জটীল হইবে কিনা। ইহার উত্তর - 'না'। বেশী অর্থ দিলে সব কাজের জন্য সব শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগে হিংসাকে হীন কর্ম্ম বলা হইলেও কসাইয়ের বা ব্যাধের অভাব হয় নাই। প্রঃ- কিন্তু পায়খানার কাজ কেহ করিবে না? উঃ- পায়খানার কাজ যদি কেহ না করে তবে তোলা পায়খানা উঠিয়া যাইয়া অন্য কোন বিজ্ঞান সম্মত পায়খানার প্রবর্ত্তন হইবে। আমরা অতি অল্প ব্যয়ে নির্দোষ ও বৈজ্ঞানিক পায়খানার পরিকল্পনা জানি। অতি দরিদ্রও এই পায়খানা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে। এক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য অন্য এক সম্প্রদায়কে হীন করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমরা জানি ময়লাবাহী মোটর গাড়ী চালাইবার জন্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দু কর্ম্মীর অভাব হয় না। দ্বিজাতিকরণ করিলে কর্ম্মব্যবস্থার জটিলতা আসিবার ভয় যাহারা করে তাহারা পৌরোহিত্যবাদটুকু মাত্র বোঝে, শক্তিবাদ বোঝে না। আমরা জানি বিশৃঙ্খলা হইবে না।

১৫। সম্প্রদায় বিশেষকে ''শূদ্র'' বলিবার দরুণ কর্ম্ম ব্যবস্থা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এই জন্য গৃহস্থ বাড়ীর কাজের লোক পাওয়া যায় না। আলমোড়া অবস্থান কালে আমি দেখিয়াছি মজুরের কাজ করে এমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রাই বাসন মাজা ও রান্নার কাজে আগ্রহের সহিত যোগদান করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, ''কাজে দোষ কি ? আমরা অন্যের হাতে কাচা রান্না খাই না। ইহা তো বোঝাটানা হইতে আরামের।'' মনে মনে জানিলাম - পৌরোহিত্যবাদ এখনও ভালভাবে শিকড় জমায় নাই। উত্তরাখণ্ডের অনেক স্থানে অনুলোম বিধিতে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। শাস্ত্রের সঙ্গে সমাজজীবনের সামঞ্জস্য এইরূপভাবে আর ক'দিন থাকিবে কে জানে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আচারের সহিত শূদ্রের আচারের ইহাই সনাতন ভেদ যে তিন বর্ণের বিধবাদের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের অকাট্য বিধান আছে। কিন্তু শূদ্রের জন্য উহা নাই। এখন সর্ব্ব বর্ণেই বিধবার পুনঃ বিবাহের নিয়ম প্রবর্ত্তন হইতেছে। উচ্চ বর্ণ যখন হীন বর্ণের মত বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তন করিতেছে তখন হীন বর্ণ যদি গায়ত্রী সংস্কার গ্রহণ করে

দোষ কি? বঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র ব্রাহ্মণ, শূদ্র, অন্ত্যজ সকলেই ১০ দিন মাত্র অশৌচ পালন করিয়া থাকে। পৌরোহিত্যবাদের প্রভাব হিন্দুদের মধ্যে নানা প্রকারেই কর্ম্মসমস্যা উদ্ভব করিয়াছে। উত্তর বঙ্গের কোন হিন্দুকে মাটী কাটার কাজ করিতে বলিলে অপমান বোধ করে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে - ''মাটি কাটা নীচদের কাজ। উহা পশ্চিমীরা করে।'' সংযুক্ত প্রান্তের কৃষি জীবি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থগণ হালচাষ করে না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে - ''হালের মুষ্ঠী ধরাটা নীচ কাজ। ঐ মুষ্ঠী ধরা ছাড়া আমরা কৃষির সব করিতে পারি।'' এই সব প্রান্তে মজুর শ্রেণীর মেয়েরা পাহাড়ে জঙ্গলে একাকী যাইয়া অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে পাথরের খনিতে কাজ করে। জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করে। ইহা কোন দোষের মনে করে না। কাহারও বাড়ী যাইয়া সব রকম মজুরীর কাজ করিবে উহা কোন দোষের হইবে না। কিন্তু যদি দেখিতে পায়, ওর দেওয়া জলে কেহ স্নান করিল তবে সে জল আর দিবে না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ''আমরা স্নান, কাপড় কাচা ও বাসন মাজার কোন কাজেরই অংশ লইব না। এসব করিলে বা এসব কাজের অংশ গ্রহণ করিলে সমাজ কর্ত্তারা আমাদের উপরে অর্থ দণ্ড করিবে।'' অনেক স্থলে দেখা যায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নারীরা বাসন মাজার কাজ পছন্দ করেন না। বলে ''বাসন মাজিলে হাতের গঠন খারাপ হইয়া যাইবে।'' বঙ্গদেশে অনেক স্থলে মৎস্যজীবিরা মাছ ধরার কাজ, নাপিতেরা চুল কাটার কাজ, ধোপারা কাপড় কাচার কাজ, গোয়ালারা গোপালন, বারুইরা পানের চাষ ও বহুপ্রকার সমাজ শ্রমজীবিকার ভাল ভাল উপার্জ্জনের পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য এসব ক্ষুদেপুঁটী সমাজ সংস্কারকগণের কুকীর্ত্তি। তেজ, বীর্য্য, সাধন, ভক্তি ও কর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া যত প্রকার নীচতা, বিদ্বেষ ও কর্ম্মহীনতা সমাজে প্রবেশ করানো হইতেছে। নব্য ছেলে মেয়েরাও কর্ম্মকাতর, স্বাবলম্বহীন ও অসল হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। এসব নানাপ্রকার জটিল বিক্ষোভ সমাজকে কলুষিত করিতেছে। নেতা ও সমাজ কর্ত্তারা সাবধান হও। প্রকৃতি এই সমাজে ভীষণ বিক্ষোভ প্রস্তুত করিয়া দিবে এবং সব রকমের কাজ সকলকে দিয়া করাইতে বাধ্য করিবে। চার বর্ণ সম্বন্ধে বলা হইল, এবার চার আশ্রম সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

১৬। ব্রহ্মচর্য্য। শিক্ষার জীবনই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম। ৫ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবনের নাম ব্রহ্মচর্য্য। যৌবনে ভোগলিপ্সা প্রবল হয়; কিন্তু উহাকে দমনে রাখিতে পারিলে জীবন সুখময় হয়। উহা দ্বারা স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সন্তান পুষ্ট হয় এবং জ্ঞান অর্জ্জন সহজ হয়। হিন্দুনেতাদের তত্ত্বাবধানতার অভাবে হিন্দু সভ্যতার এমন সুন্দর ও প্রধান ধর্ম্মাংশ আজ পর্য্যন্ত সুন্দর ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে না। প্রত্যেক বিদ্যানিকেতনে সরস্বতী পূজার সময় হিন্দু ছাত্রছাত্রীগণকে প্রতিবৎসর ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা দান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের সংস্কার করিয়া দেওয়া কোন কঠিন অনুষ্ঠান নহে। ১২ টার সময় হিন্দু অধ্যাপকগণ বিদ্যার্থিগণকে লইয়া অনায়াসে উপাসনার ব্যবস্থা করিতে পারেন। সায়ম্ ও প্রাতঃকালে বিদ্যার্থীদের পিতামাতাগণ পাঠের পূর্ব্বে উপাসনার অভ্যাস করাইলে কোন অসম্ভব কাজ হইবে না। যাহারা বিস্তারিত সন্ধ্যোপাসনা করিতে চাহে, তাহারা উহাও করিতে পারে। কেবল পৌরোহিত্যবাদ ও ভাববাদকে দোষ দিলে

চলে না। শক্তি (গায়ত্রী) উপাসনা প্রবর্ত্তন না করিলে সমাজকে শক্তিশালী করা সহজ হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু কর্ত্তৃপক্ষের এদিকে বিশেষ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে।

১৭। এখন পূর্ব্বেকার মত গুরুগৃহ বিধান আর নাই। যখন শিক্ষা বিধানের নূতন ব্যবস্থা হইয়াছিল সেই সময় ব্রহ্মচর্য্য বিধানেরও মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া হিন্দু কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা কেন ইহা করেন নাই, ইহা আশ্চর্য্য কথা।

১৮। আসল কথা আমরা আজ পর্য্যন্ত একটিও হিন্দুনেতা পাইলাম না, যিনি হিন্দু জীবনের সর্ব্বদিক বুঝিবার শক্তি রাখেন। ইতিহাসের দিকে তাকাও, দেখিতে পাইবে পরাধীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের সমাজে বড় বড় বিখ্যাত মহান পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সমাজের দিকে তাকাও, দেখিতে পাইবে ভাববাদের দুর্ব্বলতা ও পৌরোহিত্যবাদের সমাজ বিদ্বেষের তাণ্ডব নৃত্য। দেশের উপর এক একটা নূতন চিন্তা আসে আর আমরা ভাঙ্গিয়া যাই সেই চিন্তার বাধাহীন বন্যায়। ইহা একটি শক্তিশালী প্রাচীন জাতির জন্য অত্যন্তই সর্ব্বনাশকর ঘটনা। ইস্‌লাম আসিল ভাঙ্গিল হিন্দুকে, ইংরাজ আসিল ভাঙ্গিল হিন্দুকে, খ্রীষ্টবাদ আসিল ভাঙ্গিল হিন্দুকে, কংগ্রেস আসিল ভাঙ্গিল হিন্দুকে, শাসন সংস্কার আসিল ভাঙ্গিল হিন্দুকে, স্বরাজ আসিল ভাঙ্গিল হিন্দুকে। যাঁহারা নেতা, যাঁহারা শাসক, তাঁহারা নিজেদের জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে স্বীকার করাটাও পাপ মনে করেন। মূর্খতা, অদূরদর্শিতা, স্বজাতি ও স্বকৃষ্টি বিরোধিতা এবং মুসলমান তোষণই তাঁহাদের শীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরও কতকাল এইরূপ অত্যাচার এই সমাজে চলিবে কে জানে?

১৯। ব্রহ্মচর্য্য কি ?

(ক) মহাশক্তির উপাসনাই ব্রহ্মচর্য্য। ইহার অন্য নাম গায়ত্রী উপাসনা।

(খ) যৌবনাগমনের পূর্ব্ব হইতে সংযম ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করাই ব্রহ্মচর্য্য।

(গ) ছাত্র জীবনে এই দুইটি নিয়ম অবশ্য পালনীয় বলিয়া ছাত্র জীবনই ব্রহ্মচর্য্য।

(ঘ) ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিধি পালন করিতে হয়। বিদ্যাভ্যাস কালে ব্রহ্মচর্য্যের বাহ্য বিধি পালন করিলেই চলে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনের উপর বা চিত্তস্থৈর্য্যের উপর জোর দিতে হয়। তবেই ব্রহ্মচর্য্য জীবন বিশেষ আনন্দপ্রদ হইবে। হিন্দুরা বিশেষ ভাবে যুক্তিবাদ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই উহারা কিছু করার চেষ্টা না করিয়া নানা প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে বিশেষ ভালবাসে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান কথা চিত্ত স্থির করিবার বিজ্ঞান আয়ত্ত করা। ইহাকে ভিত্তি করিতে হয় এবং নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। বলা প্রয়োজন চিত্তস্থৈর্য্য ও নিয়ম পালন সহ গায়ত্রী উপাসনাই ব্রহ্মচর্য্যের আসল কথা। বৃথা যুক্তিতর্ক না করিয়া এই কয়টি কথা বুঝিবে এবং নিয়ম কয়টি পালন করিবে।

(১) যৌন ব্যাপার হইতে শরীরকে দূরে রাখিবে। অর্থাৎ যৌন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে দূরে থাকিবে।

(২) যৌন বিষয়ে বলিবে না, শুনিবে না, পড়িবে না।

(৩) যৌন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। (প্রত্যহ রাজযোগের অতি সাধারণ ক্রিয়া অভ্যাস করিলেই মন বশীভূত হয়)।

২০। ব্রহ্মচর্য্য মূলক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ক নিয়ম।

(১) প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবে। বাহিরে আসিয়া সূর্য্য প্রণাম করিবে। মাটিতে মাথা হাতের উপর লাগাইয়া প্রণাম করিলে শরীরে রোগ আসে না, মাথা ধরে না, মাথা ধরার রোগ থাকিলে সারিয়া যায়। মাথা ঠাণ্ডা থাকে। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। মেধা ও কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা স্বাস্থ্য ও মস্তিষ্ক পুষ্টির ভাল বিধান।

(২) সাবধানে দাঁতুন করিবে। যাহাতে দাঁতের মাড়ি ক্ষয় হইয়া না যায় ও মাড়ি কাটিয়া না যায়। মাড়ি ক্ষয় হইয়া গেলে দাঁত শীঘ্র পড়িয়া যাইবে। দাঁতে কোন প্রকার ময়লা থাকিবে না, আবার মাড়িতে আঘাতও লাগিবে না এরূপ ভাবে দাঁতুন করিবে।

(৩) নিত্য ব্যায়াম করিবে বা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিবে। মনে আনন্দ ও উৎসাহ রাখিবে। স্বাবলম্বী হইবে।

(৪) মূত্র ত্যাগের পর মূত্রদ্বার ধুইবে এবং মুখ ও হাত পা ধুইবে। ইহাতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে ও বীর্য্য দৃঢ় ও স্নিগ্ধ থাকে। মূত্র সম্বন্ধীয় রোগ হয় না।

(৫) সকালে বৈকালে নাকের এক ছিদ্রে জল প্রবেশ করাইবে ও অন্য ছিদ্র দ্বারা উহা বাহির করিয়া ফেলিবে। জল নাকে টানিবে না, মাথা পেছন দিকে একটু লটকাইয়া দিয়া একটু জল এক রন্ধ্রে দিবে এবং মাথাটি বিপরীত দিকে ঝুকাইয়া দিবে। ইহাতে জল আরামের সহিত বাহির হইয়া আসিবে। ইহাকে 'অঘমর্ষণ' ক্রিয়া বলে। ইহা দ্বারা মাথা ঠাণ্ডা থাকে, চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। চক্ষু কখনও খারাপ হয় না।

(৬) মলত্যাগ কালে বিশেষ কোঁথ দিবে না। মলত্যাগ করিতে করিতে ৪০-৫০ বার আঁৎ মারিবে। ইহাতে দাস্ত আরামে হইবে। ব্যাঙ যখন মলত্যাগ করে এই ভাবেই করে। পাখীরাও এই ভাবে মলত্যাগ করে। ইহাতে শরীর নীরোগ থাকে ও আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং মন প্রফুল্ল থাকে।

(৭) মলমূত্র ত্যাগ কালে বা যে কোন প্রকারের অপান বায়ুর কার্য্যকালে দাঁতে দাঁত চাপিয়া রাখিবে। ইহাতে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় এবং দাঁত পড়ে না। পশুরা এই ভাবে মলমূত্র ত্যাগ করে ও সম্ভোগাদি সমস্ত প্রকার অপান বায়ুর কার্য্য করে।

(৮) শয়নের পূর্ব্বে পা ধুইবে না। শয়নের পূর্ব্বে জলপান করিবে ও ভোরে শয্যা ত্যাগ করিয়া আট গণ্ডুষ জলপান করিবে। হাতে হজম ভাল হয়, মাথা ঠাণ্ডা থাকে, বীর্য্য দৃঢ় হয়, মন ভাল থাকে, মলত্যাগ সহজে হয়। শাস্ত্রে ইহাকে সর্ব্বরোগ নাশক ক্রিয়া বলে।

(৯) দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়া শয়ন করা সবচেয়ে ভাল। ইহাতে বাধা থাকিলে পূর্ব্বদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিবে। পৃথিবীর সঙ্গে ধ্রুব নক্ষত্রের একটি ও সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর আরও একটি শক্তি ক্রিয়ার গতিসূত্র আছে। পৃথিবী হইতে ধ্রুবের দিকে একটা গতি আছে। ঐ গতিটা মস্তিষ্ক হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত গতির সমতুল্য। ধ্রুব ও পৃথিবীর সংযুক্ত গতির সহিত মস্তিষ্ক মূলাধার গতির মিল করিয়া শয়ন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। নিদ্রাকালে শরীরের প্রাকৃতিক ক্রিয়া ভাল ভাবে সম্পন্ন হয় ও মাথা ঠাণ্ডা থাকে। যোগ অভ্যাস কালেও উত্তর মুখে বসিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হয়। মস্তিষ্কের মনের কেন্দ্র হইতে বুদ্ধি কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত গতির সঙ্গে ধ্রুব গতির মিল রাখিবার জন্য উত্তর মুখে বসিয়া যোগ অভ্যাস করা প্রয়োজন (ক্রমবিকাশ ৫ম অঃ)। মৃত্যুকালেও এই গতির

সহিত মিল রাখিবার জন্যই উত্তর দিকে মাথা করিয়া শয়ন করাইয়া দিতে হয়। ইহাতে মৃত্যুর পর আত্মার ঊর্দ্ধ গতির পথ সহজ হয়। যাহা হউক, সূর্য্য ও পৃথিবী সংযুক্ত গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়। রাত্রিকালে পশ্চিম দিকে পা রাখিলেই এই গতিটা আমাদের শরীরের গতির অনুকূল হয় বলিয়া পূর্ব্বদিকেও শয়ন করা যায়। ইহার ফল দক্ষিণ দিকে মাথা রাখিয়া শয়নের সমান। ধ্রুব ও পৃথিবীসংযুক্ত গতি, সূর্য্য ও পৃথিবীসংযুক্ত গতি হইতে সূক্ষ্ম ও বেশী শক্তিশালী। সূর্য্য ও পৃথিবীসংযুক্ত গতিকে ৫ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা - সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তুরীয় ও ব্রহ্ম। ইহাদের বিশেষ সময় প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং, মধ্যরাত্রি ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। পূর্ব্বদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলে এই গতি চক্রের সবটুকু প্রভাবই আমরা পাইয়া থাকি। ধ্রুবপৃথিবী সংযুক্ত গতি সব সময়ই একরূপ এবং ঐ গতি সব সময়ই নিবৃত্তিমুখী ও ব্রহ্মজ্ঞানমুখী জানিতে হইবে।

(১০) প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবে। মুখ ভরিয়া জল লইবে এবং চোখে ও কপালে মৃদু জলের ছিটা দিয়া মুখ ধুইবে। ইহাতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। চক্ষু ভাল থাকে। এইভাবে মুখ ধুইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কথা বলিবে না, তাহা হইলে মুখে ব্রণ হইবে না এবং মুখশ্রী নির্ম্মল হইবে।

(১১) আহারের সময় সমস্ত অঙ্গুলি ও হাতের তালুর মধ্যস্থানে অন্ন স্পর্শ করাইয়া প্রতি গ্রাস মুখে দিবে। ইহাতে হজম ভাল হইবে এবং আহারে কখনও অরুচি রোগ জন্মে না।

(১২) কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

(১৩) ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ ত্রিসন্ধ্যাকালে নিত্য গায়ত্রী উপাসনা করিবে। বিস্তারিত সন্ধ্যোপাসনা যাহারা করিতে পারে তাহারা উহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিবে। সামবেদীয়, যজুর্ব্বেদীয়, বা ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যার যে কোন একটি বিধিতে সন্ধ্যোপাসনা করিতে হয়। এসব অনুষ্ঠানে জল ও আসনাদির প্রয়োজন হয় এবং সময় একটু বেশী লাগে মনে করিয়া অনেকে ইহা করিতে চায় না। আমরা শক্তিশালী সমাজবাদীদের জন্য সংক্ষেপে সন্ধ্যা প্রবর্ত্তন করিয়াছি। বৈদিক সন্ধ্যাবিধিকে কেন্দ্র করিয়া পৌরোহিত্যবাদকে ভীষণ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। এই বিধির মধ্যে উচ্চ যোগাঙ্গ জড়িত বহু সহজ ও সুন্দর সাধনক্রিয়া জড়িত আছে। পৌরোহিত্যবাদীরা ইহাকে কিম্ভূত কিমাকার ও জটিল করিতে চেষ্টার মোটেই ত্রুটি করে নাই। এই বিধিকে টিপ্পনী লিখিয়া সহজ সুন্দর ও শক্তিশালী করিবার সুযোগ আমাদের জীবনে আসিবে কিনা উহা আমরা জানি না। হিন্দু ধর্ম্মের প্রত্যেকটা মঙ্গলময় অনুষ্ঠান পৌরোহিত্যবাদীদের হাতে পড়িয়া সৌন্দর্য্যহীন ও কঠিন হইয়া শেষকালে উহা অনুষ্ঠানের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আমরা শক্তিশালী সমাজবাদীদের জন্য সহজ সন্ধ্যা বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছি। উহাতে গায়ত্রী ৩ বার, ব্রহ্মস্তুতি একবার ও মহামন্ত্রগুলি ২ বার বা ৩ বার করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। জল সহ সন্ধ্যা করা, অথবা দশবার গায়ত্রী জপ করা অথবা শক্তিশালী সমাজবাদীদের অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা করা এই তিনটির একটি প্রকারের সন্ধ্যা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিবে। হিন্দু সমাজের প্রাচীন কৃষ্টি, সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান সবই সন্ধ্যানুষ্ঠান বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। কাজেই সন্ধ্যোপাসনার অবহেলা করিবে না। পৌরোহিত্যবাদী অসুররা তোমাকে ''সন্ধ্যোপাসনায় অধিকার নাই'' বলিয়া নাস্তিক্যবাদী করিতে প্ররোচনা দিবে। তুমি তাহার কথা শুনিবে

না, কারণ সে যে কেবল শাস্ত্রই জানে না তাহাই নহে, সে ভীষণ বর্ব্বর ও অসুর। যে কোন নর নারী যে কোন বয়সে এই উপাসনা আরম্ভ করিতে পারিবে।

২১। শক্তিবাদীয় উপাসনা।

ক। মহাপুরুষের আদেশ:- (১) ব্রহ্মনাড়ীতে আমাদের আত্মা অবস্থান করেন। এই আত্মাই ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা শক্তি। ইনি জাগ্রত হইলে আমাদের জীবন শক্তিশালী হয়। ইঁহার ধ্যান করিয়া প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং কালে গায়ত্রী ও ব্রহ্মস্তোত্র মহামন্ত্রাদি পাঠ কর এবং সকলকে করাও। ইহাতে লোক ভেদ, জাতিভেদ, নরনারীভেদ বা কোনও প্রকারের ভেদ সৃষ্টি করিয়া সময় নষ্ট হইতে দিও না।

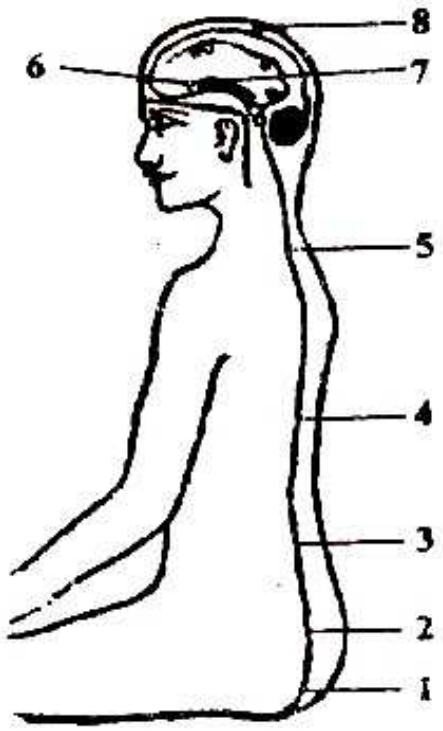

ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয়ে সাধনার কেন্দ্র সমূহ:

১ - মূলাধার
২ - স্বাধিষ্ঠান
৩ - মণিপুর
৪ - অনাহত
৫ - বিশুদ্ধাখ্য
৬ - আজ্ঞা বা শিবপিণ্ড
৭ - বুদ্ধিকেন্দ্র
৮ - সহস্রার

(২) আমাদের ব্যষ্টিজীবন অত্যন্তই সংক্ষেপ। শরীর শত বৎসরও চলে না, কিন্তু আমাদের অধ্যাত্মজীবন (আত্মা) এবং সমাজজীবন অনন্ত ও অমর। হিন্দুদের সমাজ জীবন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ধরিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাজ জীবনকে ভুলিয়া ব্যষ্টি জীবনে অধিক আকৃষ্ট হইবার ইহাই ফল হইয়াছিল যে আমরা সমাজজীবনে দুর্ব্বল ও পরাধীন হইয়া পড়িলাম; সুতরাং আমাদের ব্যষ্টিজীবন এবং অধ্যাত্ম-জীবনও পঙ্গু হইয়া পড়িল। সমাজ জীবনকে পুনঃ শক্তিশালী করিয়া লও।

খ। গায়ত্রী :- ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

গ। ব্রহ্মস্তোত্রম্ :-

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্ব-লোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽ দ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ১
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ, ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পম্॥ ২
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণীনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহাচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেশাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥ ৩
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপোঽবিনাশ্যঽনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব জগৎ ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৪
তদেকং স্মরামঃ তদেকং ভজামঃ, তদেকং জগৎ সাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানম্ নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫
পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

গ) মহামন্ত্রম্ :-

ওঁ তৎসৎ ওঁ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥
ওঁ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম॥
ওঁ সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম॥ ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম॥
ওঁ সত্যং জ্ঞানং অমৃতং ব্রহ্ম॥ ওঁ সত্যং জ্ঞানং অভয়ং ব্রহ্ম॥
ওঁ অয়মাত্মা ব্রহ্ম॥ ওঁ প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

২২। গায়ত্রী বেদ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহা সমস্ত বেদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্র। আমরা ইহার বৈজ্ঞানিক উচ্চারণ প্রবর্ত্তন করিয়াছি। বৈজ্ঞানিক উচ্চারণ হইতে ফল বেশী পাওয়া যায়। ব্রহ্মস্তুতি তন্ত্র হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ভারতের বুকে যত প্রকারের দর্শনশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে উহার সব জ্ঞানে এই ব্রহ্মস্তুতি মণ্ডিত। ইহা সমস্ত বেদ, বেদান্ত ও ব্রহ্মবিদ্যার সার। মহামন্ত্রগুলি উপনিষদের সার ভাগ। এই ব্রহ্মবিদ্যার অনুভূতির জন্যই মহাপুরুষগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ব্রহ্মনাড়ীর কথা বেদে, তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে সমান ভাবেই বিদ্যমান। ইহাকে সমস্ত প্রকার যোগবিজ্ঞানের সার বলা যায়। শরীর ক্রিয়া, মানস ক্রিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞান, অনুভূতি সবই ঐ ব্রহ্মনাড়ীতে বিদ্যমান। ব্রহ্মনাড়ীতে আমাদের মন ডুবিলেই - আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি। গায়ত্রী,

ব্রহ্মস্তুতি ও মহামন্ত্র একার্থ বাচক। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান দ্বারাই গায়ত্রীজ্ঞান লাভ করিতে হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথে এই ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। ইহা মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্রার পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

২৩। গায়ত্রীর অর্থ। এই মন্ত্রটিতে 'তৎ'ই (তিনি বা ব্রহ্ম) কর্ত্তা। ওঁ ব্রহ্ম। ওঁ তৎ এবং সৎ একার্থ বাচক। ইহা একই ব্রহ্মের তিনটি নাম।

"তৎ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" = তিনি ভূঃ (ইচ্ছাশক্তি), ভুবঃ (ক্রিয়াশক্তি) এবং স্বঃ (জ্ঞান শক্তি) স্বরূপ।

(তৎ) সবিতুঃ দেবস্য বরেণ্যম্ ভর্গো = তিনি সবিতা (অর্থাৎ সূর্য্য দেবতার অথবা বিশ্বপ্রসবিনী শক্তির) দেবতার পূজনীয় তেজ।

ধীমহি॥ ধ্যান করি।

ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ বুদ্ধি শক্তিতে তিনি নিজের শক্তিকে প্রেরণ করুন।

মোটামুটি অর্থ:- তিনি ওঁ বা ব্রহ্ম স্বরূপ, তিনি ইচ্ছা শক্তি (জীবের মধ্যে বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সৃষ্টির বেগই ইচ্ছা শক্তি) স্বরূপ। তিনি ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ (যে শক্তিতে সমাজ পালন হয় এবং অসুরবাদ ধ্বংস হয় উহার নাম ক্রিয়াশক্তি)। তিনি জ্ঞান শক্তি (যে শক্তি আমাদের অন্তরে থাকিয়া কোন কিছু জানিবার প্রবল প্রেরণা দেয় সেই শক্তির নাম জ্ঞানশক্তি) স্বরূপ। তিনি বিশ্ব সৃষ্টিকারিণী শক্তির মূল জ্যোতি। তাঁহাকে ধ্যান করি। তিনি আমাদের ধী শক্তিতে নিজের শক্তি প্রেরণ করুন।

২৪। ব্রহ্মস্তুতির অর্থ - 'ওঁ' সমগ্র বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ 'সৎ' কে (ব্রহ্মকে) প্রণাম, বিশ্বরূপাত্মক 'চিৎ' কে (ব্রহ্মকে) প্রণাম। অদ্বৈততত্ত্ব ও মুক্তিদানকারী তাঁহাকে প্রণাম, নির্গুণ ব্যাপক ব্রহ্মকে প্রণাম॥ ১॥

তুমি একমাত্র শরণ্য (যাহার আশ্রয় লওয়া যায়), তুমি একমাত্র বরণীয় (পূজনীয়), তুমি জগতের একমাত্র কারণ ও বিশ্বরূপ। তুমিই একমাত্র জগৎ কর্ত্তা, জগৎ উদ্ধার কর্ত্তা ও ধ্বংস কর্ত্তা, তুমিই একমাত্র পরম (শ্রেষ্ঠ), নিষ্কল (যে তত্ত্বে ক্ষয় বা অংশ হয় না) এবং নির্ব্বিকল্প (বিকল্প রহিত)॥ ২॥

তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণেরও ভীষণ। প্রাণীদের গতি (প্রাণীগণের লক্ষ্য অর্থাৎ বিকাশের শেষ প্রান্ত), পাবনের পাবন (পবিত্রকারীদেরও পবিত্রকারী), তুমি সমস্ত পদের শ্রেষ্ঠপদ ; তুমি একমাত্র (সৃষ্টি স্থিতি লয়ের) নিয়ন্তা। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, রক্ষকদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ রক্ষক॥ ৩॥

হে প্রভো, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর; তুমি সর্ব্বস্বরূপ হইলেও তোমাকে বোঝা যায় না এবং তুমি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও সত্য স্বরূপ। তুমি অচিন্ত্য অক্ষর, ব্যাপক ও অব্যক্ত তত্ত্ব, তুমি জগৎ ভাসকাধীশ ও ক্ষয়উদয় রহিত॥ ৪॥

একমাত্র তোমাকে স্মরণ করি, একমাত্র তোমারই পূজা করি। এবং জগতের সাক্ষী স্বরূপ একমাত্র তোমাকেই প্রণাম করি। তুমি একমাত্র সৎ, একমাত্র নিধান (আশ্রয় স্বরূপ), তুমি নিরালম্ব (যিনি কাহারও আশ্রয়ে অবস্থিত নহেন এবং সমস্তের আশ্রয়)। তুমিই ঈশ্বর, তুমিই সংসার সাগরের পোত, তোমারই শরণাগত হইতেছি॥ ৫॥

পাঁচটি রত্নস্বরূপ এই পরমাত্মা ব্রহ্মস্তোত্র, যিনি একান্ত মনে পাঠ করেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

২৫। মহামন্ত্রের অর্থ:- ওঁ, তৎ, সৎ ব্রহ্মের তিনটী নাম, ইহা ওঁকারেরই স্বরূপ। তিনি স্থূলের শান্তি, সূক্ষ্মের শান্তি, তিনি জ্ঞান জগতের শান্তি। তিনিই নিশ্চিত রূপে ব্রহ্মের রূপ॥ তিনি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ॥ তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ॥ তিনি সত্য, জ্ঞান ও অমৃতস্বরূপ॥ তিনি সত্য, জ্ঞান ও অভয় স্বরূপ॥ জীবের মধ্যে যিনি আত্মা তিনিই ব্রহ্ম॥ তিনি প্রজ্ঞান (জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষ), আনন্দ ও ব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি ওঁ, তৎ, সৎ স্বরূপ।

২৬। সরস্বতী উপাসনা। সরস্বতীই ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি। গায়ত্রী ও সরস্বতী একই শক্তি। বেদকে এই মূর্ত্তিতে গড়িবার বিধান ঋষিগণ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা মূর্ত্তি নিন্দুক তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না। হিন্দুশাস্ত্র বা হিন্দুধর্ম্ম মূর্ত্তি পূজার সমর্থক নহে। জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য মূর্ত্তি একটি কলা বা কৌশল মাত্র। বঙ্গদেশে বিদ্যার্থী সমাজে সরস্বতী পূজায় বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী কৌমার্য্য ব্রত ধারিণী শক্তি। বিদ্যাভ্যাসকালে কুমারীদের রূপচর্য্যার বিধান নাই, ইহা সংযমেরই সময়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও ধর্ম্মশিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ে পাঠ্য করিবার জন্য আমরা একখানা ধর্ম্মশিক্ষা বই লিখিয়াছিলাম। উহা প্রকাশিত হইয়াছে। সরস্বতীই গায়ত্রী। সরস্বতীই ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপা। সন্ধ্যোপাসনা বা শক্তিবাদীয় উপাসনা দ্বারা সরস্বতীরই উপাসনা হইয়া থাকে। আমরা ছাত্রগণকে বলি - তাহারা যেন সরস্বতী পূজাকালে পুরোহিতকে না ডাকে। সব বর্ণের বিদ্যার্থীরা একত্র হইয়া সমবেত ভাবে শক্তিবাদীয় নীতিতে পূজার ব্যবস্থা করিবে। কন্যা বিদ্যালয়েও সরস্বতী পূজা হয়। সেখানেও মেয়েরা পুরোহিত বাদ দিবে এবং সমবেতভাবে পূজা করিবে। পূজানুষ্ঠান খুব আনন্দদায়ক ও উৎসাহদায়ক সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান। ইহা একবার অনুষ্ঠান করিলে প্রতিবৎসরই করিতে আগ্রহ হইবে। যাহাতে খুব সহজে ও ত্রুটিহীন ভাবে সরস্বতী পূজা হইতে পারে এজন্য আমরা একখানা গ্রন্থ সংকলন করিবার কথা ভাবিতেছি।

২৭। সহশিক্ষা। সোসিয়ালিষ্টরা যুবক ও যুবতীগণকে একত্র পড়াইবার অনুকূলে আন্দোলন করিতেছে। অনেক অদূরদর্শী বৃদ্ধ নেতার মুখেও আমরা ঐ নীতির সমর্থনের ধ্বনি শুনিতে পাই। তাহারা ইহাই দেখাইতে চায় যে ঐরূপ ভাবে বিদ্যাদান সস্তায় হইবে এবং ইহা ষ্টেটের ব্যয় সংকোচের বিশেষ অনুকূল। আমাদের মতে ইহা ব্রহ্মচর্য্য বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, জ্ঞানবিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ, স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ, মনোবিজ্ঞান বিরুদ্ধ এবং ইহা সমাজবিজ্ঞান বিরুদ্ধ। এইরূপ করিবার ফলে সমাজে বহু প্রকারে অস্বস্থময় পরিস্থিতির ও অশান্তির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। বিদ্যাদানে ঐ রূপ কৃপণতার কোন প্রয়োজনই আমরা স্বীকার করিব না। ইহার প্রবর্ত্তন করিলে ইহার সংশোধন যে অদূরেই করিতে বাধ্য হইবে ইহা আমরা ভালভাবে জানি। সমাজ বিজ্ঞানের নীতি লইয়া ছেলেমী চলে না।

২৮। গার্হস্থ্য আশ্রম। চার আশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয় আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য আশ্রম। ইহা বিবাহের অন্তে সমাজের প্রবেশ। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। ইহা পালন, পোষণ, রক্ষণ,

উপার্জ্জন, দান ও উৎসবের অনুষ্ঠানময় জীবন। আশ্রমগুলির মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসজনোচিত মহামূল্যবান জীবন গার্হস্থ্য আশ্রমেই গড়িয়া উঠিতে পারে।

২৯। বানপ্রস্থাশ্রম। সংসার আশ্রমের ভার উপযুক্ত সন্তানের হস্তে প্রদান করিয়া ৫০ বৎসর বয়সের পর সাধন ও তপস্যার জন্য নির্জ্জন ও নিরালা স্থানে বাস করা রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানময় জীবন। বানপ্রস্থাশ্রমে ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করা যায় না। বানপ্রস্থাশ্রমকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে ষ্টেট্‌কে সেইরূপ ইন্‌সিওর এর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ অত্যন্ত উন্নত মনুষ্য জীবনের আদর্শ বলিতে হইবে। গৃহস্থাশ্রম জীবনে যথেষ্ট উদারতার অবলম্বন না থাকিলে, এই জীবনগ্রহণ যথেষ্ট ফলপ্রদ হয় না। এই জন্য বৃদ্ধাবস্থায় পেন্‌সন্ ভোগী ধার্ম্মিকদের মন অনেক স্থানে বেশী মোহবদ্ধ হইতে দেখা যায়। পৌরোহিত্যবাদীয় চিন্তায় যাহারা পুষ্ট তাহারা বানপ্রস্থ জীবনের জন্য অত্যন্ত অযোগ্য।

৩০। সন্ন্যাস। জ্ঞান লাভের জন্য তপস্যাময় জীবন যাপন করা বা জীবনের শেষ প্রান্তে প্রকৃত জ্ঞানময় জীবন যাপন করাই সন্ন্যাস জীবন। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ ইহার যে কোন আশ্রম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায়। প্রাচীন কালের সন্ন্যাস বিধান বর্ত্তমান সময়কার মতন ব্যাপক ছিল না। সে সময় ঋষি জীবন বেশী ছিল। তখন মৃত্যুর প্রাক্কালে কেহ কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। বৌদ্ধ যুগের পর সন্ন্যাস আশ্রম বেশী পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর ইহাকে আরও পুষ্ট করিয়া যান। এক যুগের ঋষি আশ্রমই বৌদ্ধ যুগে সন্ন্যাস আশ্রমে পরিণত হয়। আচার্য্য শঙ্কর ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাস আশ্রমকেই বৈদিক বিধানে পরিবর্ত্তন করেন। হিন্দুদের মধ্যে সন্ন্যাস বিধানের ভিত্তি আছে বলিয়া আজও উন্নত শিবস্তরের জ্ঞানী, যোগী, সমাজ হিতৈষী মহাত্মাগণের আগমন এই সমাজে সম্ভবপর হইতেছে। হিন্দু চিন্তার উপর সন্ন্যাসীদের প্রভাব আছে। সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্র হিন্দু সন্ন্যাসীরা, ইহা আমরা অনেক ঘটনায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বা সন্ন্যাস পথে আসিয়া যাহাতে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন এই জন্য প্রাচীনকালে সাধনার ক্রম ছিল। সেই ক্রমের সংক্ষেপ পরিচয় আমরা এই পুস্তকে প্রদান করিয়াছি। সন্ন্যাসিগণ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সমাজকে শক্তিশালী করিবার অনুকূলে শিক্ষা দিতেন। এখন শঙ্করের প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীরা সমাজকে শক্তিশালী করিবার সব প্রকার ব্রতই ত্যাগ করিয়াছেন। আধুনিক পন্থী সন্ন্যাসীরাও প্রায় সকলেই ভাববাদীদের দলের লোক। ইহাদের অনেকে মড়া পোড়াইয়া ও ঔষধ বিতরণ করিয়া মস্ত সমাজ সেবক! বীরত্ব ও ত্যাগের নামে ইহাদের বিতৃষ্ণভাব দেখা দেয়।

৩১। সন্ন্যাসীর সহিত কি ভাবে ব্যবহার করিতে হয় উহা বলা যাইতেছে। সন্ন্যাসীকে "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করিবে। ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, তেজস্বী, তপস্বী, সমাজ হিতৈষী, যোগী, সাধক, বিদ্বান, একান্ত যোগী ও ত্যাগী সন্ন্যাসিগণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। বিশেষ ভাল ভাবে না জানিয়া মহাত্মাদের সম্বন্ধে অনুচিৎ মন্তব্য করিবে না। উচ্চস্তরের ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মাদের সেবা ও সঙ্গ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিবে। ভাববাদী মহাত্মাদের মধ্যেও বেশ ভাল লোক আছেন জানিবে। কাজেই কাহাকেও অশ্রদ্ধা করিবে না। একান্ত যোগী ব্রহ্মচারী ও ত্যাগী মহাত্মারা শ্রদ্ধার পাত্র জানিবে। ইঁহাদের নিকট

শক্তিবাদ প্রচার করিয়া ইঁহাদের চিন্তা শক্তিশালী করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। ইঁহাদের সঙ্গে কোন সময়ই বিনয়ের নীতি লঙ্ঘন করিয়া ব্যবহার করিবে না। ইঁহারা শক্তিবাদের নীতি না মানিলেও ইঁহাদের সঙ্গে মনোমালিন্য করিবে না। ইঁহারা সব অবস্থায়ই আমাদের সমাজের শ্রদ্ধেয়।

পঞ্চম অধ্যায়

অসুরবাদ

১। এই পৃথিবীতে অসুরবাদ অত্যন্ত প্রাচীন। বেদে অসুরবাদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ যুদ্ধের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণাশ্রম সমাজবাদের উৎপত্তির বহুযুগ পূর্ব্ব হইতে অসুরবাদ অত্যন্ত প্রবল ছিল। বেদে দেবাসুর সংগ্রামের ইতিহাস আছে।

২। অনেকের ধারণা দেবতা অর্থে আর্য্য জাতি এবং অসুর মানে অনার্য্য এবং অনার্য্য মানে এই ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আদি অধিবাসী। এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। কেহ কেহ আবার জিন্দাবেস্তার কথা বলেন। তাঁহাদের ধারণা ঐটা অসুরদের দেশ ছিল ইত্যাদি। আমরা এসব ভ্রান্ত ইতিহাস স্বীকার করি না। হইতে পারে জিন্দাবেস্তায় অসুর নামধারী কোন রাজা ছিল অথবা হইতে পারে কোন সময় ঐদেশে অসুরবাদ প্রবল হইয়াছিল। অসুরবাদ আমাদের দেশের কেন, এই পৃথিবীর বহু স্থানের সমাজে উৎপন্ন হইতে পারে এবং বিভিন্ন যুগে হইয়া থাকিবে। অসুরবাদ একটা শক্তিশালী মতবাদ। সেই মতবাদ পৃথিবীর যে কোন দেশই গ্রহণ করিতে পারে। বেদে এবং গীতায় অসুরবাদের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা কোন জাতি বা কোন দেশের মানবদের মনোবিজ্ঞান নহে। গীতায় ১৬শ অধ্যায় দেখুন। 'নরক' নামে কোন রাজা কোন দেশে কোন যুগে রাজত্ব করিলেই আমাদের দেশের উর্ব্বর মস্তিষ্ক ধর্ম্মবিশিষ্ট শিক্ষিতগণ যদি আবিষ্কার করেন যে উহাই নরককুণ্ড এবং ঐস্থান ভিন্ন আর সব স্বর্গরাজ্য এইরূপ ধারণা যেমন ভ্রমাত্মক ঠিক সেইরূপ অসুরদের কোন দেশ ছিল এবং দেবতাদেরও কোন দেশ ছিল এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক।

৩। যে কোন মানবসমাজে যে কোন সময় অসুরবাদ উৎপন্ন হইতে পারে। অসুরবাদকে স্থায়ী ভাবে বহিষ্কার করিবার জন্যই বর্ণাশ্রম সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

৪। শাস্ত্রমতে মানুষ মাত্রই সাত ঋষির সন্তানসন্ততি। ইহাদের মধ্যে যাহারা অসুরবাদ গ্রহণ করিত তাহারা অসুর ছিল এবং যাহারা দেবত্ববাদ গ্রহণ করিত তাহাদিগকে দেবতা বলা হইত। যাহাতে সমাজ স্থায়ীভাবে দেবত্ববাদে প্রতিষ্ঠিত থাকে এজন্য বর্ণাশ্রম সমাজবাদ প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা ভালভাবেই দেখিতে পাইতেছি, বর্ণাশ্রমবাদকে ভিত্তি করিয়াও বিভিন্ন সময় অসুরবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অবশ্যই এ সমাজে অসুরবাদ কোন দিনই স্থায়ি রূপ লয় নাই। ভবিষ্যতেও লইতে পারিবে না। বর্ণাশ্রম সমাজবাদের ইহাই সবচেয়ে বাহাদুরী। এজন্য বর্ণাশ্রম সমাজবাদকে শ্রেষ্ঠ সমাজবাদ বলা যায়। বর্ণাশ্রম সমাজবাদকে কেন্দ্র করিয়া যদি দুর্ব্বলবাদ চলিতে থাকে তবে ইহা বিলুপ্ত হইবে।

৫। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবাদকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন যুগে পৃথিবীতে অসুরবাদ আসিতে পারে বা আসিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

৬। উপনিষদুক্ত জ্ঞানবাদই ব্রহ্মণ্যবাদ। এই মতের সারাংশ এই যে জীব মাত্রই একই আত্মার বিকাশ। মানব মাত্রই বিকাশের শেষ স্তরে পূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত। বিকাশের অনুকূল করিয়া রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প ও কর্ম্ম সব পরিচালিত করিতে হইবে এবং প্রত্যেকটি মানব যাহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে এভাবে সমাজবাদ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। গীতাই উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক কর্ম্মবাদমূলক গ্রন্থ।

৭। বর্ণ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমাজবাদ প্রবর্ত্তিত হইবার পর কোন যুগে পুরোহিতবর্ণের লোকের ইহাই ধারণা হইতে লাগিল যে তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং তাঁহারাই ঋষি সন্তান এবং তাঁহারাই বংশ পরম্পরায় জ্ঞানের অধিকারী; অন্য বর্ণের লোকেরা ইহাদের পক্ষে হীন। ধর্ম্মে, কর্ম্মে ইহারাই সমস্ত বর্ণের গুরু এবং পরলোকেরও ঠিকেদার। ইহারা শ্রেষ্ঠ, ইহাদের বংশধরগণ শ্রেষ্ঠ, ইহা ভিন্ন অন্যান্য সব বর্ণের লোক নিকৃষ্ট ও তাহাদের বংশধরগণও এদের বংশধর তুলনায় নিকৃষ্ট। এইরূপ ভ্রান্ত মতবাদ দ্বারা ইহারা সমাজকে ভ্রান্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে এবং কোন কোন সময় এই দুষ্কার্য্যে বেশ ভাল ভাবেই সক্ষম হয়। শক্তিবাদের মতে ইহার নাম পৌরোহিত্যবাদ। ব্রহ্মজ্ঞানের আলোহীন ব্রাহ্মণ বৃত্তিধারীরা এই মতের প্রবর্ত্তক।

৮। এখন দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণ বৃত্তিধারীরা কেহ কেহ ব্রহ্মণ্যবাদের সমর্থক এবং কেহ কেহ পৌরোহিত্যবাদের সমর্থক। ব্রহ্মণ্যবাদীরা দেব ব্রাহ্মণ, কিন্তু পৌরোহিত্যবাদীরা অসুর ব্রাহ্মণ। ইহারা সমাজকে শাস্ত্রের নামে কিরূপ পীড়ন দিয়াছে - শাস্ত্র পড়িলে উহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মানুষের যদি ধারণা হইয়া থাকে সে হীন, সে অছুত, সে অপদার্থ, তবে সে কখনও উন্নতি করিতে পারে না। পৌরোহিত্যবাদীরা এত অপদার্থ যে ইহারা সমাজকে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মজ্ঞান সব ইহাদেরই সম্পত্তি। আমরা বলি - সমস্ত জ্ঞানসম্পদ ঋষিদের দান। তাঁহারা মানুষ মাত্রেরই আদি পিতা। এখনও যে ক'খানা উচ্চাঙ্গের উপনিষদ পাওয়া যায় উহার বেশীর ভাগই রাজাদের দান। অধিক কি, ত্রিসন্ধ্যার উপাস্য গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি অবতারগণ সবাই ক্ষত্রিয় সন্তান। কাজেই পৌরোহিত্যবাদীরা অকারণ মিথ্যা প্রচার করিয়া নিজেরা অপদস্থ হইবেন না। আমরা ব্রাহ্মণগণকে বলি - আপনারা ব্রহ্মণ্যবাদ অনুসরণ করুন। ব্রহ্মণ্যবাদের রক্ষক ও প্রচারকগণই আমাদের সমাজ ধর্ম্মের ব্রাহ্মণ। ইহারা শ্রদ্ধার যোগ্য। পৌরোহিত্যবাদ ইহার বিপরীত মতবাদ।

৯। পৌরোহিত্যবাদ অসুরবাদমাত্র। ইহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে মানুষকে কি ভাবে শূদ্রের কোঠায় ফেলা যায় এবং নারীকে কত ভাবে নির্য্যাতন করা যায় ইহারই বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। মহারাজ মনু যে বর্ণধর্ম্মবাদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেই বর্ণধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মণ্যবাদের রক্ষক ও প্রচারক; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক অংশ বর্ণ বিদ্বেষবাদ ও আত্মঘাতক পৌরোহিত্যবাদের প্রবর্ত্তক ও সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। বৌদ্ধাবতারে এই পৌরোহিত্য বর্ব্বরতারই মূল উচ্ছেদ করা হইয়াছিল। অসুরবাদ ধ্বংস করিলেই তাঁহাকে অবতারকলার মহাপুরুষ মানা হইয়া থাকে। বুদ্ধদেব পৌরোহিত্য আসুরিকতার মূল

উচ্ছেদ করেন বলিয়াই তিনি আমাদের অবতার। আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক বৌদ্ধবাদ খণ্ডিত হইবার পর বেদবাদের নামে ব্রহ্মণ্যবাদ প্রবর্ত্তিত না হইয়া পৌরোহিত্যবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কাশী, নবদ্বীপ ও পুণাকে কেন্দ্র করিয়া নবীন পৌরোহিত্যবাদীয় দস্যুতা আরম্ভ হয়। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ পৌরোহিত্যবাদে নিয়মিত।

১০। ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারীরা আমাদের সমাজে কখনও কখনও আসুরিক হইয়াছিল। মহারাজ রাবণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতিগণ এই পর্য্যায়ের লোক। সমাজে ব্রহ্মণ্যবাদের ভিত্তিতে সমস্ত মানবের বিকাশানুকূল সুবিধা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সতীর মর্য্যাদা সব চেয়ে উচ্চ হইবে এবং অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা সচ্ছল হইবে এবং অসুর গুণ্ডা সমাজবিদ্বেষী বর্ণবিদ্বেষী এবং ধর্ম্মের আড়ালে আসুরিকবাদ উচ্ছেদ হইবে। বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে উহার প্রতিরোধ বা প্রতিশোধের ব্যবস্থা হইবে, পার্শ্ববর্ত্তী অসুররাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া শক্তিবাদরাষ্ট্র করা হইবে, ইহারই নাম শক্তিবাদ বা পুরুষোত্তমবাদ। ক্ষত্রিয়রা এই ধর্ম্মপালন করিতেন। আবার ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই অসুরবাদ, রাক্ষসবাদ ও দানববাদ গৃহীত হইয়াছে।

১১। বৈশ্যরা আমাদের দেশে হিন্দুদের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত শোষণবাদ ও কালা কারবার চালাইবার সুবিধা পায় নাই। তাহারা ব্যবসা, পশুপালন, গোরক্ষা ও কৃষি দ্বারা সমাজ সেবাই করিয়াছেন এবং প্রচুর দান দ্বারা ধর্ম্মরক্ষায় তৎপর ছিলেন। কিন্তু ইংরেজের এদেশ ত্যাগের সম সাময়িক কালে কালাকারবারী ও শোষণবাদী বৈশ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ডেমোক্রেসীর যুগে সমস্ত পৃথিবীই বৈশ্যদের শোষণবাদীয় ও ভেজালবাদীয় অত্যাচারে জর্জ্জরিত ছিল। ভারত স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে অহিংসা নামধারী এবং স্বধর্ম্ম ও স্বকৃষ্টি বিরোধী অধার্ম্মিক নেতাদের প্রশ্রয় পাইয়া এই শ্রেণীর অত্যাচার প্রকাশ পাইয়াছে। যতদিন কেন্দ্রীয় শাসনের নীতি বর্ব্বরবাদ বিরোধী নীতিতে না দাঁড়াইবে ততদিন আমাদের দেশের উপর বৈশ্যদের দস্যুতা সমান ভাবেই থাকিবে। এখন দেখা যাইতেছে মনু প্রবর্ত্তিত সমাজধর্ম্মের বৈশ্য অংশে সমাজ পালনবাদীরা সুবিধা পাইলেই শোষণবাদীদের দলে ভিড়িতে পারে।

১২। শ্রমজীবিরা আমাদের দেশে কোন যুগেই আসুরিক হইতে সুযোগ পায় নাই। কিন্তু প্রগতিবাদের চক্করে এবং বৈশ্যতান্ত্রিক শাসনের চাপে আমাদের দেশের শ্রমজীবিরাও আসুরিক হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহারা যদি কর্ম্মহীন হয় তবে অন্যান্য বৃত্তিধারীদের মত সমাজকে যে কোন মুহূর্ত্তে ধ্বংসের সম্মুখীন করিয়া দিতে পারে। আলস্য ও কর্ম্মহীনতা ত্যাগ দ্বারা ইহারা সমাজকে রক্ষা করিতে একাগ্র হইবে। অফুরন্ত কর্ম্মবাদিতা দ্বারা ইহারা সমাজকে রক্ষা করিতে পারে এবং আলস্য ও কর্ম্মহীনতা দ্বারা ইহারা সমাজকে ধ্বংস করিতে পারে। যতদিন ভারতের কেন্দ্রীয় নীতিতে অহিংসা নামধারী মিথ্যাবাদের ও তোষণবাদের রাজত্ব থাকিবে ততদিন শূদ্র অসুরদের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে। যতদিন ভারতবর্ষে মক্কাবাদীয় বর্ব্বরবাদকে ধর্ম্মের আড়ালে প্রশ্রয় দেওয়ার নীতি থাকিবে, ততদিন কেন্দ্রীয় শাসন নীতি ঠিক ঠিক অসুর বিরুদ্ধবাদে দাঁড়াইতে পারিবে না। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসন যতদিন শক্তিবাদীয় হইতে পারিবে না ততদিন বৈশ্য ও শূদ্রদের এবং অন্যান্য অসুরবাদীদের আসুরিকতাও যাইবে না। ধর্ম্মের নামে ঐ একটি আসুরিকতার আড়ালে সব রকম আসুরিকতাই পুষ্ট হইতে থাকিবে।

১৩। যে যুগে বর্ণ ধর্ম্ম ছিল না সেযুগেও আসুরিকতা ছিল। এবং যে যুগে বর্ণ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত আছে সেই যুগেও অসুরবাদ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বৃত্তি ধারীদের মধ্যে দেখা দিতেছে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যবাদ + ক্ষত্রিয়ের পুরুষোত্তমবাদ + বৈশ্যের সমাজপালনবাদ + শূদ্রের অফুরন্ত কর্ম্মবাদ = শক্তিবাদীয় সমাজ। ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যবাদিতা, ক্ষত্রিয়ের অসুরবাদিতা, বৈশ্যের শোষণ ও শূদ্রের কর্ম্মহীনতা বহিষ্কার করিতে হইবে এবং সে সঙ্গে বর্ণ ধর্ম্মবাদের বাহিরিস্থিত মুসলমান ও খৃষ্টবাদকে বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত করিতে হইবে। এইভাবে সমাজের ভিত্তি সম্প্রসারিত করিবার পথ যদি হিন্দুস্থান ষ্টেট্ করিতে পারে তবে এ দেশে শান্তি হইতে পারে। খৃষ্টবাদিগণকে আমরা অসংস্কৃত বা শূদ্র স্তরে রাখিতে পারি, কারণ তাহাদের ধর্ম্ম মুসলমান তুল্য বর্ব্বরবাদীয় নহে। মুসলমান ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে শূদ্র হইলেও বর্ব্বরবাদে প্রতিষ্ঠিত। একে তো শূদ্র তাহার উপর যদি বর্ব্বর হয় তবে তাহার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো অসম্ভব। স্বয়ম্ভূব যেমন নিজের রাজত্ব মধ্যে বর্ণাশ্রম সংস্কার প্রবর্ত্তন দ্বারা আসুরিক উৎপাত বন্ধ করিয়া দিবার একটা সুচিন্তিত নীতি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের কেন্দ্রীয় শাসন নীতিও আমাদিগকে এভাবে পরিচালনা করিতে হইবে যাহাতে পৌরোহিত্যবাদ, অসুরবাদ, শোষণবাদ, কর্ম্মহীনবাদ ও মক্কাবাদীয় বর্ব্বরতা অতিদ্রুত ধ্বসিয়া যায়। আল্লামিঞার উপাসনা করা নিশ্চয়ই কোন অধর্ম্ম কার্য্য নহে। আল্লা বলিতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বুঝাইবে অথবা কোন বর্ব্বর প্রেতাত্মা বুঝাইবে ইহার স্পষ্ট নির্ণয় হওয়া প্রয়োজন। আল্লা মিঞা ফরিস্তেগণ মারফৎ মহম্মদের নিকট সুরা নাজির করিতেন। এই সুরাগুলির সংগ্রহই কোরাণ নামে খ্যাত। কোরাণ পাঠের পর ইহা স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে এইরূপ কোন ঈশ্বর আছেন কিনা অথবা ইহা কোন বর্ব্বর জাতীয় লোকের প্রেতাত্মায় আদেশ। প্রেতাত্মা বা পিশাচের উপাসনার আমরা প্রতিবাদ করিতে চাই না। কারণ এইরূপ উপাসনা বেদসম্মত। কিন্তু এটা স্পষ্ট বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে পিশাচ উপাসনা মানিলেও অসুর সমাজ আমরা রক্ষা করিতে পারি না। যাহারা দেশকে ভাগ করিয়া দিবার জন্য বিজাতি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারা ভারতে থাকে কোন জাতীয়তার অধিকারে? ইংরেজ যদি বিজাতি বলিয়া ভারত ছাড়িয়া থাকে তবে পাকিস্থান জাতীয়তাবাদীরা কেন ভারত ছাড়িবে না? কোরাণ সত্যই ঈশ্বরের আদেশ কি কোন ডেভিলের আদেশ ইহার শীঘ্র নির্ণয় হওয়া আবশ্যক। আমরা হিন্দু মুসলমান সকলকে কোরাণ পাঠ করিতে বলি। কোরাণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৪। কেন্দ্রীয় শাসন নীতিতে একটা ফোটা দুর্ব্বলতা থাকিলেও পৌরোহিত্যবাদ, অসুরবাদ, শোষণবাদ ও কর্ম্মহীনবাদ আসিবেই, আমাদের কেন্দ্রীয় শাসনে যদি মক্কাবাদীয় বর্ব্বরবাদকে একটা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে উহা কোন প্রকারেই ছিদ্রহীন হইবে না। এবং একটি মাত্র ছিদ্র পথে শত শত ছিদ্র পথের প্রকাশ পাইবে এবং ভারতীয় সমাজ বার বার অশান্তি ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হইবে। সমাজ ও রাষ্ট্র যাহাতে ছিদ্রহীন হয় এজন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সমাজ অসুরবাদহীন হইবে এবং সমাজ দুর্ব্বলতা হীন হইবে - এজন্য যথাশক্তি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে একদল বিচিত্র রাজনৈতিক ও একদল বিচিত্র ধর্ম্মিকের দল জুটিয়াছেন যাহারা কোরাণবাদকে সমালোচনা করিলে মাথা গরম করেন।

পৌরোহিত্যবাদকে অসুর বল, বৈশ্যগণকে অসুর বল, ইহাতে এই সব দুর্জ্জন রাজনীতিক ও ধার্ম্মিকদের মাথা ব্যথা করে না; কিন্তু কোরাণবাদকে সমালোচনা করিলে বা আল্লা মিঞার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিলে সেই মানুষটার আর রক্ষা নাই। তাহাকে পদে পদে তিরস্কৃত হইতে হইবে এবং জেল যাত্রায় জীবন কাটাইতে হইবে। আমরা বলি অসুরবাদ ও অসুরবাদ সমর্থন দুইই অসুরবাদ।

দ্বিতীয় ভাগ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেদ ও শক্তিশালী সমাজ

১। বেদ মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতামূলক গ্রন্থ। হিন্দুরা বেদের প্রমাণকে অকাট্য মানিয়া থাকে। বেদে পৌরোহিত্যবাদ নাই। ইহা সীমাহীন শক্তিবাদীয় নীতিতে পরিপূর্ণ। বেদে যে সব মন্ত্র পাওয়া যায় উহার প্রাচীনত্বকে কেন্দ্র করিয়া যদি এই চার বেদের যুগ ভাগ করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে - বেদের যুগ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। কর্ম্ম মীমাংসা দর্শনে মন্ত্রগুলির স্বভাব ধরিয়া ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদের মন্ত্র ভাগ করিয়াছে। এই মতে গান করিবার যোগ্য মন্ত্র মাত্রই সাম। যে সব মন্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন, যাহার ব্যাখ্যা করা কঠিন সেই সব মন্ত্র ঋক্। ঋক্ ও সাম পদ্য ধারায় লিখিত। গদ্য ধারায় লিখিত যে সব মন্ত্র বেশী আধুনিক উহারা অথর্ব্ব। একই মন্ত্র অনেক সময় দুই তিন বেদে পাওয়া যায়। সুতরাং মন্ত্রের স্বভাব ধরিয়া মন্ত্রের প্রাচীনত্ব ও আধুনিকত্ব বিচার করাই ঠিক পন্থা। মন্ত্রের ভাষা ও ভাব ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে বেদের যুগ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। বেদের এই লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপী শক্তিবাদীয় সমাজজীবনের ইতিহাস বেদেই বিদ্যমান।

২। গীতায় অসুর ও অসুরবাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে। গীতা বলেন, সৃষ্টির নিয়মই এইরূপ যে দৈব ও আসুরিক সৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়ম। আসুরিকতা বা দেবত্ব কোন দেশ বিশেষের মনোবিজ্ঞান নহে। যে কোন দেশে যে কোন সমাজে অসুরবাদ উৎপন্ন হইতে পারে। মানুষের সমাজ হইতে অসুরবাদ উচ্ছেদ করিয়া দিতে হইবে, ইহাই বেদবাদ এবং শক্তিবাদ। বেদের সমাজবাদ, বেদের উপাসনা, বেদের জ্ঞানবাদ ও কর্ম্মবাদ গীতায় স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক ভাবে স্থান পাইয়াছে (গীতার শক্তিবাদ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। দৈবলক্ষণে ২৬টী দৈবীসম্পদের লক্ষণ আছে। উহার মধ্যে ৫টী শ্রেষ্ঠ এবং অসুরবাদ লক্ষণে ৫টী লক্ষণ দেওয়া আছে। বিস্তারিত ক্রমবিকাশবাদ ও শক্তিবাদগ্রন্থে বলা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ দৈবীভাব ৫টী, যথা - তেজ (অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ), সত্য, শান্তি, অভয় ও প্রেম (অহিংসা)। দম্ভ, দর্প, অহংকার, ক্রোধ ও পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা) ইহারা অসুর ভাব। ইহাদের আরও বিশেষ লক্ষণ এই যে সত্য, শৌচ ও আচার (ব্রহ্মচর্য্য) ইহারা মানে না। সমাজকে অসুর করিয়াও প্রস্তুত করা যায়; আবার দৈবভাবেও গড়া যায়। নিজেকেও অসুরভাবে প্রস্তুত করা যায়, আবার দৈব ভিত্তিতেও গড়া যায়। দৈব ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদের উপর বেদ ও গীতা জোর দিয়াছেন। গীতার ভাববাদ টিপ্পনীর মত বেদেরও ভাববাদীয় টিপ্পনী পাওয়া যায়। ভাববাদীরা বেদে অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপর সুতীব্র নিষ্ঠা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। বেদে যুদ্ধের কথা? কাজেই তাঁহারা এই

যুদ্ধটাকে কোনও প্রকারে মনোবিজ্ঞানের যুদ্ধ বলিয়া দাঁড় করাইবার জন্য যথেষ্ট কসরৎ দেখাইয়াছেন।

৩। বর্ণভেদহীন একটা উচ্চ সভ্যতামূলক সুদীর্ঘ শক্তিবাদীয় যুগই বৈদিক যুগ। বেদে দুইটা সুদীর্ঘ যুগের সন্ধান পাওয়া যায়। উহার একটা আমরা তপস্যা, শান্তি ও জ্ঞানবাদমূলক শিবের যুগ নাম দিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে অসুরবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধমূলক একটা সুদীর্ঘ শক্তিবাদীয় যুগও আছে। আমাদের মতে দুইটা যুগই পাশাপাশি বিদ্যমান। এই যুগে বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া কোন জাতিভেদ ছিল না। কঠোর তপস্যা দ্বারা (ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য) আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং সমাজে সেই জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা নামক চারটি আশ্রম এই জন্যই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেই সঙ্গে সমাজে যাহাতে অসুরবাদ না থাকিতে পারে এবং উচ্চ সভ্যতামূলক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত থাকে এজন্য সব রকম ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাই বৈদিক সভ্যতার ভিত্তি। নিজেকে ও সমাজকে গড়িবার অতি সুন্দর শক্তিবাদীয় উপদেশে বেদ পরিপূর্ণ। আমরা সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

৪। ওঁ ওজোস্যোজো মে দাঃ স্বাহা॥ ১

তুমি ওজঃ স্বরূপ ওজঃ আমাকে দাও। (আহুতিতে তুমি) তৃপ্ত হও। ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠা দ্বারা যে দীপ্তির প্রকাশ পায় সেই দীপ্তির নাম ওজঃ।

ওঁ সহেসি সহো মে দাঃ স্বাহা॥ ২

তুমি সহ স্বরূপ সহিষ্ণুতা আমাকে দাও। (তুমি) তৃপ্ত হও। (স্বাহা অগ্নিতে আহুতির মন্ত্র)।

ওঁ বলমসি বলং মে দাঃ স্বাহা॥ ৩

তুমি বলস্বরূপ বল আমাকে দাও। আহুতি দ্বারা তুমি তৃপ্ত হও।

ওঁ আয়ু রস্যায়ু র্মে দাঃ স্বাহা॥ ৪

তুমি আয়ুস্বরূপ আয়ু আমাকে দাও। তুমি তৃপ্ত হও।

ওঁ পরিপাণমসি পরিপাণং মে দাঃ স্বাহা॥ ৫

তুমি পরিচালনকারী আমাতে পরিপালন শক্তি দাও। তুমি আহুতিতে তৃপ্ত হও॥

অথর্ব্ব বেদ, দ্বিতীয় কাণ্ড, অনুবাক ৩, সূক্তম্ ৭॥

৫। যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবীচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ১॥

যেমন পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নির্ভীক এবং কখনও ধর্ম্মচ্যুত হয় না। ঠিক সেইরূপ হে আমার প্রাণ তুমি নির্ভীক হও।

যথাহশ্চ রাত্রীচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ২॥

যেমন দিবস ও রজনী নির্ভীক এবং কখনও কর্ত্তব্যচ্যুত হয় না। এইরূপে হে আমার প্রাণ তুমি নির্ভীক হও।

যথা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ৩॥

যেরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র নির্ভীক এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অটল ঠিক সেইরূপ হে আমার প্রাণ, তুমি নির্ভীক হও।

যথা ব্রহ্মচ ক্ষত্রঞ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ৪॥

যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ও বীর নির্ভীক এবং কর্ত্তব্যে অবিচলিত, ঠিক সেইরূপ হে আমার প্রাণ তুমি নির্ভীক হও।

যথা ভূতংচ ভব্যংচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ৫॥

যেমন অতীত আর বদলায় না ভবিষ্যৎও যে ভাবে আসিবার আসিয়াই যায়। ঠিক সেইরূপ হে আমার প্রাণ তুমি নির্ভীক হও।

যথা সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ৬॥

যেরূপ ব্রহ্ম এবং মায়া নির্ভীক এবং কখনও কর্ত্তব্যচ্যুত হয় না। এইরূপ হে আমার প্রাণ, তুমি নির্ভীক হও।

(রিষ্যৎ শব্দের সাধারণ অর্থ ঘুষ লওয়া এবং কর্ত্তব্যচ্যুত হওয়া)

অথর্ব্ব বেদ। কাণ্ড ২। সূক্ত ১৫॥

৬। নির্দ্দগ্ধ রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতয়ো ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃংহহ্যুর্দ্দৃংহ প্রজাং দৃংহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ॥

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, ১ম কাণ্ড, ১ অষ্টক, ৭ম মন্ত্র॥

রাক্ষস (শোষক) নিঃশেষে দগ্ধ হউক, অসুরগণ নিঃশেষে দগ্ধ হউক। তুমি (এই সত্যে) দৃঢ় ও ধ্রুব হও, জগৎকে (এই সত্যে) দৃঢ় কর। আয়ু (জীবনীশক্তি) (এই সত্যে) দৃঢ় কর। প্রজাগণকে (এই সত্যে) দৃঢ় কর।

৭। প্রসম্রাজ অসুরস্য প্রশস্তং পুংসঃ কৃষ্টি মামনু মাদ্যস্য।

ইন্দ্রস্যেব প্রতবসস্কৃতানি বন্দ দ্বারা বন্দমানা বিবষ্টু॥

সামবেদ। আগ্নেয় পর্ব্ব। ৮ দশতি। মন্ত্র ৬॥

অসুরের বিনাশক বীরদের বীর্য্যদানকারী ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী দেবতার (নেতার) স্তুতি পরায়ণ হও। তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর এবং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

৮। উপনিষদ হইতে শক্তিবাদমূলক মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। অনেকের ধারণা উপনিষদ নির্বীর্য্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা। এইরূপ ধারণা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। উপনিষদ বেদেরই অংশ। উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে যাঁহারা বীর্য্যহীন মতবাদে পরিণত করিয়াছেন তাঁহারা পৌরোহিত্যবাদ অথবা ভাববাদের মোহে এইরূপ দুষ্কার্য্য করিয়াছেন, অথবা তাঁহারা ঠিক ব্রহ্মবাদ কি তাহা বুঝেন নাই। (বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ৭ম্ অঃ দ্রষ্টব্য)। আমরা কয়েকখানা উপনিষদের ও বেদান্ত দর্শনের শক্তিবাদ ভাষ্য লিখিবার কথা ভাবিতেছি। পাঠকগণ জানিয়া রাখুন শক্তিবাদই ব্রহ্মবাদ এবং শক্তিবাদই বেদবাদ ও উপনিষদবাদ। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ যে মোটেই ভাববাদ অথবা নির্বীর্য্যবাদ নহে উহা দেখুন -

৯। ওঁ যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যঃ এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ কঠোপনিষদ্ ১০৩

সমস্ত জগৎ এবং জাগতিক পদার্থ সমস্তই প্রাণ (ব্রহ্ম বা শক্তি) হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে বজ্রের মত ভয়ঙ্কর দ্রুত কার্য্যশীল নিয়মে উদ্যত (অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রস্তুত বা উন্মুখ জানেন), তাঁহারা অমৃত হন।

টিপ্পনী। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে কর্ম্মহীন এবং নির্বীর্য্য কিছু জানেন, তাঁহারা অমৃত (অমর) হন কি মৃত হন?

ভয়াৎ অস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ কঠ ১০৪

অগ্নি ইঁহার ভয়ে তাপ দিতেছেন, সূর্য্য ইঁহার ভয়ে তাপ দেন, ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত (অতি দ্রুত পরিচালিত) হইতেছেন।

টিপ্পনী। শূদ্রস্তরের কর্ম্মীরা যখন অসুর ভাবাপন্ন হয় তখন তাহারা কর্ম্মহীন হয়। এ কথা আমরা অসুরবাদ অধ্যায়ে বলিয়াছি। ভাববাদিতার যুগে আমাদের দেশে নির্বীর্য্য মতবাদী ভাববাদীরা নির্বীর্য্য মতবাদের প্রশ্রয় দেন!

ইদ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ স্বর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ কঠোপনিষদ্ ১০৫

যদি কেহ ব্রহ্মকে শরীর পাতের পূর্ব্বে (জানিতে চেষ্টা করেন এবং চেষ্টা করিয়াও জানিতে না পারেন) তবে তাঁহারা স্বর্গলোকে শরীর ধারণ করেন।

১০। ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি॥ কেনোপনিষদ্ ১৪

ব্রহ্ম (ব্রহ্মের নিয়ম) এক সময় দেবাসুর যুদ্ধে অসুরগণকে পরাজিত করেন। ব্রহ্মের এই বিজয়কে (অর্থাৎ বিজয়ের নিয়মকে) দেবতারা নিজেদের বিজয় মনে করিয়াছিলেন এবং নিজেদেরই গৌরব মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন এই বিজয় আমাদের এবং এই গৌরব আমাদেরই।

টিপ্পনী। অসুরবাদের বিরুদ্ধে উচ্চস্তরের মানুষের মনে স্বাভাবিক প্রতিশোধ স্পৃহা প্রবল হইলেই সংঘবদ্ধতা আসে এবং সংঘবদ্ধতার সামনে অসুরবাদ ধ্বংস হয়। প্রকৃতির এই নিয়মই অসুরের বিরুদ্ধে ব্রহ্মের যুদ্ধ। এই যুদ্ধস্পৃহা এত আশ্চর্য্যজনক শক্তিশালী যে কিছুতেই এই স্পৃহা রুদ্ধ করা যায় না। ইহা মানবের মনে শক্তিবাদীয় প্রেরণা। ইহা স্বাভাবিক। হয় অসুরবাদ সংশোধিত হইবে অথবা এই যুদ্ধস্পৃহা প্রবল হইয়া অসুরবাদ ধ্বংস হইবে। দুর্ব্বল স্তরের জ্ঞানীদের উপর সমাজের শ্রদ্ধা থাকিলে এই যুদ্ধস্পৃহা শক্তিশালী হইতে সময় লয় এবং অসুরবাদীয় যুগ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। ইঁহারা বিশ্বপ্রেমবাদের নামে অসুরবাদকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন। ব্রহ্মবাদীয় যুদ্ধে দেবতারা যদি মনে করেন যে আমরা জয়ী হইয়াছি এবং তাঁহারা যদি অহংকার মত্ত হন তবে তাঁহারাও নিশ্চয়ই আসুরিক হইয়া যাইবেন এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা আসিবে না। ইহার ফলে সমাজে বার বার বিপ্লব দেখা দিবে।

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি॥ কেনোপনিষদ্ ১৫

দেবতাদের ঐরূপ মিথ্যা ধারণাকালে তাঁহাদের মিথ্যা নিরসন করিবার জন্য ব্রহ্ম আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু ঐরূপ আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও দেবতারা জানিতে পারিলেন না যে ঐ ''যক্ষ'' কি?

টিপ্পনী। যক্ষ অর্থে নিজের প্রভাবেই পূজনীয় তত্ত্ব। আমাদের অন্তর আপনিই বুঝিতে পারে যে ইনি পূজ্য। ব্রহ্মের ঐরূপ আবির্ভাব সাবধানতা সূচক। দেবতাগণ অহংকারী হইয়াছেন। যদি এই অহং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিপ্লবের পর সমাজশাসনব্যবস্থা নিয়মিত হইতে থাকে তাহা হইলে সেই শাসন ব্যবস্থা পুনঃ আসুরিক হইবে। অসুরের উপর বিজয় বিপ্লবের অকাট্য নিয়ম কিন্তু বিপ্লবের পর যদি শাসন ব্যবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মকে অশ্রদ্ধা করা হয় তবে উহার ফল অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়। বিপ্লবের পর রুশদেশের সুদীর্ঘ দুর্ভিক্ষের কারণ ঐ অহংকার মত্ততা। আমাদের দেশের স্বরাজ লাভের পরও একদল লোকের অহংকার মত্ততা আসিয়াছে। তাঁহারা যে এই বিশাল দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য ২ বৎসরের বহু ঘটনায় উহা প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্তানকে তোষণ করা এবং বিশ্বপ্রেমের ভণ্ডামী প্রচার করাই ইঁহাদের অন্যতম নীতি। এখানে রুশ অপেক্ষাও অতীব ভয়ঙ্কর পরিণতি আসিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে দৈব উৎপাত প্রবল হইবে। শাসকের দোষে দৈব অনর্থ বার বার হয়।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম্ বহু শোভমানামুমাং
হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি॥ কেনোপনিষদ্ ২৫

সেই জ্যোতির মধ্যে বহুবিধ শোভাসম্পন্ন এবং হিমালয়দুহিতা উমা শক্তিরূপে আসিলেন। (ইন্দ্র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ পূজনীয় অদ্ভূতটী কে?

টিপ্পনী। ইতিমধ্যে আমরা অনেক মন্ত্র বাদ দিয়া এই মন্ত্রটী দিয়াছি। সে সব মন্ত্রে দেখা যায় দেবতারা অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রথম আবির্ভূত যক্ষটী যে কে জানিতে পারেন নাই। সেই প্রকাশের মধ্যে হিমালয়ের কন্যা বিখ্যাত শক্তিবাদিনী ব্রহ্মবিদুষী উমা দেখা দিলেন। ইন্দ্রের এবার কথা বলিবার সুবিধা হইল। তিনি তাঁহাকে সেই যক্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। এখানে উমার সম্মান যে সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে কিরূপ উচ্চ ছিল ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমেতি,
ততো হৈব বিদঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ কেনোপনিষদ্ ২৬

উমা বলিলেন - ইনি ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্মের বিজয়, এই বিজয়ে তোমরা মহিমা লাভ কর। তখন ইন্দ্র ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন।

টিপ্পনী। বিপ্লবের পর নূতন সমাজ পত্তন কালে যাহাতে অসুরবাদ প্রবর্ত্তিত না হয় এজন্য যক্ষের আবির্ভাব হইয়াছিল। উমা তাঁহার আবির্ভাব আরও স্পষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, উহা ব্রহ্মের বিজয় অর্থাৎ অসুরের বিরুদ্ধে বিপ্লব ব্রহ্মেরই নিয়ম। ব্রহ্মের এই নিয়মের নীতিতে শক্তিবাদ এবং বিজয়ের পর যেন শক্তিবাদ প্রবর্ত্তিত হয়, যেন অহং মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবর্ত্তন না হয়। পশ্চিম দেশীয় বিপ্লববাদে এবং আমাদের দেশের শক্তিবাদীয় বিপ্লবের ইহাই ভেদ যে এখানে বিপ্লবের পর শান্তি, সুখ ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়; কিন্তু আসুরিক বিপ্লবে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা এবং দুঃখ বৃদ্ধি হয়। আমাদের দেশে স্বাধীনতার নামে যে বিপ্লব যুদ্ধ আরম্ভ হয় উহাতে দুর্ব্বল স্তরের ভিত্তি

থাকিবার দরুণ পাকিস্তান হইল এবং পশ্চিমদেশীয় মতবাদের প্রভাব থাকিবার দরুণ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। ইহাতে প্রাচ্য বিপ্লববাদ বা শক্তিবাদের প্রভাব প্রতিফলিত হইলে দেশের সব রকম অশান্তিই প্রশমিত হইবে এবং সুদিন আসিবে। অহংকার মত্ততা ও ব্রহ্মবাদিতা দুইয়ের ভিত্তিতেই বিপ্লব, যুদ্ধ এবং সমাজ সংস্কার সব হইতে পারে কিন্তু দুইটী কর্ম্মবিজ্ঞানের ফল দুই রকম। জ্ঞানবাদ + কর্ম্মবাদ = শক্তিবাদ; কিন্তু জ্ঞানবাদকে বাদ দিয়া যে কর্ম্মবাদ উহা অসুরবাদ মাত্র। দুর্ব্বল স্তরের কর্ম্মনীতি অসুর তোষণবাদ মাত্র। ইহা সমাজের জন্য অসুরবাদ হইতেও ভয়াবহ। উহা মোটেই অধ্যাত্মবাদ বা বেদবাদ নহে। যাঁহারা মনে করেন কর্ম্মবাদহীন ও যুদ্ধবাদহীন ব্রহ্মবাদের অস্তিত্ব আছে তাঁহারা ব্রহ্মবাদ বুঝিতে পারেন বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। শক্তিবাদীয় কর্ম্মবাদহীন ব্রহ্মবাদ অসম্ভব এবং ব্রহ্মবাদ হীন কর্ম্মবাদ অসুরবাদ মাত্র। বৈদিক সভ্যতার ভিত্তিতে একদিকে ঋষিবাদীয় তপস্যা ও অন্যদিকে অসুরবাদের বিরুদ্ধে শক্তিবাদিতা, একদিকে উপনিষদের জ্ঞানবাদ এবং অন্যদিকে দেবতাদের অসুরবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাদ, ইহাই বেদবাদ।

১১। আচার্য্য শঙ্করের পর আমাদের দেশে বেদবাদীয় কর্ম্মবাদে বেশ ভাল ভাবেই ঘুণ ধরিয়াছে। আচার্য্য দেব গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের নিষ্কর্ম্মবাদ ব্যাখ্যা করেন। ভাববাদী মহাত্মারা দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের চক্করে পড়িয়া এই তিনটির ব্যাখ্যাতে মন দেন এবং ভাববাদীয় ব্যাখ্যা করেন। আচার্য্যের পর জ্ঞানীরা সমাজ দায়িত্ব হইতে আলগা হইয়া যান এবং সমাজটি পুরোহিতদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। ভাববাদী মহাত্মারা এই দুঃসময়ে আরও একটী প্রলেপ বেদবাদের উপর মালিশ দেন। তাঁহারা ব্রহ্ম দ্বৈত কি অদ্বৈত এই প্রশ্ন তোলেন এবং 'দাসোঽহম্' বা 'আমি দাস' এর চক্করে পড়িয়া আরও এক অনর্থ সৃষ্টি করেন। ইহাতে পৌরোহিত্যবাদের আরও সুবিধাই হইল। তাঁহারা দেখিলেন, ভালই হইল। সমাজের সকলেই 'দাস আমি' যদি মানিয়া লয় তবে তাঁহাদের ''বিপ্র পাদোদকং'' অর্থাৎ পুরোহিতের পদজল প্রসাদ ভালভাবে প্রসার লাভ করিতে পারিবে। ইতি মধ্যে ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা মন্দিরে বেদান্তবাদ পাঠ্য হইবার পর এক শ্রেণীর ফিলোসফার আমাদের দেশে দেখা দিলেন। তাঁহারা আরও বিপজ্জনক হইলেন। সমাজের উপর যখন মক্কাবাদী বর্ব্বরেরা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে তখন ইঁহারা চুপ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সমাজে ইহার প্রতিশোধের ব্যবস্থা হয় তখন এই সব ফিলোসফারের দল বিশ্বপ্রেম ও নিষ্কাম নিষ্কর্ম্মবাদের দোহাই দিতে থাকেন। আচার্য্য শঙ্করের পর হইতে আমাদের সমাজের উপর যে কত রকম অনর্থ সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে উহা ভাবিতেও ভয় হয়। যে দিকে তাকাও সেই দিকে বেদবাদ ও শক্তিবাদের উপর প্রলেপ চলিয়াছে। নিষ্কর্ম্মবাদ, দাসোঽহম্‌বাদ, ধর্ম্মসমন্বয়বাদ, বর্ব্বরমতসহিষ্ণুতাবাদ, সেকুলারবাদ, আরও কত কি অবৈদিক, কাল্পনিক, যুক্তিহীনবাদে এ দেশ ও সমাজ নরক হইতে চলিয়াছে। বিখ্যাত অহিংসবাদী প্রহ্লাদ নিজের পিতাকে নৃসিংহ বিষ্ণু দেবতার দ্বারা নখদংষ্ট্রে ছিন্ন ভিন্ন হইতে দেখিয়া (প্রহ্লাদ) নৃসিংহদেবের স্তব করিলেন, কিন্তু আমাদের বহু সর্ব্বনাশকারী প্রতারক অহিংসবাদীরা, নারীর লাঞ্ছনাকারী ও কলিকাতা ও

নোয়াখালী কাণ্ডের দলকে নৃসিংহমূর্ত্তিতে ছিন্ন করিতে কেহ অগ্রসর হইলে তাঁহাদের উপরই খড়্গহস্ত হন।

১২। মানবের মনে উচ্চস্তরের প্রেরণা আসিলে তাঁহার কর্ম্মে তাহা ধরা পড়ে। অসুরস্তরের প্রেরণা এবং দুর্ব্বলস্তরের প্রেরণাও এই ভাবেই পরীক্ষা করা যায়। সমাজ পালন, জ্ঞানের অনুশীলন (ব্রহ্মচর্য্যহীন জ্ঞানের অনুশীলন ভণ্ডামী মাত্র) এবং অসুর ধ্বংসের প্রেরণাতে ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা সমভাবেই বিদ্যমান। রাজর্ষি জনক সমাজপালনের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। নিজ নিজ কর্ম্ম মধ্যেই মানুষের দার্শনিক জ্ঞান ফুটিতে পারে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ একথা আরও জোর দিয়া বলিয়াছেন:- স্বকর্ম্মনো তমভ্যশ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। যোগ, ধ্যান বা তপস্যা দ্বারা জীবনে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিভা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বশিষ্ঠ দেব, বিশ্বামিত্র, বুদ্ধ প্রভৃতিগণ রহিয়াছেন। অসুরবাদ ধ্বংস কার্য্যের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভা আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে ভালভাবেই দেখিতে পাই। বৈদিকযুগের ইন্দ্র, বরুণ, যম, মিত্র, বসুগণ সকলেই অসুরবাদ ধ্বংসের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভা দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানের স্তরের জ্ঞানী, যোগী, সমাজ রক্ষক, সমাজ পালক, সমাজ পোষক ও অসুরের বিরুদ্ধে যোদ্ধার চিন্তাধারা একই বিজ্ঞানে নিয়মিত। বেদবাদ জ্ঞান অথবা শক্তিবাদ জ্ঞানে সমাজ পালন, যুদ্ধ এবং যোগ ধ্যান সবই চলিতে পারে। এইরূপ জ্ঞানবাদ ও কর্ম্মবাদই বেদবাদ। যোগ, ধ্যান, তপস্যা ও ত্যাগ যে কত উন্নত স্তরের শক্তিবাদিতা ইহা যাঁহারা কঠোর তপস্বী নহেন তাঁহারা জানেন না।

১৩। স্বয়ম্ভূব মনু প্রবর্ত্তিত সমাজবাদের পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষে বেদবাদমূলক সমাজবাদ প্রবর্ত্তিত ছিল। এই সমাজবাদের কঙ্কাল এখনও বঙ্গদেশে বিদ্যমান। মহারাজ স্বয়ম্ভূব মনু যে সমাজবাদ স্থাপন করেন উহার প্রতিষ্ঠা মধ্যভারতে অর্থাৎ কাশীর চারিদিকে বেশ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিখ্যাত পৌরোহিত্যবাদী পণ্ডিতপ্রবর রঘুনন্দন মহাশয় স্মার্ত্তবাদ প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন। বঙ্গের বহু অংশ এই স্মার্ত্তবাদ বহুদিন পর্য্যন্ত মানে নাই। কিন্তু পরে ইংরেজ রাজত্বকালে দায়ভাগায় আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর আইনের জটীলতা অতিক্রম করিবার জন্য সমস্ত বঙ্গদেশই রঘুনন্দনের স্মার্ত্তবাদীয় কোঠায় আসিতে বাধ্য হয়। রঘুনন্দন যাহা প্রবর্ত্তন করেন উহাকে স্মার্ত্তবাদও বলা যায় না। ইহার নাম শূদ্রবাদ। বঙ্গদেশ অনায়াসে ১০ দিন মাত্র অশৌচ পালন করিয়া এবং গায়ত্রী উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়া এই শূদ্রবাদের মিথ্যা কলঙ্ক অতিক্রম করিতে পারে। আমাদের শক্তিশালী সমাজবাদীরা গায়ত্রী, ব্রহ্মস্তুতি ও মহামন্ত্রের উপাসনা করে এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করে। শক্তি, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য, অবতারবাদী, প্রেতবাদী, পিতৃবাদী, দেবতাবাদী, মহাপুরুষবাদী বা ব্রহ্মবাদী সকলেই এই উপাসনা করিতে পারেন। আমরা প্রত্যেক বঙ্গবীর নরনারীকে অন্ততঃ বাঙ্গালী জাতির জাতীয় কলঙ্ক বিমোচনের জন্যও এই উপাসনা করিতে অনুরোধ করি এবং ১০ দিন মাত্র অশৌচ বিধান মান্য করিতে অনুরোধ করি। আমরা এই অধ্যায়ে বঙ্গদেশীয় সমাজবাদ যে বৈদিক যুগের সমাজবাদবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ইহা বেদের প্রমাণসহ প্রমাণ করিব।

১৪। বঙ্গদেশে 'হরি' নামে ঈশ্বর উপাসনা বেদবাদিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বেদে ঈশ্বরকে হরি বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশ ভিন্ন সমস্ত দেশই জানে যে হরি ঈশ্বরের

বেদবাদীয় নাম, কিন্তু সমাজ জীবনে 'হরি' নামে তাঁহার উপাসনা বঙ্গ ভিন্ন কোথাও প্রচলিত নাই। বেদের ''হরি ওঁ'' কে পৌরোহিত্যবাদী মহাজনগণ ভাববাদের চিনি মোড়কে জড়াইয়া দিয়া 'ওঁ'টি বাদ দেন এবং 'ওঁ' এর প্রতিশব্দ 'ধ্বনি' বা 'বোল' শব্দ যোজনা করেন। হরিধ্বনি, হরিবোল এবং হরি ওঁ একার্থ বাচক শব্দ। বঙ্গদেশকে শূদ্রদেশে পরিণত করিবার জন্য বাংলায় দুইটী শক্তিশালী অভিযান হইয়াছিল। উহার একটীর প্রবর্ত্তন করেন রঘুনন্দন ও তাঁহার সমর্থকগণ, অন্যটী প্রবর্ত্তন করেন চৈতন্যবাদী ভাবুক সম্প্রদায়। পাঠক জানিয়া রাখুন 'হরি ওঁ'ই মূল শব্দ। বাংলায় ইহা সব দিনই প্রচলিত ছিল। বাংলায় আবার বোল ও ধ্বনির পরিবর্ত্তে 'ওঁ' শীঘ্রই আসিতেছেন।

১৫। বঙ্গদেশীয় সমাজে কোন বর্ণেই বিধবা বিবাহের সমর্থন নাই। অধিক কি যাহারা পৌরোহিত্যবাদের নির্দ্দেশে অছুঁৎ বলিয়া পরিচিত তাহাদের মধ্যেও সতীবাদীয় আদর্শ ও নিয়ম উচ্চ বর্ণীয় হিন্দুদের মতই প্রবর্ত্তিত। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য স্মার্ত্তবাদীয় সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং কায়স্থ ভিন্ন সমস্ত জাতের মধ্যে বিধবার বিবাহ প্রবর্ত্তিত আছে। বঙ্গদেশের সমাজ জীবনে সতীবাদ বেদবাদীয় সতীবাদ মাত্র।

১৬। বঙ্গদেশীয় শ্রাদ্ধবিধান সম্পূর্ণরূপে বৈদিক আচারে ও বৈদিক নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যথাবিধি বৈদিক বিহিত পত্রশোভিত মঞ্চে, শ্রাদ্ধকালের দৃশ্য দেখিলে বৈদিক যুগের সরল সভ্যতার একটা স্পষ্ট আভাষ যে কোন বর্ণের শ্রাদ্ধকালে বঙ্গদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের কুত্রাপি এই দৃশ্য দেখা যায় না। বৈদিক সভ্যতায় বঙ্গদেশের অসীম নিষ্ঠা। আমরা বঙ্গদেশকে ৩০ দিনের অশৌচের শূদ্রবাদীয় ভ্রষ্টাচার ত্যাগ করিতে বলি।

১৭। বঙ্গদেশের নারীদের জীবন সমস্ত ভারতের তুলনায় অন্য প্রকারের। এখানে নারীরা অত্যন্ত সম্মানিতা। নারী জাতিকে মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক যুগে নারীর সম্মান ও সতীত্বের মর্য্যাদা কিরূপ মহান ছিল তাহা পাঠকগণ এই অধ্যায়ের ১০ সংখ্যক সূত্রে দেখুন। স্মার্ত্ত সভ্যতা নারীকে বৈদিক সভ্যতার মত উচ্চস্থান দেয় নাই। তাহা কাশী অঞ্চলের সমাজে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে যেখানে স্মার্ত্তবাদীয় সমাজবাদ দুর্ব্বল এবং বৈদিক যুগের সমাজবাদ প্রবল সেই সব স্থানেই নারীদের সমাজপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা একটু বেশী। বঙ্গদেশের স্বামীস্ত্রীর জীবনের আদর্শ শিবপার্ব্বতীর জীবনের মত বৈদিক সভ্যতার অনুকূল, কিন্তু স্মার্ত্তবাদীয় স্বামীস্ত্রীর জীবন ইহা হইতে একটু বদ্ধ ধরণের। স্বামীস্ত্রী শিব পার্ব্বতীর মত জ্ঞান, বিজ্ঞান, যোগ ও দার্শনিক জীবনের পরস্পর সাথী; কিন্তু স্মার্ত্তবাদীয় জীবন লৌকিক সুখ দুঃখের জীবন। জ্ঞানযোগ ও দার্শনিক জীবনে স্মার্ত্তবাদীয় দেশে স্ত্রীকে স্বামীর অনুসরণ করিতে দেখা যায় না। ইহাতে বেদের জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা কর্ম্মকাণ্ডের প্রভাব বেশী দেখা যায়। স্মার্ত্তবাদীরা নারীকে যথেষ্ট সম্মান দেয় নাই।

১৮। বঙ্গদেশীয় বৈদিক সভ্যতা মূলক সমাজবাদ মধ্য ভারতে এবং মধ্য ভারতের স্মার্ত্ত সভ্যতা মূলক সমাজবাদ বঙ্গদেশে প্রচার করা প্রয়োজন। বেদ বাদীয় সমাজই শক্তিবাদ সমাজ, এজন্য ইহা সব সময় ডায়নামিক (শক্তিশালী), কিন্তু স্মার্ত্ত সমাজ স্থির সমাজ। সমাজ জীবনে উভয়বিধ সমাজেরই প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ

ও সন্ন্যাস রূপ চার আশ্রম ব্যবস্থাতে বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র ও বৌদ্ধবাদ সমান ভাবে সমর্থন করিয়াছে। বর্ণভেদ বৈদিক যুগে মাথা তোলে নাই, বৌদ্ধ যুগেও উহা ছিল না, তান্ত্রিকরাও উহা মানেন নাই। বাংলায় বর্ণধর্ম্ম কোন দিন ছিল না, এখনও নাই। এজন্য সমস্ত ভারতে বঙ্গদেশের সভ্যতার উপর একটা প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য আকর্ষণ আছে। আমরা বেদবাদ ও বেদবাদীয় ভিত্তিতে সমাজ বাদ সমর্থন করি। আমরা বৌদ্ধবাদীয় সমাজবাদও সমর্থন করি। কারণ চার আশ্রম ঐখানেও স্বীকৃত। কিন্তু রঘুনন্দন বাদীয় শূদ্রবাদ কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না। ইহা বাঙ্গালীদের জন্য অত্যন্ত অপমানকর সমাজবাদ। বাঙ্গালীরা শক্তিশালী সমাজবাদে প্রতিষ্ঠিত উপাসনা করুন এবং মাত্র ১০ দিন অশৌচ রক্ষা করুন, তাহা হইলে বাংলা হইতে পৌরোহিত্যবাদের গুণ্ডামী তিরোহিত হইয়া যাইবে।

১৯। বঙ্গদেশীয় দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা বৈদিক বাদীয় সমাজবাদের আরও এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। দুর্গা নবরাত্রি অনুষ্ঠান ভারতের সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু বৈদিক যুগের শক্তি বোধন বাংলার মত কোথাও জাতীয় উৎসবে পরিণত হয় নাই। অসুরবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অভিযানই দুর্গাপূজা এবং জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠাই সরস্বতী পূজা। বেদের জ্ঞানবাদই সরস্বতী এবং বেদের শক্তিবাদই দুর্গা।

২০। বঙ্গদেশের সমাজ ব্যবস্থায় বৈদিক দেবতাদের অংশগুলি আজও বিদ্যমান। বাংলার উপর দিয়া বৌদ্ধবাদীয় সমাজবিপ্লব, রঘুনন্দনীয় শূদ্রাচার বিপ্লব বহিয়া গেলেও বাংলায় বৈদিকবাদী সমাজনিষ্ঠা যায় নাই। বাংলার তান্ত্রিক সাধনা ও বৈদিক সভ্যতা একেবারে রক্তমাংস জড়িত হইয়া গিয়াছে। চৈতন্যবাদ প্লাবিত দুর্ব্বল বঙ্গে মুসলমান ধর্ম্ম খুবই বিস্তারলাভ করিয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই বঙ্গদেশ হইতেই এমন বৈদিক সভ্যতার বন্যা উঠিবে যাহার ফলে মুসলমান সভ্যতা কেবলই বঙ্গদেশ নহে সমস্ত ভারত হইতেই বহিষ্কৃত হইবে। আমরা জানি বঙ্গদেশ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। বাংলার চক্ষু এখনও ফোটে নাই। রঘুনন্দনের শূদ্রবাদ বা চৈতন্যবাদ অথবা ধর্ম্মসমন্বয়ের নামে বর্ব্বরতোষণ বাংলার স্বরূপ নহে। বাংলার স্বরূপ শক্তিবাদ।

২১। আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মনোবিজ্ঞান সম্মত মানুষের কথা বলিয়াছি। বেদের দেবতা সেই যুগে দৈবী ভাবাপন্ন মানব মাত্র। পরবর্ত্তী যুগে সে সব শ্রেষ্ঠ মানবগণ বা তাঁহাদের মত প্রভাবশালী তাঁহাদের বংশধরগণ সমাজের মহৎকার্য (অর্থাৎ অসুর নাশরূপ কার্য) সম্পন্ন করিতেন এবং সমাজের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইতেন। শ্রেষ্ঠ মানবরাই যে দেবতা এ সম্বন্ধে বেদের প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। যথা :-

ওঁ অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভিরাসয়া অকারি রত্নধাতমঃ॥

ঋগ্বেদ, ২য় অঃ। ২০ সূক্ত। ঋচা ১॥

সর্ব্বতোভাবে অভীষ্ট সাধক বক্ষ্যমান এই বেদমন্ত্র সকল মনুষ্যরূপী দেবতার প্রীতি কামনায় মেধাবী জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক মুখে মুখে (সদাকাল) উচ্চারিত হয়॥ দেবতা অর্থে অসুরবাদ বিরোধী সম্প্রদায়।

বঙ্গদেশীয় বংশ পরিচয় বেদ বিধানেই প্রবর্ত্তিত আছে। আমরা এ সম্বন্ধে বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

২২। শর্ম্মা। বঙ্গদেশীয় বহু বংশ এই নামে পরিচিত। শর্ম্ম অর্থে সমাজের মঙ্গলকারী সম্প্রদায়। ইহা দেবতাবাচক শব্দ। ভদ্র ও শর্ম্ম বেদের মতে একার্থ বাচক। বেদের সব দেবতার স্তুতিতেই শর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। বঙ্গদেশের বহু বংশই ভদ্রবংশ নামে খ্যাত। বেদের প্রমাণ :-

শর্ম্মাসি মে শর্ম্ম মে যচ্ছ...॥ শুক্ল যজুর্ব্বেদ। ৪ অঃ। ৯ম্ মন্ত্র।

আপনি মঙ্গলময়, আমরা মঙ্গল করুন অথবা আমাকে মঙ্গলকারী করুন।

বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজমানস্য শর্ম্ম মে যচ্ছ নক্ষত্রাণাং মহিতীকাশাৎ পাহি। কৃষ্ণ যজুঃ। ১ম্ কাণ্ড। ১ম্ অঃ। মন্ত্র ২। মন্ত্রাংশ ১১॥

তুমি বিষ্ণুর (ব্যাপক সমাজের) মঙ্গলের হেতু এবং আমার ও যজমানের মঙ্গলের হেতু, আমাকে পরম সুখ প্রদান কর এবং নক্ষত্র জগতের মহতী জ্যোতি হইতে রক্ষা কর।

২৩। বসু। ইহা বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ বংশ। সুভাষ বসু ও জগদীশ বসুর নাম পৃথিবীতে কে না জানে? বেদে বসুদের এত স্তুতি আছে যে একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ আকারে ঐ সব মন্ত্র সংগ্রহ করা চলে। ইংরেজ রাজত্বকালে বসুগণ বোস্ বলিয়া পরিচিত হইতেন বলিয়া এখন বসু স্থানে অনেকে বোস্ লিখিয়া থাকেন। আমরা বঙ্গদেশীয় এই প্রসিদ্ধ বংশের 'বসু' নামই লিখিবার পক্ষপাতী। মহাভারতের পিতামহ ভীষ্ম বসুদেরই একজন। বেদের প্রমাণ :-

"ওঁ অহং রুদ্রোভির্বসুভিশ্চরাম্য হং...॥" ঋগ্বেদ দেবী সূক্ত। ১॥

আমি (শক্তি) রুদ্রগণে ও বসুগণে বিচরণ করিয়া থাকি। (আমরা যে সব মন্ত্র উদ্ধৃত করিব তাহাতে বসুদের কথা অনেক মন্ত্রেই বিদ্যমান কাজেই বেশী মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল না।)

২৪। রুদ্র। ইহারা বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ বংশ। চৈতন্যদেবের সময় উড়িষ্যায় প্রতাপ রুদ্র রাজত্ব করিতেন। চারখানা বেদেই সহস্র সহস্র মন্ত্রে রুদ্রের প্রশংসা বিদ্যমান। বেদের প্রমাণ :-

ওঁ অহং রুদ্রায় ধনুরাতো নোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ॥ ঋগ্বেদ। দেবী সূক্ত ৬॥

যাঁহারা ব্রহ্ম বিদ্বেষী (অসুর) তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য আমি রুদ্রের হস্তে ধনুরোপণ করিয়া থাকি।

২৫। দেব। ইহারা বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ বংশ। বাংলার প্রত্যেক সমাজেই 'দেব' বংশ আছে। ইহা বাঙ্গালার বেদনিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ। পশ্চিম দেশের অনেক ক্ষত্রিয় রাজবংশ আছেন যাঁহাদের এখনও ষ্টেট (রিয়াসৎ) আছে, তাঁহারাও দেববংশ নামে খ্যাত। অনঙ্গ ভীম দেবের রাজত্বকালে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেব, দেও এবং দে একই শব্দ। পুরোহিত সম্প্রদায় দেব বা দেওকে দে বলিত বলিয়া এখন অনেকে বসুর স্থানে বোস্ লিখিবার মত দেব স্থানে দে লিখিয়া থাকেন। দেব, দেও, দে, দেব বাহাদুর, দেব রায়, দেব রায়ফৎ, দেবশর্ম্মা, দেব বর্ম্মণ, দেব ভূপ বাহাদুর, দেব সিংহ ইত্যাদি অনেক নামে দেববংশ পরিচিত। দেব প্রশংসা তো বেদের প্রায় প্রত্যেকটি মন্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের প্রমাণ :-

তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥ ঋগ্বেদ। দেবী সূক্ত ৩॥

আমি সর্ব্বভূতের মধ্যেই ব্যাপ্ত আছি, সর্ব্বজীবে আমিই বিদ্যমান। দেবতাগণ যেখানে যে সব পূজাদি করিয়া থাকেন সব আমাকেই (শক্তিকেই) পূজা করিয়া থাকেন।

...অহমাদিত্যৈ রুত বিশ্ব দেবৈঃ। ঋগ্বেদ। দেবীসূক্ত ১॥

আমি আদিত্যগণে ও বিশ্বদেবগণে (বিচরণ করি)॥

ওঁ দেবো বো দ্রাবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ঠাসিচম্ উদ্ বা

সিঞ্চধ্বমপবা পৃণধ্বমাদিদ্ বো, দেব ওহতে॥

সামবেদ। আগ্নেয়কাণ্ড। প্রথম প্রপাঠক ৬ষ্ঠ দশতি॥

দেবতাগণ তোমাকে দ্রব্যদাতা হন, তুমি শ্রুব পূর্ণ করিয়া বার বার আহুতি দান কর আরও আহুতি দান কর। দেবতারা তোমার জন্য ইপ্সিত ফল দিবেন।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্য বিজিগ্যে।

তস্যহ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অহমীয়ন্ত। কেনোপনিষদ মন্ত্র ১৪॥

দেবতাদের বিজয়ে ব্রহ্মেরই বিজয় হইয়াছিল। ব্রহ্মের বিজয়ে দেবতারা নিজেদের বিজয় মনে করিয়াছিলেন।

দেব, বসু, রুদ্র, আদিত্য, সোম প্রভৃতি দেবতার কথা বেদের প্রত্যেকটী সূক্তে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এখানে আরও যে সব মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে তাহাতে ইঁহাদের কথা আছে।

২৬। আদিত্য। ইহারা বঙ্গদেশীয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ বংশ। প্রতাপাদিত্য এক সময় বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। আকবরের সেনানায়ক মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন। বেদে আদিত্য দেবতার সহস্র সহস্র মন্ত্রে প্রশংসা আছে। প্রমাণ :-

অহং আদিত্যৈ রুত বিশ্বদেবৈঃ॥ ঋগ্বেদ। দেবী সূক্ত ১॥

আমি আদিত্য ও বিশ্বদেবগণে (বিচরণ করি)।

২৭। সোম। ইহারা বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ বংশ। বেদে ইঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসা বিদ্যমান।

প্রমাণ :- ওঁ অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং...। ঋগ্বেদ। দেবী সূক্ত ২॥

২৮। ব্রহ্ম। বঙ্গদেশে ব্রহ্ম বংশ আছে। বেদের প্রমাণ :-

তং ব্রহ্মাণং তং ঋষিং তং সুমেধাং॥ ঋগ্বেদ দেবীসূক্ত।

আমি কাহাকেও ব্রহ্ম কাহাকেও ঋষি ও কাহাকেও মেধাবী করিয়া থাকি।

অগ্নে ব্রহ্ম গৃভ্ণীষ্ব॥ শুক্ল যজুর্ব্বেদ। অধ্যায় ১। কণ্ডিকা ১৮। মন্ত্র ১॥

হে অগ্নি, আপনি ব্রহ্ম স্বরূপ, আপনি গ্রহণ করুন।

২৯। ঘোষ। বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ বংশ। বেদে ঘোষের অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। ঘোষ শব্দের বৈদিক অর্থ নির্ভীক যোদ্ধা। বেদের প্রমাণ :-

ইন্দ্র ঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ পাতু মনো জবাস্ত্বা

পিতৃভির্দ্দক্ষিণতঃ পাতু প্রচেতাস্ত্বা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু

ত্বা হু দিত্যৈরুত্তরতঃ পাতু॥ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ। প্রথম অষ্টক। মন্ত্র ১২। মন্ত্রাংশ ৬॥

তুমি ইন্দ্র ঘোষ (ইন্দ্রের মত নির্ভীক), তুমি বসুগণ দ্বারা পূর্ব্বদিক রক্ষা কর। তুমি উৎকৃষ্ট চিন্তাশীল, তুমি পিতৃগণ দ্বারা দক্ষিণদিক রক্ষা কর। তুমি মহান জ্ঞানী, তুমি রুদ্রগণ দ্বারা পশ্চিমদিক রক্ষা কর। তুমি বিশ্বকর্ম্মা (সমস্ত কর্ম্মে কুশল), তুমি আদিত্যগণ দ্বারা উত্তরদিক রক্ষা কর।

৩০। বিষ্ণু। বঙ্গদেশে বিষ্ণু বংশ আছে। সমাজ নেতাই বিষ্ণু। বেদের প্রমাণ :- এই অধ্যায় ২২ সূত্র দেখ।

৩১। বর্দ্ধন। বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ বংশ। হর্ষবর্দ্ধন, প্রভাকর বর্দ্ধন ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ইহার অর্থ বর্দ্ধনকারী। অগ্নিকে এবং অন্যান্য দেবতাকে এই সম্মানসূচক শব্দে স্তুতি করা হইয়াছে। বেদের প্রমাণ :-

অয়মগ্নি পুরীষ্যো রয়িমান পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।
অগ্নে পুরীষ্যভি দ্যুম্নমভি সহ আয়চ্ছস্ব॥
শুক্ল যজুর্ব্বেদ। অঃ ৩। কণ্ডিকা ৪০॥

এই অগ্নি অজ্ঞানভাবাপন্নগণের (অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের) হিতকারী। ইনি রয়িমান (অলৌকিক শক্তিমান) পুষ্টি ও বর্দ্ধনকারী। অজ্ঞানজনের হিতকারী হে অগ্নি, আপনি আমাকে অজ্ঞানদিগের রক্ষার জন্য অন্ন ও বল দান করুন।

যো রেবান্ যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।
স নঃ সিষক্তু যস্তরঃ॥ শুক্ল যজুর্ব্বেদ। অঃ ৩। কণ্ডিকা ১৯॥

যিনি রোগ বিনাশক, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি ধনবান এমন যে পুষ্টি বর্দ্ধনকারী ও শীঘ্র ফলদাতা তিনি কৃপা করুন।

৩২। মিত্র। বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ বংশ। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নাম কে না জানে? বঙ্গদেশের মিত্রগণ সকলেই বিশ্বামিত্র গোত্রীয় বা বংশীয়। বেদের প্রমাণ :-

অহং মিত্রা বরুণোভা বিভর্ম্ম্যহম হমশ্বিনোভা। ঋগ্বেদ। দেবীসূক্ত। ১॥
আমি মিত্র ও বরুণে এবং অশ্বিনীদ্বয়ে বিচরণ করি॥

৩৩। রায়। বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ বংশ। ঐশ্বর্য্যবান পুরুষ। বেদে বহুস্থানে ইহাদের উল্লেখ আছে। বেদের প্রমাণ :-

ত্বে রায়ঃ॥ শুক্ল যজুর্ব্বেদ অঃ ৪। ২২ কণ্ডিকা। মন্ত্রাংশ ৪॥
তোমাতে ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান।
রয়িশ্চমে রায়শ্চমে ... যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ যজুঃ রুদ্রী। ৮ম অধ্যায়। মঃ ১০॥
অস্মে রায়স্তে রায় স্তোতে রায়ঃ॥ কৃষ্ণ যজুঃ। প্রথম অষ্টক। মন্ত্র ২॥
আমাতে রায় (লৌকিক ঐশ্বর্য্য) হউক, রায় তোমাতে আছে। তুমি রায় স্বরূপ।

৩৪। চন্দ্র। বঙ্গদেশীয় বংশ। বঙ্গদেশে চন্দ্র বংশের রাজত্ব ছিল। বেদে ইঁহাদের প্রমাণের অভাব নাই। মহাভারতের রাজাগণে চন্দ্রবংশীয়গণই বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। বেদের প্রমাণ :-

অস্মে তে চন্দ্রানি॥ শুক্ল যজুর্ব্বেদ। অধ্যায় ৪। ২২ কণ্ডিকা। মন্ত্রাংশ ২৬॥

৩৫। কর। 'কর' অর্থে বাহু। ইহা ক্ষত্রিয়বাচক। বেদের প্রমাণ :-

বাহুঃ রাজন্যঃ কৃতঃ। (যজুঃ পুরুষ সূক্তম্)

পরম পুরুষের বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি। ধর এবং কর একার্থ বাচক।

৩৬। ভদ্র। মঙ্গলকারী। ইহা শর্ম্ম শব্দের সমানার্থ বাচক। বঙ্গদেশে ভদ্রবংশ আছে। শীলভদ্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। বেদের প্রমাণ :-

ভদ্রো নো অগ্নি রাহুতো। ভদ্রো রাতিঃ স্বভগ ভদ্রো অধ্বরঃ।

ভদ্রা উত প্রশস্তয়ে॥ সামবেদ॥ আগ্নেয় পর্ব্ব। ১২ দশতি। ৫ম সাম॥

আহুতি দ্বারা তৃপ্ত অগ্নি আমাদের মঙ্গলময় হউন। আমাদের দানাদি মঙ্গলময় হউক। আমাদের যজ্ঞাদি মঙ্গলময় হউক।

৩৭। শূর। বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ বংশ। বাংলায় আদিশূরের রাজত্ব ছিল। শূর অর্থে নির্ভীক বীর। বেদের প্রমাণ :-

সদা ব ইন্দ্রশ্চর্কৃষদা উপো নু স সপর্য্যন্।

নঃ দেবো বৃতঃ শূর ইন্দ্র॥ সামবেদ॥ ঐন্দ্র পর্ব্ব। ৯ম দশতি। সাম ৩॥

ইন্দ্র সর্ব্বদা তোমাদিগকে যজ্ঞাদি কর্ম্মে আকর্ষণ করেন। তিনি সর্ব্বদা এজন্য প্রেরণা দান করেন। তিনি আমাদের দেবতা, তিনি শূর, তিনি পূজ্য, তিনি ইন্দ্র (নেতা)।

৩৮। সেন। বঙ্গদেশে সেন বংশ খুবই প্রসিদ্ধ বংশ। বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। দেব সেনা কার্ত্তিকেরই নাম। বেদের মতে সেনা সৈন্যবাচক শব্দ।

প্রমাণ :- সংক্রন্দনো নিমিষহ একবীর সতং সেনাহ জয়স্তাকমিন্দ্রঃ।

যজুর্ব্বেদ রুদ্রী। অঃ ৩ মন্ত্র ১॥

নমঃ সেনাভ্যঃ। সেনানিভ্যশ্চ ...॥ যজুর্ব্বেদ রুদ্রী। ৫ম অঃ। মন্ত্র ২৬॥

যো অদ্য সেন্যো বধহ ঘায়ুন মুদীবতে। যুবং তং মিত্রা বরুণা বস্মদ্যয়তং পরি॥

অথর্ব্ব। ৩য় অনুবাক। ২য় সূক্ত। মন্ত্র ২॥

এই সময় সেনাক্ষয় কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। হে মিত্র ও বরুণ তোমরা আমাদের জয়ের অনুকূল।

৩৯। বিশ্বকর্ম্মা। বঙ্গদেশীয় শিল্পী সম্প্রদায়ের নাম। বেদের মতে ইহারাও দেবতা। শিল্পী না থাকিলে অস্থরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অস্ত্র প্রস্তুত হয় না। ইঁহারা বিনা বাড়ী, ঘর, গাড়ী, পোত, বিমান, কল-কারখানা সব স্বপ্ন মাত্র। স্মার্ত্তকারেরা ইহাদিগকে শূদ্র বলিতে চান। ইহারা শূদ্র কি ব্রাহ্মণ সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নহে; ইঁহারা বৈদিক যুগের দেবতা সম্প্রদায়। বঙ্গ দেশীয় স্মার্ত্তকারেরা তো ঘরে বসিয়াই অনেক শূদ্রই গড়িয়াছেন। চৈতন্য বাদের প্রভাবে ভাববাদী বঙ্গদেশে এখনও ৩০ দিন অশৌচ বিধান মান্য করিবার লোক আছে বলিয়াই ব্রাহ্মণ শূদ্রের কথা উঠে। নয়তো শক্তিবাদী ও বেদবাদী বঙ্গদেশের সভ্যতায় যে এখনও স্মার্ত্তবাদ দাঁত বসাইতে পারে নাই। ইহা আমরা ভাল ভাবেই প্রমাণ করিতে পারি। আমরা বঙ্গদেশকে বলি ১০ দিন মাত্র অশৌচ মান্য কর। কে কাহার কন্যা বিবাহ করিল বা করিল না, সেটা লইয়া মাথা ঘামাইও না। বিবাহ নিয়ম যেমন আছে, তেমনই থাকুক। গায়ত্রী উপাসনা কর এবং এই বিজ্ঞানে আরও টুকরা টুকরা সমাজ গড়িয়া মুসলমান খৃষ্টানগণকে স্বধর্মে ফিরাইয়া আন। এই ভাবে সমস্ত পৃথিবীতে আবার বেদবাদ ও শক্তিবাদ অভিযানে অগ্রসর হও। বিশ্বকর্ম্মা ও বেদের প্রমাণ :-

বিশ্বকর্ম্মা ত্বাদিত্যৈ রুত্তরতঃ পাতু॥

শুক্ল যজুর্ব্বেদ। ৫ম অধ্যায়। ১১ কণ্ডিকা। মন্ত্রাংশ ৪॥

উত্তরদিকে বিশ্বকর্ম্মা তোমাকে রক্ষা করুন।

এই অধ্যায়ের ২৯ সংখ্যক সূত্রে আরও প্রমাণ দেখুন।

৪০। দাস। বঙ্গদেশে দাস বংশ আছে। চিত্তরঞ্জন দাশের কথা পৃথিবী বিখ্যাত। বেদের মতে দাস সৈন্যবাচক শব্দ। বেদের প্রমাণ :-

ইন্দ্রাগ্নি নবতিং পুরো দাস পত্নীর ধূনুতম্। সাকমেকেন কর্ম্মণা॥

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ। প্রথম খণ্ড। প্রথম অষ্টক। মন্ত্র ১৪॥

হে ইন্দ্র এবং অগ্নি! আপনারা দাস শক্তি বেষ্টিত করিয়া অসংখ্য গৃহকে রক্ষণ করেন। এই কর্ম্ম দ্বারা আপনারা মহিমান্বিত। কোন কোন টীকাকার 'দাস' শব্দ দস্যু অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অর্থ মানিলে এই মন্ত্রের কোন অর্থই হয় না। এখানে মন্ত্রে যে সব শব্দ আছে উহাদের পর পর অর্থ এইরূপ - ইন্দ্র ও অগ্নি, নব্বই (অসংখ্য) পুর (বাড়ী) দাসশক্তি পরিবেষ্টিত। মহিমান্বিত এই কর্ম্ম দ্বারা। আমাদের মতে এখানে দুই রকম অর্থ হয়। একতো আমরা দিয়াছি, অন্যটি :-

হে ইন্দ্র ও অগ্নি, নব্বই অর্থাৎ অসংখ্য বাড়ী বা গ্রাম দাসশক্তি (পুলিশ force দ্বারা) পরিবেষ্টিত হইয়াছে। এই কর্ম্ম দ্বারা আপনারা মহিমান্বিত। এখানে শক্তি (পত্নী) বা force কথায় পুলিশ বা সৈন্য ভিন্ন অন্য অর্থই হয় না।

৪১। বল। যাহাদের বীরত্ব আছে, তাহাদিগকে বল বলা হয়। বঙ্গদেশে বল বংশ আছে। বেদের প্রমাণ :-

বাজিনাং রাজোঽবতু ভক্ষীয়ঽস্মানরেতঃ সিক্তমমৃতং বলায়॥

শুক্ল যজুর্ব্বেদ। কাণ্বশাখা। অতিরিক্ত কণ্ডিকা।

বলঞ্চমে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ যজুর্ব্বেদ রুদ্রী। অঃ ৮। মন্ত্র ২॥

ওঁ বলমসি বলং মে দাঃ স্বাহা॥

অথর্ব্ব বেদ। ২য় খণ্ড। ৩ অনুবাক। সূক্ত ৭। মন্ত্রাংশ ৩॥

তুমি বল স্বরূপ বল আমাতে হউক। তুমি তৃপ্ত হও॥

৪২। সিংহ। অথবা সিংহী। বঙ্গদেশে সিংহ বংশ আছে। শাক্য সিংহ বুদ্ধদেবেরই গৃহস্থাশ্রমের নাম। যশোবন্ত সিংহ, বলবন্ত সিংহ প্রভৃতিগণ বিখ্যাত রাজা। ভারতবর্ষে প্রায় সকল রাজবংশ এবং ক্ষত্রিয় বংশই সিংহ বংশ নামে খ্যাত। সিংহ অর্থে অসুরকে হিংসাকারী সম্প্রদায়। ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়রাই প্রকৃত অর্থে অসুরনাশক শক্তি সম্প্রদায়। চণ্ডীর মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী সবই সিংহবাহিনী। সিংহ সম্প্রদায়ই শক্তিকে বহন করিয়া বেড়ায়। সিংহ সম্বন্ধে বেদের প্রমাণ :-

সিংহ্যসি সপত্ন সাহী দেবেভ্যঃ কল্পশ্চ॥ ১

সিংহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ শুদ্ধশ্চ॥ ২

সিংহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ শুম্ভস্য॥ ৩

শুক্ল যজুর্ব্বেদ। পঞ্চম অধ্যায়। দশম কণ্ডিকা॥

(১) তুমি সিংহীর মত শক্তিসম্পন্ন, শত্রু বিমর্দ্দনে সমর্থ ও দেবকল্প।

(২) তুমি সিংহীর মত শক্তিসম্পন্ন, শত্রু বিমর্দ্দনে সমর্থ ও দেবতার মত শুদ্ধ।

(৩) তুমি সিংহীর মত শক্তিসম্পন্ন, শত্রু বিমর্দ্দনে সমর্থ ও দেবতার মত শোভাসম্পন্ন।

সিংহসি স্বাহা॥ ১
সিংহস্যদিত্য বনিঃ স্বাহা॥ ২
সিংহসি ব্রহ্ম বনিঃ ক্ষত্রবনিঃ স্বাহা॥ ৩
সিংহসি সুপ্রজাবনিঃ রায় স্পোষবনিঃ স্বাহা॥ ৪
সিংহস্যবহ দেবান্ যজমানায় স্বাহা॥ ৫
ভূতেভ্যস্ত্বা॥ ৬॥ শুক্ল যজুর্ব্বেদ। ৫ অধ্যায়। ১১ কণ্ডিকা॥

(১) তুমি সিংহীর মত শক্তিমান। তুমি তৃপ্ত হও॥ (২) সিংহীর মত শক্তিমান এবং আদিত্যের মত তেজস্বী। তুমি তৃপ্ত হও॥ (৩) তুমি সিংহীর মত শক্তিমান, ব্রাহ্মণের মত জ্ঞানী ও উদার এবং ক্ষত্রিয়ের মত যোদ্ধা। তুমি তৃপ্ত হও॥ (৪) তুমি সিংহীর মত অরিনাশক কার্য্যে শক্তিমান। তুমি উদার ও প্রজাসৃজন করিতে সমর্থ। তুমি ঐশ্বর্য্যবান। আহুতি দ্বারা তুমি তৃপ্ত হও॥ (৫) তুমি সিংহীর মত শক্তিমান, তুমি দেবতাগণকে যজমানের মঙ্গলের জন্য আকর্ষণকারী। আহুতি দ্বারা তুমি তৃপ্ত হও॥ (৬) তুমি সর্ব্বভূতের মঙ্গলের কারণ। (আহুতি দ্বারা) তুমি তৃপ্ত হও॥

৪৩। ব্রহ্মবনি, ক্ষত্রবনি, রায় স্পোষবনি, আদিত্যের মত তেজস্বী, দেবতার মত শুদ্ধ ও শোভামান ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা সিংহগণকে প্রশংসা করা হইয়াছে। সিংহ বর্ত্তমান ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সাধারণ পরিচয় জ্ঞাপক শব্দ। ব্রহ্মবনি, ক্ষত্রবনি প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বেদে প্রত্যেক দেবতাকেই স্তুতি করা হইয়াছে। অর্থাৎ জ্ঞান, যুদ্ধের বীরত্ব, ধনসম্পদবানত্ব ও সমাজ সেবা একই ক্ষেত্রে বিকশিত হওয়া সম্ভব। বৈদিক যুগের সমাজবাদের এক মহান আদর্শ ছিল। বৈদিক যুগের সভ্যতার সঙ্গে স্মার্ত্তবাদীয় সভ্যতার ইহাই সনাতন ভেদ যে বেদ ব্রহ্মজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ত্ব, ধনবানত্ব ও সমাজসেবা একই মানবে বিকশিত হওয়াই শ্রেষ্ঠ মানবের লক্ষণ বলিতেন। ফলতঃ এইরূপ মানবই বৈদিকযুগের দেবতা। স্মার্ত্তবাদীরা এই সবের এক-একটী গুণকে এক এক প্রকার বংশে আরোপ করিয়া বর্ণভেদের উপর জোর দিয়াছেন। মানব জাতির আসল সভ্যতা বেদবাদীয় সমাজে বেশী বিকশিত কি স্মার্ত্তবাদে বেশী বিকশিত ইহা সমাজই বিচার করিবে। বেদবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ বলিয়া বঙ্গদেশের সভ্যতার একটা বিশিষ্ট আকর্ষণ আছে এবং এজন্যই রঘুনন্দনবাদী শূদ্রবাদে বাংলার স্বরূপ ম্লান হয় নাই। বাংলায় দনুজদলনী মা দুর্গা সমস্ত বঙ্গবীর সমাজের হৃদয়ের দেবতা। কাজেই বঙ্গদেশ - অতি সহজে চৈতন্য দেব প্রবর্ত্তিত ভাববাদের 'আমি দাস' অতিক্রম করিয়া ''অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং'' (আমি দেবতা আমি অন্য নহি, আমি ব্রহ্ম) এ প্রতিষ্ঠা লইতে পারিবে। বঙ্গদেশ হয় ১০ দিন মাত্র অশৌচ প্রবর্ত্তন দ্বারা বেদবাদী হইবে। অথবা ৩০ দিন অশৌচ বহিষ্কার করিয়া ১০, ১২ অথবা ১৫ দিনের অশৌচ প্রবর্ত্তন করিয়া স্মার্ত্তবাদী

হইবে। বাংলা রঘুনন্দনের শূদ্রবাদে জড়াইয়া থাকিবে না এবং ৩০ দিনের অশৌচ বিধানও বাংলায় থাকিবে না।

৪৪। স্মৃতি চার বর্ণ প্রবর্ত্তন করিলেও বেদ উহা সমর্থন করিয়াছেন এবং বেদ বলিয়াছেন যে উহা একই পরম পুরুষের চারিটী অঙ্গ। ইহা যে একই সমাজ পুরুষের চারটী কর্ম্মভেদীয় ভাগ ইহাতে সন্দেহ নাই। বেদ বলেন, ব্রাহ্মণ = মুখ বা মস্তক, ক্ষত্রিয় = বাহু, বৈশ্য = উরু, শূদ্র = পদ (বেদের পুরুষ সূক্ত দ্রষ্টব্য)। সেবা পদেরই হয়। এজন্য জনসেবাই ব্রহ্মের পূজা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবার প্রয়োজন হয় না কারণ ইহারা জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও সম্পদে পরিপূর্ণ; সেবা শূদ্রের জন্যই প্রয়োজন।

৪৫। আমরা শূদ্র শব্দ ব্যবহার করিতে চাহি না। ইহার কারণ পৌরোহিত্যবাদীরা এই শব্দটিকে ঠিক গালাগালির মত ঘৃণ্য করিয়া দিয়াছে। আমরা ইঁহাদিগকে কর্ম্মী সম্প্রদায় বা বিশ্বকর্ম্মা সম্প্রদায় বলিব। পৌরোহিত্যবাদীরা সমাজকে বেদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার বৃথাই চেষ্টা করিয়াছে। আমরা সকলকে গায়ত্রী, ব্রহ্মস্তোত্র ও মহামন্ত্র উচ্চারণ সহ উপাসনা করিতে বলি এবং ব্রহ্মনাড়ী ধ্যান করিতে বলি। এদেশের মুসলমান খৃষ্টানগণকে বেদবাদে ফিরাইতে হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে আরও নূতন বেদবাদীয় সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে সমস্ত পৃথিবীতেই নূতন বেদবাদীয় সমাজ গড়িতে হইবে। হিন্দু সমাজের বিবাহ বিধান স্বসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া অনেকে ইহাকে ব্যাপক ও সীমাহীন করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে কোন চিন্তাশীল ও দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক স্বীকার করি না। সমাজের বিবাহ নিয়ম কিভাবে সীমাহীন হয় এবং কিভাবে সংকোচ হয় উহার বিজ্ঞান আছে। বিবাহ বিধান মানব সমাজে ব্যাপকত্ব ও সঙ্কোচনত্ব বিজ্ঞানে যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রবর্ত্তিত আছে। সঙ্কোচ বিধান ধরিয়া রাখাই উচ্চ সভ্যতার লক্ষণ। উহার পাশাপাশি ব্যাপক নিয়মও সম্মানের চক্ষেই দেখা হইবে।

৪৬। অনেকে বলিতে চাহেন বাংলায় বৈদিক সভ্যতা প্রাচীনকালে ব্যাপ্ত হয় নাই। বাংলা তো দূরের কথা ব্রহ্মদেশ যে বৈদিক সভ্যতামূলক দেশ ছিল আমরা উহাও প্রমাণ করিতে পারি। ব্রহ্মদেশ, ইরাবতী, অমৃতবন (মার্ত্তাবান), মানদালয় (মান্দালয়) এ সবই বৈদিক সংস্কৃতির কথা। ঋগ্বেদে সিন্ধুর মতন ইরাবতী নদীরও উল্লেখ বিদ্যমান। পুরাণোক্ত ভারতবর্ষ, ব্রহ্মবর্ষ ইলাবর্ষ, হরিবর্ষ, পারশিকবর্ষ সবই বৈদিক সভ্যতাপ্লাবিত দেশ। ইংরেজরা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন - পৌরোহিত্যবাদই তোমাদের সভ্যতা এবং পৌরোহিত্যবাদিত্বই তোমাদের ধর্ম্ম, আর আমাদের তথাকথিত বিদ্বানেরা উহাই মানিয়াছেন। আমরা বেদবাদ, ব্রহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধবাদ, শক্তিবাদ সবই ভুলিয়াছি। স্মার্ত্তবাদীয় হিন্দুবাদই হিন্দু সভ্যতা নহে; হিন্দু সভ্যতা অনেক বড়। অসুরবাদ বাদ দিয়া যত ধর্ম্ম ও সভ্যতা পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে সবই হিন্দু সভ্যতা। অসুরবাদও হিন্দু সভ্যতারই শাখা কিন্তু ইহা আমাদের সভ্যতায় সর্ব্বদা তিরস্কৃত।

সপ্তম অধ্যায়

শক্তিশালী সমাজে পৌরোহিত্যবাদ

১। পৌরোহিত্যবাদ যে আসুরিকতা ইহা আমরা অনেক স্থানে বলিয়াছি। ইহা বিদ্বেষবাদীয় ভিত্তিতে অত্যধিক শক্তিশালী অসুরবাদ। বর্ত্তমান সময় আমাদের সমাজে যে পৌরোহিত্যবাদ বিদ্যমান ইহার মূল কোথায় উহা জানা প্রয়োজন। মহর্ষি বেদব্যাস বেদের মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করেন এবং চার বেদরূপে সেইগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি এই সব বেদরাশির কি ভাবে পঠনপাঠন হইতে পারে এজন্য উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রত্যেক বেদেরই শাখা বিভাগ করেন এবং বিভিন্ন ঋষির আশ্রমে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। কোন্ শাখা কোন্ আশ্রমে পাঠ হইবে সব স্থির হইয়া যায়। এই ভাবে কয়েক শতাব্দী চলিবার পরই বেদ ব্রাহ্মণদের সাম্প্রদায়িক সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ইহার পঠন পাঠন কমিয়া যায়। শেষকালে গোপন করিয়া রাখাই বেদরক্ষা বলিয়া বিবেচিত হয়; যাহার ফলে বেদের বহু শাখা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং ব্রহ্মণ্যবাদীয় সমাজ অংশ পৌরোহিত্যবাদের কোঠায় নামিয়া আসে।

২। বেদ ভাগ ও শাখা বিভাগ হইবার পূর্ব্বেও পৌরোহিত্যবাদ ভারতবর্ষে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু উহা ঠিক ঠিক ভিত্তি লইবার সুযোগ লাভ করে বেদ বিভাগের পর। এখন ছাপাখানার প্রসাদে বেদ সুপ্রাপ্য হইয়াছে। কাজেই বিদ্বেষবাদী পুরোহিতদের সুযোগ সুবিধার মূল উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। রক্ষকরাই ভক্ষক, ইহা পৃথিবীরই নিয়ম। সেই যুগে বেদ রক্ষার জন্য ব্যাসদেব যাহা করিয়াছিলেন, উহা হইতে যুক্তিযুক্ত উপায় আর হইতে পারে না। এখন পৌরোহিত্যবাদী সম্প্রদায় যদি মনে করে যে শাখার সংযোগহীন মানব মাত্রই বেদের অনধিকারী তবে সেটা তাহাদের মূর্খতার লক্ষণ হইবে। বেদ যে কোন সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি একথা বেদ স্বীকার করেন নাই। জনজাগরণের যুগে বহুর অধিকার কেহ আর রুদ্ধ করিতেও পারিবে না। কাজেই পৌরোহিত্যবাদ শেষ হইয়াছে।

৩। বৌদ্ধবাদের পূর্ব্বে পৌরোহিত্যবাদ অত্যন্ত প্রবলরূপ ধারণ করে। সমাজের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করিয়া রাখিয়া উভয় অংশেই নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি অটুট রাখা, সমাজকে ধর্ম্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখা, নারীর প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত হীন করিয়া দেওয়া-রূপ দুষ্কৃতিতে পৌরোহিত্যবাদীরা বেশ নিপুণতা লাভ করে। বেদে মানুষের সীমাহীন ভক্তি ছিল। পুরোহিতেরা সেই ভক্তির সুযোগ সবটুকুই গ্রহণ করে। ঐ যুগে যজ্ঞে পশু বলি অপরিহার্য্য নিয়ম ছিল। আজকাল আমরা একটা কলা বা এক টুকড়া ফলে পূর্ণাহুতি দিয়া থাকি। তখন মোটা দক্ষিণা ও পশু বলি যজ্ঞের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ছিল। বৌদ্ধবাদীরা এই হিংসা বৃত্তিতে এমন বুদ্ধিমানের মত আঘাত দেয় যে এক

ঢিলে দুই পাখী মারিবার উপায় করে। ইহারা অহিংসার নামে পুরোহিতদের ব্যবসা নষ্ট করিয়া দিয়া বেদকে বংশগত সম্পত্তি করিবার দুষ্কার্য্যের সমুচিত শিক্ষা প্রদান করে। অহিংসাবাদের নামে পৌরোহিত্যবাদ ভাঙ্গিয়া যায় এবং ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠেয় হইবার পথ হয়। ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠেয় হইবার পথ হইলেও বেদকে বৌদ্ধবাদীরা সর্ব্বসাধারণের নিকট খুলিয়া দিতে পারে নাই। বেদকে পৌরোহিত্যবাদের হাতের বাহিরে আনিবার চেষ্টাও ইহারা করে নাই। বরং বৌদ্ধবাদীগণ পরবর্ত্তীকালে বেদ নিন্দা ও বেদ উচ্ছেদের দিকে মন দেয়, যাহার ফলে বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে এদেশে এক মর্ম্মস্পর্শী বিপ্লব আসিয়াছিল।

৪। বৌদ্ধবাদীরা নিজের মৃত্যুর এক শক্তিশালী অস্ত্র পুরোহিতদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। সেই অস্ত্রটী হইতেছে 'বেদ'। বৈদিক যুগের সমাজবাদের সহিত বৌদ্ধ সমাজবাদের কতকটা মিল আছে, আবার কতকটা মিল নাই। এই মিল ও অমিল কোথায় সে সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধবাদ অধ্যায়ে স্পষ্ট করিব। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধবাদ ভাঙ্গিবার এক আশ্চর্য্য অস্ত্র প্রস্তুত করেন। এই দার্শনিক বীর মহাপুরুষ যে কিরূপ বুদ্ধিমান ছিলেন ইহা ভাবিতে আশ্চর্য্য মনে হয়। তিনি বৌদ্ধ দার্শনিকতাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেবকেও গ্রহণ করেন। তিনি উপনিষদের জ্ঞানবাদের মধ্যে বৌদ্ধবাদের অদ্বৈতবাদ (শূন্যবাদ) যে নিহিত ইহা এমন ভাবে প্রমাণ করেন যে উহার সামনে বৌদ্ধবাদীরা আর দাঁড়াইতেই পারিলেন না। বেদের প্রমাণ এবং শাস্ত্রের প্রমাণকে ভিত্তি করিয়া তিনি এমন সংঘাত গড়িলেন যে বৌদ্ধবাদ ভাঙ্গিয়া গেল। যদি বৌদ্ধবাদীয় জ্ঞান ও ধর্ম্ম বেদ বা উপনিষদেই বিদ্যমান তবে বেদ নিন্দুকগণ, মিথ্যাচারী হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট নিজেদের যে প্রতিষ্ঠা হারাইবে, ইহা স্বাভাবিক। বেদের উপর মানুষের রক্তমাংস জড়িত এক শ্রদ্ধা ধারা বিদ্যমান। দলবাদের কূটনীতির জালে ইহা ভাঙা সম্ভব নহে। বৌদ্ধবাদী হিন্দুরা মানুষের এই স্বাভাবিক শ্রদ্ধায় আঘাত দিয়া ভুল করিয়াছে। পৌরোহিত্যবাদীরা বেদকে নিজেদের সম্পত্তি করিয়া রাখিলেও বেদ নিশ্চয়ই পৌরোহিত্যবাদীয় বিদ্বেষ ও দস্যুতা সমর্থন করে নাই। কাজেই বেদনিন্দা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছিল।

৫। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণকে বেদান্তের দীক্ষা দান করিয়া আচার্য্যশঙ্কর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণকে বেদবাদী করিয়া লন। সে সঙ্গে তিনি গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের নৈষ্কর্ম্মবাদ ব্যাখ্যা করিয়া উহার প্রচারের ভার সন্ন্যাসীগণকে দান করিয়া সমাজ জীবনে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে কর্ম্মহীন করিয়া দেন। বৌদ্ধবাদীয় সমাজবাদে সন্ন্যাসীরাই সমাজ পরিচালক ও সমাজের শিক্ষক। আচার্য্য দেব এই সম্প্রদায়কে নৈষ্কর্ম্মের মায়া জালে জড়িত করিয়া ইহাদিগকে একেবারে নিষ্কর্ম্মা করিয়া দেন এবং পুরোহিত সম্প্রদায় বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে সমস্ত সমাজের কর্ত্তৃত্ব আনিবার পথ করিয়া দেন - ''স আদি কর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভোমস্য ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণস্য রক্ষার্থং দেবক্যাং বসুদেবোদংশেন কৃষ্ণ কিল সম্বভূব।'' ''সেই আদি কর্ত্তা নারায়ণরূপা বিষ্ণু পার্থিব ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণের রক্ষার নিমিত্ত বসুদেব হইতে দেবকী গর্ভে স্বীয় অংশে শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হইলেন।'' শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত রক্ষার জন্য জন্ম লইয়াছেন এই রূপ কথা গীতা বা মহাভারত বলে না। সেই সময়কার সমাজ ব্রাহ্মণকে ধ্বংস করিবার কোন কার্য্যেও লিপ্ত ছিল না। সুতরাং আচার্য্য শঙ্কর

এখানে যাহা বলিতেছেন উহার লক্ষ্য হইতেছে :- "তিনি বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করিবেন এবং পৌরোহিত্যবাদ স্থাপন করিবেন।" তিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান রাজনৈতিকের মত এইরূপ উক্তি করিলেন। বুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণবিদ্বেষী সম্প্রদায় এমন শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ এবং রামকে কেন্দ্র করিয়া বেদ রক্ষার ভিত্তিতে পৌরোহিত্যবাদ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। আমরা বৌদ্ধবাদের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া বেদ নিন্দা করি না আবার পৌরোহিত্যবাদের ভিত্তিতে স্বর্গ ও ধর্ম্মের ঠিকাদার এবং সমাজ বিদ্বেষী পুরোহিত সম্প্রদায়ও চাই না। যে সমাজকে বিদ্বেষ করে এবং ঘৃণা করে, তাহাকে অর্থ দিয়া পালন করিবার প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়ার ইচ্ছা ছিল বলিয়াই এই দেশ মুসলমান ধর্ম্মে প্লাবিত হইতে সুবিধা পাইয়াছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ যেমন অহিংসার নামে যজ্ঞ ক্রিয়া ও দক্ষিণায় দান বন্ধ করিয়া দিয়া সমাজ হইতে বিদ্বেষী সম্প্রদায়কে নিষ্কর্ম্মা করিয়া দিয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্কর ঠিক উহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেন। শাস্ত্রের ভিত্তিতে বৌদ্ধবাদীয় দার্শনিকতা প্রমাণ করা এবং সন্ন্যাসীদিগকে নিষ্কর্ম্মার দলে কোণ ঠ্যাসা করিয়া দেওয়ার কর্ম্মে তিনি ভালভাবেই কৃতকার্য্য হন। বেদ নিন্দুক বৌদ্ধবাদীরা গিয়াছে, ইহাতে আমরা মোটেই দুঃখিত হই নাই। কারণ বৌদ্ধ দার্শনিকতা বেদান্তবাদে নিহিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র বা বেদরক্ষার নামে আমরা সমাজ বিদ্বেষী সম্প্রদায়ও সমাজে চাই না। আমরা পুরোহিত কর্ম্মের নিন্দা করিনা, কিন্তু পৌরোহিত্যবাদ চাই না। আমরা আচার্য্য দেবের গীতার টিপ্পনীর প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম মূলক উপদেশের সহিত মোটেই একমত নহি। এ সম্বন্ধে আমরা গীতার শক্তিবাদ টিপ্পনীতে আলোচনা করিব।

৬। আচার্য্য শঙ্করের পর পৌরোহিত্যবাদ ভারতের বুকে ভীষণ শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। বেদ পুরোহিতদের হাতেই ছিল। অন্যান্য শাস্ত্রপাঠও পুরোহিতরা নিজেদের বংশগত অধিকার এবং অব্রাহ্মণের অনধিকার বলিয়া ঘোষণা করে। সমস্ত ভারতে যেখানে যত বৌদ্ধ সমাজবাদী ছিল সকলকে এই পুরোহিত সম্প্রদায় শূদ্রের কোঠায় বদ্ধ করে। বৌদ্ধ সমাজবাদীদের উপর এই দুষ্ট পৌরোহিত্যবাদীরা শাস্ত্র রূপ অস্ত্র দ্বারা দস্যুর মত নিষ্ঠুর অবিচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বৌদ্ধ সমাজে বৈদিক ব্রহ্মচর্য্য বা উপনয়ন সংস্কারের প্রথা নাই যদিও বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মচর্য্য বিধান বৌদ্ধবাদে গৃহীত হইয়াছে। পুরোহিত সম্প্রদায় উপনয়ন ত্যাগকারী সমস্ত হিন্দুগণকে শূদ্র কোঠায় আনিয়া স্থাপনা করেন। ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী বৌদ্ধরাই বর্ত্তমান সময় কায়স্থ কোঠায় আসিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধবাদী বৈশ্যরাই বণিক্য বা বেনিয়া। বঙ্গদেশীয় নবশাখিগণ সকলেই বৈশ্য শ্রেণীর লোক। কৈরী, কুনবী, অহীর, গড়েড়ীয়া প্রভৃতি কৃষি ও পশুজীবি বৈশ্যগণকে শূদ্রের কোঠায় আনা হয়। বৌদ্ধদের কোন বৃত্তিধারীকে কিরূপ শূদ্র করা হইবে এ সম্বন্ধে রীতিমত চিন্তা ও গবেষণা করা হইয়াছিল। কাশী, নবদ্বীপ ও পুনায় এসব গবেষণার কেন্দ্র ছিল। বাংলার রঘুনন্দন এই সব গবেষণাগারের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি নাকি মনুস্মৃতি খানা একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া বাংলায় আনেন এবং বঙ্গীয় জীবদের অসীম কৃতার্থ করেন। চৈতন্যবাদ সম্প্রদায় এই কথাটী প্রচারের কার্য্য করেন। এবং পুরাণের পাতায় কোথাও এসব সম্প্রদায়কে দ্বিজ বলা হইয়াছে এবং কোথাও শূদ্র। উচ্চ শ্রেণীর বৌদ্ধগণ ভদ্রলোক কিন্তু শাস্ত্র জালীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে ও ব্যবহারে সকলেই শূদ্র বা শূদ্র বংশ মাত্র! বৌদ্ধবাদীয় হিন্দুগণের উপর পৌরোহিত্যবাদীরা সাংঘাতিক অত্যাচার করিয়াছে।

বঙ্গ দেশে আবার সৎশূদ্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। বৌদ্ধবাদীয়গণের উপর পুরোহিত সম্প্রদায়ের অত্যাচার পূর্ব্বযুগের প্রতিশোধ স্পৃহার অভিব্যক্তি। আমরা প্রত্যেকটী খণ্ড সমাজকে এসব ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া শক্তিবাদী সমাজ গড়িতে বলি এবং গায়ত্রী উপাসনা করিতে বলি। পৃথিবীতে আবার বেদবাদীয় ও শক্তিবাদীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পৌরোহিত্যবাদিতা যে একশ্রেণীর হিন্দুদের একটা বেশ কূটবুদ্ধির প্রতিভা ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহা দ্বারা সমাজকে দুর্ব্বল করা হইয়াছে। যে সময় হইতে পৌরোহিত্যবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই সময় হইতেই হিন্দু সমাজের প্রসারতা কমিয়া গিয়াছে। আমরা পৌরোহিত্যবাদী সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুসরণ করিতে বলি। সমাজকে বলি আর রেষারেষী দ্বেষাদ্বেষী করিওনা। মুসলমান ও খৃষ্টানগণকে তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এখন এজন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বধর্ম্মেফেরা* সংস্কৃতগণকে যাহাতে সম্মানজনক স্থান দেওয়া যায় সে জন্য শক্তিবাদীরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করিবে। আচার্য্য শঙ্করের মত মহান বেদান্তবাদীর কর্ম্ম ধারাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে ব্রহ্মণ্যবাদীয় সমাজ না হইয়া পৌরোহিত্যবাদীয় সমাজ গড়িয়া উঠিল, ইহা সত্যই লজ্জার কথা।

৭। পৌরোহিত্যবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিতগণ বেদে কাহার অধিকার আছে বা নাই এইরূপ কথা উঠাইতে চাহেন। আমরা ভালভাবে বেদ আলোচনা দ্বারা ইহা নিশ্চয়ই করিয়া বলিতে পারি যে বেদ ব্রহ্মণ্যবাদ ও শক্তিবাদমূলক মহাগ্রন্থ। ইহাতে পৌরোহিত্যবাদ ও বিদ্বেষবাদ নাই। আমাদের দেশের পুরোহিত সম্প্রদায়ের হীন স্বার্থের ঠিকেদারী, বেদ যে গ্রহণ করেন নাই, এ সম্বন্ধে বেদ পাঠ করিয়া আপনারা বুঝিতে চেষ্টা করুন। বেদের সর্ব্ব বর্ণ ও সমস্ত মানবের অধিকারের আদেশ :-

ওঁ যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম রাজণ্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় স্বীয় চারণায়।
প্রিয়া দেবানাং দক্ষিণায়ৈদাতুরিহ ভূয়াসময়ং
মোকামঃ সমৃধ্য তামুপমাদো নমতু॥ যজুঃ অঃ ২৬। মন্ত্র ২॥

এই বেদবাণী সকল, যাহা অত্যন্ত কল্যাণময়ী, সমস্ত মনুষ্যের জন্য বলিয়াছি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্য, এবং অতি শূদ্রের জন্য, বৈশ্যের জন্য, স্ত্রী ও চাকরাদির জন্য। আমার এই কামনা বৃদ্ধি হউক যে মূর্খগণকে উপদেশ দেওয়া হউক। যে ইহা (এই জ্ঞান) দান করিবে আমি তাহার প্রিয় হইব। এবং তাহাদের উভয়ের (দাতা ও গৃহীতার) আত্ম-কল্যাণ প্রাপ্তি হইবে। (প্রিয়া দেবানাং - মূর্খ)। (পাণিনির সূত্র দেখ)।

৮। পৌরোহিত্য বাদীরা বেদের নামে মিথ্যা কথার প্রচার করিয়াছেন। বেদের মতে কর্ম্মের ভাগ আছে, তাহা কেবলই সমাজ জীবনকে সুন্দর করিবার জন্য। কিন্তু বেদের মতে কোনও উপাসনার ভেদ নাই। বেদ সাম্যবাদের অতি সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ। যাহারা এই সাম্য ধর্ম্মে ভেদ আনিয়াছে তাহারা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের ক্ষতিই করিয়াছেন।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এই শব্দটি স্বচ্ছতার খাতিরে আমাদের সংযোজন।

যত্র ব্রহ্মচ ক্ষত্রচ সমঞ্চৌ চরত সহ।
তং লোকং পুণ্যং প্রাজ্ঞেষং যত্র দেবা সহগ্নিণা॥
যজুঃ। বিংশ অঃ। ২৫ মন্ত্র॥

যেখানে ব্রহ্মজ্ঞানী ও যোদ্ধা অন্যান্য সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেন এবং যে দেশে দেবতাগণ (দৈবী ভাব সম্পন্ন কর্ম্মীগণ) তেজযুক্ত থাকেন, সেই দেশই পুণ্য দেশ ও জ্ঞানের ধারায় ধন্য।

টিপ্পনী। এখানে দেবতাগণকে তেজযুক্ত থাকিতে বলা হইয়াছে। আমরা আজ (১৯৫০ সনে) অহিংসাবাদী (?) কর্ম্মী সম্প্রদায়কে এখনও ৩০ বৎসরের কুঅভ্যাস, তোষণ ও নিস্তেজ মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বেদবাদ গ্রহণ করিতে বলি।

যত্রেন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ।
তং লোকং পুণ্যং প্রজ্ঞেষং যত্র ভেদির্ণ বিদ্যতে।
যজুঃ। অঃ ২০ মন্ত্র ২৬॥

যেখানে ইন্দ্র এবং বায়ু সকলের সঙ্গে সমান প্রীতির সহিত ব্যবহার করেন। সেই দেশই জ্ঞানের ধারায় ধন্য, সেখানে ভেদ ভাব নাই।

টিপ্পনী। ইন্দ্র অর্থে রাজা বা নেতা, বায়ু অর্থে রাজার সহকর্ম্মী বুঝিতে হইবে। আমরা ১৯৫০ সনের ভারতের নেতা ও কর্ম্মীগণের স্বার্থ, মূর্খতা ও দল পাকানো দুর্নীতির কুফল এবং সমাজের দরিদ্রের কথা স্মরণ করিয়া রাখিতে বলি।

বেদে সর্ব্ব বর্ণের প্রেমের আদেশ :-

ওঁ রুচং নো দেহি ব্রাহ্মণেষু রুচং রাজ্ঞেস্থ নঃ কৃষি।
রুচং বিশেষ্য, শুদ্রষু ময়ি, দেহি রুচা রুচম্॥
যজুঃ॥ অঃ ১৮ মন্ত্র ৪৮॥

আমাদের অত্যন্ত রুচি (প্রীতি, ভালবাসা) ব্রাহ্মণদের প্রতি স্থাপনা কর। আমাদের অত্যন্ত ভালবাসা ক্ষত্রিয়গণের প্রতি স্থাপনা কর। আমাদের শ্রেষ্ঠ ভালবাসা বৈশ্য ও শূদ্রের প্রতি দাও।

টিপ্পনী। প্রত্যেক মানবই অন্যকে ভালবাসিবে। অসুরবাদীদের জন্য প্রীতির কথা বেদে কোথাও নাই। ইহা শক্তিবাদীরা মনে রাখিবে।

৯। নারীর বেদে অধিকার আছে কিনা, বর্ত্তমান যুগে এ প্রশ্ন বোধ হয় আর উঠিবেনা। কারণ সকলেই জানে যে বেদের বহু মন্ত্রের ঋষি নারী। বেদ নারীদের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পরই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের আদেশ দিয়াছেন। পুরোহিত মাত্রই চণ্ডী পাঠে দেবী সূক্তের কথা জানেন। এই আট মন্ত্রের সবগুলির ঋষিই একজন নারী। যজুর্ব্বেদে নারীকে অনেক স্থানে ব্রহ্মবিদুষী সরস্বতী বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সংসার জীবনে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যেন কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্॥
অথর্ব্ব। কাণ্ড ১১। প্র ২৪। অঃ ৩। মং ১৮॥

কন্যাগণ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিবে এবং যুবাপতি বিবাহ করিবে।

টিপ্পনী। উচ্চ বর্ণের হিন্দু নারীরা বিধবা কালে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করেন। কাজেই বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা কন্যাগণের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। শিক্ষক ও

পিতা মাতা বিশেষ যত্ন সহকারে কন্যাগণকে বাল্য কালেই ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ উপাসনা শিক্ষা দিতে ত্রুটী করিবেন না। ব্রহ্মচর্য্য পুরুষ অপেক্ষা নারী জীবনে বেশী প্রয়োজনীয় কথা। কন্যাগণ ব্রহ্মচর্য্য ও চিত্ত শুদ্ধির জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইবে নয় তো যৌবনে রজঃবিকৃতি রোগগ্রস্ত হইয়া জীবন নিরানন্দময় হইবে।

নারীদের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনার প্রমাণ রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে সীতার সন্ধ্যোপাসনার কথা হনুমান বলিতেছেন :-

সন্ধ্যা কালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকি।
নদীং চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনি॥

বাল্মিকী রামায়ণ সুন্দর কাণ্ড॥

১০। বৈদিক যুগে বর্ণ ভেদ ছিল না। জাতিভেদ হইতেই বর্ণ ভেদ আসিয়াছে। বেদের ঋষিগণের মধ্যে নারীদের নাম পাওয়া যায়। ঠিক সেইরূপ অন্যান্য জাতিদেরও নাম পাওয়া যায়। নহুস, যযাতি, বিশ্বামিত্র এঁরা সকলেই ক্ষত্রিয় সন্তান। বেদের কর্ণ ঋষিই অনেকের মতে শ্রীকৃষ্ণ। ঐলুষক, ঔসিজ, কক্ষিবন্ত ও বৎস্য প্রভৃতি ঋষিগণ সকলেই দাসী পুত্র। উন্নত স্তরের ব্রহ্মবিদ্যার বক্তাগণ প্রায় সকলেই ক্ষত্রিয় সন্তান। গায়ত্রীর ঋষিও বিশ্বামিত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে রাজা জনশ্রুতির কথা আছে। ইনি শূদ্র ছিলেন। ঐ উপনিষদে সত্যকাম জাবালার কথা আছে। ইনি গোত্রহীন ছিলেন। আমরা আশা করি পৌরোহিত্যবাদী ব্রাহ্মণসন্তানগণ ও পৌরোহিত্যবাদ সমর্থক অন্যান্য বর্ণীয়গণ বেদাধিকার লইয়া আর ঘোট বা ঘটা পাকাইবেন না। বিনা দোষে বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচারে অকারণ বেদকে টানিবেন না। বৈদিক ভাষা আমাদের দেশের অতি প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রীয় ভাষা। এই ভাষায় সেই যুগে নরনারী উচ্চ নীচ সকলেই কথা বলিতেন। এখন কেহই বৈদিক ব্যাকরণসিদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে না, এই দোষে সকলের দোষকে সমাজের এক অংশে চাপাইয়া অনধিকারবাদ চালাইয়া আর লাভ নাই।

পুরোহিত সম্প্রদায়কে আমরা বলি, মন্ত্র উচ্চারণ কালে 'নমঃ নমঃ' বলাইয়া কর্ম্মকাণ্ড করাইবার জন্য আপনাদিগকে কেহ ডাকে না। যদি 'নমঃ নমঃ' বলিলেই সব ক্রিয়াকাণ্ড চলে তবে আর বেদ ও পুরোহিতের প্রয়োজন কি? 'নমঃ নমঃ' মন্ত্র মানুষ মাত্রেই জানে। কাজেই এরূপ করা কেবল বেদ বিরুদ্ধ নহে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বিবাহ বিধানে লাজহোম অংশে দেখুন :- সমীপলাশ মিশ্র লাজৈঃ বধুকর্ত্তৃকো মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হোম যথা...। যজু বিবাহ বিধি দেখুন। নারীগণের হোমে ও বেদ মন্ত্রে অধিকার নাই, একথা বলা অন্যায়। আর যাহার কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার নাই তাহার হইয়া ক্রিয়াকার্য্য করাইবার অধিকার পুরোহিতেরও নাই। গাড়ীর কোচওয়ান যদি মনে করে, গাড়ীর মালিকের গাড়ী চালনার অধিকার নাই, তবে সেটা একটা চাকরের পক্ষে বিস্ময়কর স্পর্দ্ধা বলিতে হইবে। মীমাংসা শাস্ত্রে মৎস্যজীবিদের নৌকা উৎসবকালে বেদমন্ত্র উচ্চারণ সহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। আমরা এখন প্রমাণ দিলাম না। অন্য সংস্করণে প্রয়োজন হইলে বহু প্রমাণ দিব। অনেকে বর্ণভেদের নিন্দা করেন। আমরা বর্ণভেদ প্রশংসা করি। কিন্তু উপাসনা ভেদ স্বীকার করিনা। এবং অশৌচও দশ দিনের বেশী হইবার কোন কারণ দেখি না। কাশী প্রভৃতি স্থানে সব বর্ণের লোকই দশ দিন অশৌচ মানে। কাজেই

ইহা বঙ্গদেশেও প্রচলন হওয়া প্রয়োজন। মুসলমান ও খৃষ্টানগণও দশ দিন অশৌচ, গায়ত্রী উপাসনা ও আচার্য্যের বা গুরুর গোত্র গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং মসজিদের সংস্কার করিয়া উহা ভারতীয় মন্দিরের ছাঁচে সংশোধন করিয়া লইবে। যে কোন গ্রামের মুসলমান বা খৃষ্টানগণকে এই ভাবে শুদ্ধ করা হইবে। এই ভাবেই চারিদিকে বিপ্লব আনিয়া সমাজ হইতে পৌরোহিত্যবাদ বা উচ্চ নীচভাব ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। যাঁহারা পৌরোহিত্য ব্যবসা করিবেন তাঁহারা সকলেই দশকর্ম্ম সম্পাদন করাইবেন। এজন্য প্রয়োজন হইলে নবীন পুরোহিত কর্ম্মকারী সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রত্যেক শাখা সমাজ হইতে পুরোহিত বৃত্তির লোক প্রস্তুত হইতে পারিবে। শক্তিবাদ কাহারও বৃত্তি নষ্ট করিবার আন্দোলন করিবে না। কিন্তু কোন বৃত্তিধারী লোক যদি বিদ্বেষবাদে জড়াইয়া যায় তবে সে শক্তিবাদীদের নিকট হইতে নিজের বৃত্তি হারাইবে।

১১। আমরা বর্ণভেদ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত উন্নত ও উচ্চ সভ্যতা মূলক সমাজবাদ বলিয়া স্বীকার করি। যাঁহারা সমাজের স্থায়ী শান্তি, সুখ ও উন্নতি কামনা করেন তাঁহারা ইহা ভালভাবেই জানিয়া রাখিবেন যে বৃত্তি যদি মানুষের বংশপরম্পরাগত ভাবে স্থির না থাকে তবে সেই সমাজ কখনও স্থায়ি ভাবে উন্নতির পথে চলিতে পারে না। বংশগত ও স্থায়ি বৃত্তিহীন সমাজ ও রাষ্ট্রে কখনও সুখ হইতে পারে না। আমাদের হতভাগ্য অহিংসাবাদী নেতারা হাতে রাজ্য শাসনের শক্তি লাভ করিয়া বহু লোকের বৃত্তি নাশ করিয়া সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি আনিতেছেন। আমরা ঐ অদূরদর্শী মূর্খ নেতাগণকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করি। আমরা পৌরোহিত্য বাদ চাই না, কারণ উহা বিদ্বেষ বাদ এবং সমাজে একই উপাসনার ভিত্তি নাশ কারী আস্থরিকতা; কিন্তু আমরা পুরোহিত ব্যবসায় বংশগত ভাবেই বেশী সমর্থন করি। যাঁহারা নূতন পুরোহিত বংশ প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তাঁহারা যেন বংশ গত ভাবেই উহা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। আমরা বংশগত ভাবে বৃত্তি গ্রহণ সমাজ জীবনের সুখের কারণ মনে করি।

অষ্টম অধ্যায়

শক্তিশালী সমাজে ভাববাদ

১। ভাববাদ আমাদের দেশে আধুনিক মতবাদ নহে। ইহার প্রাচীনত্ব আছে। কিন্তু এই মতবাদ পূর্ব্বে ব্যক্তিগত জীবনেই নিবদ্ধ ছিল। বৌদ্ধবাদ খণ্ডনের পর পৌরোহিত্যবাদীরা বেদবাদ ও শক্তিবাদমূলক উপাসনা সমাজে প্রবর্ত্তন করিলেন না। তাঁহারা বেদবাদ ও শক্তিবাদমূলক ধর্ম্মকে গোপন করিয়া নিজেদের ব্যবসা, প্রতাপ ও কর্ত্তৃত্ব রক্ষায় মন দিলেন এবং সমাজে ভাববাদমূলক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা যদি সমাজে গায়ত্রী উপাসনা প্রবর্ত্তন করিতেন তবে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি ছিল না। তাঁহারা মিথ্যা কথা প্রচার আরম্ভ করিলেন এবং সমাজকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে কলিকালে বেদমার্গ মানবের উপযুক্ত নহে। যদি ইহাই তাঁহাদের মনের কথা ছিল তবে উপনয়ন সংস্কার নিজেদের সন্তানের জন্য করাইবার প্রয়োজন কি? যাহাই হউক বেদমার্গ আজ ব্যাপক ভাবেই অপমানিত। উপনীত বালক বা যুবক এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ কেহই আর সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে চায় না। যজ্ঞোপবীতও ধারণ করিতে চায় না। কাজেই যাঁহারা ভাববাদ সমাজে আনিয়াছেন তাঁহারা কোন দূরদর্শিতার কাজ করেন নাই। নারীদের বেদাধিকার নাই বলিয়া ঘোষিত হইল। উহার ফলে নারীরা ভাববাদের দীক্ষা লইতে বাধ্য হইল। কেহ কেহ স্বামীর পাদোদক ব্রত ও ব্রত অনুষ্ঠানে মন দিতে থাকিল। ইহার ফলে বালকগণও মার নিকট হইতে ধর্ম্ম ও সন্ধ্যানুষ্ঠানের সংস্কার পাইল না। তাহারা আজ চরম উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। শিক্ষিতা কন্যাগণের ধারণা হইল হিন্দু ধর্ম্মে একাদশী করা ভিন্ন কোন ধর্ম্ম নাই। তাহারা অনেক স্থানেই উচ্ছৃঙ্খল ও বিদেশী বিজাতি যবনাচার প্রিয় হইল। ভাববাদকে সমাজজীবনে যাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা সমাজের কোন মঙ্গল করেন নাই। বৈদিক ধর্ম্ম ও গায়ত্রী উপাসনায় সমাজকে বঞ্চিত করার ফল অত্যন্ত বিষময় হইয়াছে।

২। বৌদ্ধবাদ খণ্ডনের পর সমাজকে বৈদিক ধর্ম্ম না দিবার কারণে যে সমস্যা দেখা দিল উহা মিটাইবার জন্য ভাববাদের যুগ আসিল। সমাজকে একটা ধর্ম্ম তো দিতেই হইবে। বৌদ্ধবাদীগণকে বেদহীন করিবার জন্য কিরূপ প্রয়াস সমস্ত ভারতে হইয়াছিল, ইহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে। আজ পর্য্যন্ত বহু বর্ণ ভারতে আছে যাহাদিগকে শূদ্র বলা যায় না, আবার দ্বিজও বলা যায় না। এই সব সম্প্রদায়গুলির অনেকেই উচ্চপ্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবাদী ছিলেন।

৩। মানুষকে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধা দেওয়া হয় সেই ধর্ম্ম এই পৃথিবীতে ক'দিন থাকিবে? মানুষের আসল ধর্ম্মকে ত্যাগ করাইয়া সমাজকে 'ফাঁকী ধর্ম্ম' শিক্ষা দিলে মানুষ দাঁড়ায় কাহার বলে? বেদমার্গ গোপনীয় তন্ত্রমার্গ নিন্দিত হইলেও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড

বেশ দুই পয়সা আয়ের ব্যবসা বলিয়া পুরোহিতদের জন্য রহিল। তন্ত্রমার্গ নিন্দিত হইলেও তান্ত্রিক তীর্থস্থানগুলি ও পূজাপাঠগুলি পুরোহিতদের বেশ ভাল ব্যবসায়ের মাধ্যম হইল এবং জনসাধারণে দেওয়ার চেষ্টা হইল ভাববাদমূলক ধর্ম্ম।

৪। আমি হীন, আমি দাস, আমি নীচ এই দার্শনিকতা প্রচারের জন্য ভারতে গণ্ডায় গণ্ডায় অবতার (?) ও মহাপুরুষ দেখা দিলেন। ইঁহাদের বাণী হইল ''তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। অমানিনাং মানদেন কীর্ত্তনীয়ং সদাহরিঃ।'' তৃণ হইতেও হীন হইবে, তরু হইতেও সহিষ্ণু হইবে, যে মানের যোগ্য নয় তাহাকে সম্মান করিবে এবং হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

৫। বঙ্গদেশে পণ্ডিত রঘুনন্দন মহাশয় এক চমৎকার শূদ্রবাদের ভিত্তি দিলেন। তাঁহার মতে বিচার করিলে বঙ্গদেশ কেবল শূদ্রেরই দেশ নহে ইহা পতিত ব্রাহ্মণেরও দেশ। যাহার কন্যাদের কুমারী অবস্থায় মাসিক হয় আমাদের পণ্ডিতটির মতে তাহারা পতিত! যাহারা শূদ্রের যাজন করে তাহারা পতিত। যাহারা মিউনিসিপ্যাসিটীর কাজ করে তাহারা সব পতিত। কেবল নবদ্বীপে রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতির পাতা উল্টাইয়াছেন এবং বেশ মোটা শিখা রাখিয়া ''কে পতিত হইল'' এই ব্যবস্থা দিতে পারেন এমন ব্রাহ্মণ ভিন্ন বঙ্গদেশে এখন আর ব্রাহ্মণও নাই। যাহা হউক বঙ্গদেশে যাঁহারা ভাববাদের ভিত্তি দিলেন (চৈতন্য চরিতামৃত দ্রঃ) তাঁহারা রঘুনন্দনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন এবং শিক্ষা দিতে লাগিলেন ''জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস''। যাঁহারা চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় মন্ত্রে গাহিয়াছেন ''অহং দেবো ন চান্যঃস্মি ব্রহ্মৈবাহং'' তাঁহাদের নিকট ''কৃষ্ণদাস'' দার্শনিকতা ভাল লাগিল না। তাহারা প্রচারও করিতে পারিল না কারণ তাহারা কেহ শূদ্র এবং কেহ পতিত, এবং কেহ পাণ্ডিত্যের টীকী নাচ নিতে দীক্ষিত।

৬। জীবের স্বরূপ যদি ''নিত্য কৃষ্ণ দাস'' তবে শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব গুলি কি মায়া নাকি? ''ন তু রমণ ন হম রমণী'' কথার অর্থ কি নিত্য কৃষ্ণদাস, না কি? যদি জীবের স্বরূপ কৃষ্ণদাস তবে চৈতন্য দেব অব্রাহ্মণের অন্ন কেন আহার করেন নাই? যদি জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণ দাস তবে বহু 'কৃষ্ণদাস' বাদীদের উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজন কি? চৈতন্য, নিত্যানন্দ, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তো সকলেই তান্ত্রিক যোগী ও শক্তি উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের সমাজকে শক্তি উপাসনা না দিয়া 'কৃষ্ণদাস' শিক্ষা দিবার কি কারণ ছিল? আমরা বলি, রঘুনন্দন বঙ্গদেশে যে শূদ্রবাদ প্রবর্ত্তন করেন, চৈতন্যবাদী সম্প্রদায় উহাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন মাত্র। ইহাদের মনে ছিল, সমাজে একটা দাসবাদ মূলক ধর্ম্ম দান করিয়া পৌরোহিত্য বাদকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া দেওয়া। ইহার আরম্ভ এই ভাবেই হইয়াছিল এখন ইহার পরিণতি যাহাই হউক।

৭। আমরা কৃষ্ণদাস-দার্শনিকতাকে একটু নাড়াচাড়া করিয়া দিতে চাই। জীবের স্বরূপকে কৃষ্ণদাস বলা যায় কি? এই কৃষ্ণ অর্থে দেবকী নন্দন কৃষ্ণ নয় কি? যদি তাহাই হয় তবে কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে যে সব লোক জন্মিয়াছে তাহারা কাহার দাস? যদি বল, কৃষ্ণ বলিতে ঈশ্বরকে বুঝায়, তাহা হইলেও জীবকে ''নিত্য কৃষ্ণদাস'' বলিতে পার না। জীব যদি নিত্য তবে জীবই বা কেন ঈশ্বরের উপাসনা করিবে? জীবও নিত্য ঈশ্বরও নিত্য। দুইটা নিত্য বস্তুর দুইটাই সমান। একজন অন্যের কেন দাসত্ব বরণ করিবে?

জীবকে নিত্য বলিলে জীবকে অনাদি মানিতে হয়। জীব ও ঈশ্বর দুই-ই কি অনাদি? দুইটা অনাদি পদার্থের দাসত্ব সম্বন্ধ কোথা হইতে আসিল? উভয়ে কি যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং একজন অন্যের নিকট হারিয়া গিয়া দাসত্ব বরণ করিয়াছে? যদি বল জীবকে প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে পুরুষ মানিয়া লওয়া হইয়াছে, আমরা বলি, জীব পুরুষ ও প্রকৃতির সমষ্টি। ঈশ্বরও পুরুষ ও প্রকৃতির সমষ্টিকে বুঝায়। জীবে ও ঈশ্বরে ইহাই ভেদ যে জীবে 'অহং' থাকে ঈশ্বরে অহং থাকে না। জ্ঞানের আলোতে এই অহং ভ্রান্তি কাটিয়া গেলে জীবের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। এই অহং প্রভাব যুক্ত আত্মাকে অনাদি বলাও যায় না। কারণ ইহার উৎপত্তি আছে। প্রকৃতিকে কিছুতেই জীব বলা যায় না। কারণ প্রকৃতিতে ভোক্তৃত্ব নাই। জীবে ভোক্তৃত্ব আছে। আমরা ভালবাসার সাধনা স্বীকার করি। কিন্তু উহা স্বীকার করিলেও জীবকে নিত্য কৃষ্ণদাসের যুক্তিহীন দার্শনিকতায় জড়াইবার প্রয়োজন দেখি না। প্রেম, ত্যাগ, জ্ঞান, শান্তি সবই জীবে ঈশ্বরীয় শক্তি। ইহার যে কোন শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবার পথ আছে। পাঠক ক্রমবিকাশের ৭ম ও ৮ম অধ্যায় দেখুন। কৃষ্ণদাস দার্শনিকতার আড়ালে আমাদের সমাজ জীবনকে নানা ভাবেই শক্তিহীন করা হইয়াছে, এজন্য এই দর্শনবাদের সামান্য আলোচনা আমরা করিলাম।

৮। বঙ্গীয় ভাববাদী সম্প্রদায়ে যে সব মন্ত্রের দীক্ষা হয় সেইগুলি সবই তান্ত্রিক মন্ত্র। কাম বীজ মহাকালীরই বীজমন্ত্র। ইহাকে কৃষ্ণবীজ করা হইয়াছে, ইহা কে না জানে? হরিনাম মন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা কেবল মাত্র রাধা তন্ত্রেই আছে। এই মন্ত্রের দেবতা শ্রীত্রিপুরাসুন্দরী। ইনি সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরিনাম মন্ত্রের দীক্ষা ও উহার রহস্য বলেন। ইহাতেও দেখা যায়, ইহা যুগ যুগান্তর শক্তি মন্ত্ররূপেই বিদ্যমান ছিল। ইহাকেও বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া ভাববাদে টানিয়া নেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সাধকগণের ভীরুতা ও স্বার্থপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

৯। হকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শিব সাক্ষান্ন সংশয়ঃ।
রেফস্তু ত্রিপুরা দেবী দশমূর্ত্তি ময়ী সদা॥
একারঞ্চ ভগং বিদ্যাং সাক্ষাৎ যোনিং তপোধন।
হকার শূন্য রূপীচ রেফো বিগ্রহ কারকঃ।
হরেস্তু ত্রিপুরা সাক্ষান্মম মূর্ত্তি ন সংশয়ঃ।
ঋকারঞ্চ সুতশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা শক্তি রিতী রিতা॥
ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধাতন্ত্র॥

১০। হে শ্রেষ্ঠ সন্তান! 'হ' সাক্ষাৎ শিব ইহাতে সংশয় নাই। 'র' ত্রিপুরা দেবী। ইহাতে দশটী মহাবিদ্যার রূপ আছে। 'এ'কার ঐশ্বর্য্য রূপী এবং ইহা সমস্ত সৃষ্টির মাতৃ স্বরূপ। 'হ'কার শূন্যরূপ ঈশ্বর। 'র'কার সৃষ্টিরূপ মূর্ত্তি কারক। 'হরে' সাক্ষাৎ ত্রিপুরা শক্তি। ইহা সাক্ষাৎ আমারই রূপ। হে শ্রেষ্ঠ সন্তান। 'ঋ'কার শ্রেষ্ঠ শক্তি রূপে আরাধ্যা।

১১। আমরা সকলকে শাস্ত্র অনুসরণ করিতে বলি। এবং ভাববাদীদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত কৃত্রিম ধর্ম্মকে এবং কৃত্রিম ব্যাখ্যার মোহ অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তি সাধনায় মন দিতে বলি। ব্রহ্মনাড়ী, কুণ্ডলিনী, মন্ত্র চৈতন্য ও শক্তিবাদিতাই এই সব মন্ত্রের ভিত্তি, ভাববাদিতা নহে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যরূপ ও মাধুর্য্যরূপের অনেক অবান্তর ও অদার্শনিক

কথা ভাববাদে স্থান পাইয়াছে। আমরা বলি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে পাইবে, তাঁহার রূপের সবটুকুই ঐশ্বর্য্যময় এবং সবটুকুই মাধুর্য্যে পূর্ণ। মূর্ত্তিবাদের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দার্শনিক স্তরে আসিলে এসব ছোট কথা উঠেই না। যাঁহার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম আমাদের পূজ্য হইতেছেন, সকলেই সেই মহাশক্তির উদ্বোধনে আত্মনিয়োগ কর।

১২। ভাববাদের আরও অধ্যায় আছে। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় বাদীরা এই অধ্যায়ের ঠিকাদার। ইঁহারা কোন নামী সাধককে সর্ব্বধর্ম্মের সাধক প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। একদিকে ব্যাপক ঈশ্বরবাদ, অন্য দিকে আকাশের কোণে ঘরবাড়ী করিয়া অবস্থিত ব্যক্তিগত ঈশ্বরবাদ, এক হয় কি করিয়া? একদিকে জন্মান্তর বাদ, অন্যদিকে আল্লাহ বা গডের ফুৎকারে জীবের উৎপত্তির কথা, একমতে প্রাকৃতিক নিয়মে জীবের নিজ কর্ম্মফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ, অন্য মতে গডের ভক্তি না মানিলে বা মানিলে অনন্ত দুঃখ বা বহিস্ত; এক হয় কি করিয়া? অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধজ্ঞানী ও সংযমী কোন পুরুষকে যদি কেহ বলে ''আল্লার উপাসনা কর ইহার ফলে তুমি ও তোমার স্ত্রী বহিস্তে যাইবে এবং ''হূর'' ও ছোকড়া সহ কামলীলা করিতে পারিবে।'' ইহাতে তিনি সম্মত হইবেন কি? কেহ যদি বলেন, রামকৃষ্ণ ও শারদেশ্বরী হূর ও ছোকড়া লীলা অনন্ত কালের জন্য করিবেন, ইহাতে তাঁহাদের ভক্তগণের সুখ ও আনন্দ হইবে তো? রাম নামের বলে লেজ গজাইল, কৃষ্ণ নামের বলে পুরুষ মানুষের মাসিক হইল, আল্লা নামের মহিমায় হূর পাইলেন। এসব অসত্য প্রচার করিলে মহাপুরুষকে খেলোই করা হয়। কুরাণ অধ্যায় দেখ।

১৩। গীতাতে বলিয়াছেন - যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ যে আমাকে যেমন ভক্তি করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই খুসী করি। হে পার্থ, মনুষ্য সকল আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

১৪। ধর্ম্ম সমন্বয়বাদীরাই এই শ্লোকটীকে খুব ভালবাসেন। কিন্তু আল্লার উপাসকগণকে তিনি অনন্ত বহিস্ত, হূর ও ছোকড়া কোথা হইতে দিবেন? তিনি আল্লারই মত হূর ও ছোকড়াগণকে ইমানদারদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন কি? (কুরাণ অধ্যায় দেখুন)

১৫। যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃ ব্রতাঃ।
ভূতাণি যান্তি-ভূতেজ্যাঃ যান্তি মদ্যাজিনোঽপিমাম্॥ গীতা।

যাঁহারা দেবব্রত তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। যাঁহারা পিতৃ উপাসক তাঁহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ভূত উপাসক তাঁহারা ভূত প্রাপ্ত হন। যাঁহারা আত্মার উপাসক তাঁহারা আত্মা লাভ করেন।

১৬। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কি উপাস্য আছে যাহার উপাসনা করিলে যুবতী ও ছোকড়া লীলা করা যায়। আমরা বলি গুণ্ডাবাদের উপাসনা করিলে এবং গুণ্ডা হইয়া লুট, নারীহরণ লীলা দ্বারা যুবতী ও ছোকড়া লীলা চলিতে পারে। আমরা আল্লা ও গড বাদীগণকে আল্লা ও গড্ নামক ব্যক্তিটি বা ব্যক্তি দুইটি কে উহা স্থির করিতে বলি। এরা দেবতা, যমরাজা, পিতৃদেব অথবা ভূত প্রেত বা পিশাচ অথবা স্বয়ং ঈশ্বর, উহা স্থির করা প্রয়োজন। আমাদের কোন উপাস্য বস্তুর সঙ্গেই আল্লা মিঞার মিল নাই। দেখুন, ধর্ম্ম শিক্ষা। আমরা বলিতে পারি উপাসনার ফলে উপাস্য লাভ হয়। আল্লার

উপাসনা করিলে যদি হূর পাওয়া যায় তবে আল্লা ও হূর নিশ্চয়ই এক বস্তু। অনেকে সেবা ধর্ম্মের প্রশংসা করেন, আমরাও করি। কিন্তু মানবতার নামে গুণ্ডামি আসুরিকতা ও বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দেওয়া যায় কি? একজন নারী অপমানিতা হইল, তাহাকে সেবা করিলাম এবং আশ্রয় দিলাম। কিন্তু যে অপমান করিল, অত্যাচার করিল, তাহার নিকট হাতজোড় করিলাম। সে আবার একটী নারীর উপর অত্যাচার করিল। আমরা সেই নারীটীরও সেবা করিলাম। এই ভাবে গুণ্ডাটীর কার্য্য বৃদ্ধি পাইতেই চলিল। একজনের মাথা এক গুণ্ডা ভাঙ্গিল। মনে কর একটা বিখ্যাত বর্ব্বরসমাজ কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে নারীনির্য্যাতন, লুট, গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও ব্যাপক নরহত্যা আরম্ভ করিল। আমরা মানবতার খাতিরে যে প্রতিশোধের পথ লইল তাহারই মাথা ভাঙ্গিতে লাগিলাম ও ধর্ম্মের নামে আহতদের মলমপট্টী বাঁধিতে লাগিলাম। নারীগণকে উদ্ধারের নামেও ভণ্ডামি জুড়িয়া দিলাম। এ কি মানবতার কার্য্য? একদিকে গুণ্ডা ও দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ গুণ্ডার স্তুতি এবং অন্যদিকে আহতের সেবা; ইহা কি সত্যিই মানবতার কার্য্য? না কি, ইহা গুণ্ডামীর প্রশ্রয়? আমরা বলিব গুণ্ডামীর মূলোচ্ছেদ প্রধান মানবতা, আর্ত্তের সেবার স্থান উহার নিম্নে। আজকাল অহিংসাবাদী স্বার্থপর ভণ্ড ও কালসর্প সমাজ গড়া হইয়াছে। বর্ব্বরবাদীদের নিন্দা করিলে ইহারা ''সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে'' বলিয়া আপনাদিগকে প্রমাণ করিতে চায়। আমরা বলি, তোমরা কোন উচ্চ স্থান লাভ কর নাই, তোমরা নিজেরা বর্ব্বরের পদতলে এবং সমস্ত সমাজকে বর্ব্বরবাদের পদতলে আনিবার ঠিকেদার হইয়াছ। তোমরা সাম্প্রদায়িকতার* ঊর্দ্ধে অথবা দুর্নীতি স্বার্থ ও বর্ব্বরবাদের পদতলে, ইহা এখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। ভাববাদিতার প্রাবল্যে সমাজ অত্যাচার অনেক সহ্য করিয়াছে। সমাজ, তুমি ভাববাদ ছাড়।

১৭। আজকাল অনেক ভণ্ড মুসলমান ও খৃষ্টানকে আল্লা ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক বলিতে শুনা যায়। আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ''তোমরা কয়ামৎ ও শেষ বিচার মান কিনা?'' অর্থাৎ ''মালিকে য়া মিদিন'' বলিয়া নমাজ পড় কিনা? উত্তর, হাঁ। নির্গুণ ব্রহ্ম বিচার কি করিয়া করিবেন? এই সমস্ত দার্শনিকতার জ্ঞান যে সব মূর্খের নাই, তাহাদের জানা কর্ত্তব্য, আল্লা মিঞা ইহাদিগকে এইরূপ কাফ্‌রামীর জন্য দুজকের আগুন ভিন্ন কিছুই দিতে পারে না। (দ্রষ্টব্য ধর্ম্মশিক্ষা)। যাহারা গুণ্ডামীর ধর্ম্ম ধরিয়াছ তাহারা গুণ্ডামী কর। সমাজ যতদিন নিজের শক্তিবলে ইহার ভীষণ প্রতিশোধ দিতে পারিবে না, ততদিন ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া আর কাফেরামী করিবার প্রয়োজন কি? ততদিন তোমাদেরই তো দিন। তোমরা ১৪০০ বৎসর গুণ্ডামী করিয়াছ। কে তোমাদিগকে রুদ্ধ করিয়াছে? নপুংসকদের সাধ্য কি যে একটা অসুরবাদকে ভাঙ্গিয়া দেয়? বিগত গান্ধীগ্রস্ত ত্রিশ বৎসরের কথা স্মরণ কর। এই ত্রিশ বৎসর ভারতের কোণে কোণে তোমরা গুণ্ডামী করিয়াছিলে, কে তোমাদের রুদ্ধ করিয়াছে? দেশকে ভাগ করিয়াছ, কে তোমাদের রুদ্ধ করিয়াছে? পাকিস্থান হইতে সব হিন্দুকে বহিষ্কার তোমরাই করিয়াছ। লক্ষ লক্ষ সতীর সর্ব্বনাশ করিয়াছ। কে তোমাদিগকে রুদ্ধ করিয়াছে? আজ তোমরা ব্রহ্মবাদী সাজিয়া কাফেরামী করিতেছ কেন? নপুংসকেরা তোমাদের অস্তিত্ব নষ্ট করিবে? আর কাফেরামী

* প্রকাশকের নিবেদন - এই শব্দটি স্বচ্ছতার খাতিরে আমাদের সংযোজন।

করিলেই কি শক্তিবাদীরা ১৪০০ বৎসরের ইতিহাস ও তোমাদিগকে চিনিতে ভুলিয়া যাইবে? আমরা বলি তোমরা অকারণ কাফেরামী করিও না। শক্তিবাদীরা এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাহারা তোমাদের কাফেরামীর ফন্দী ভাল ভাবে বুঝিবার শক্তি রাখে। হয় ভারত শক্তিবাদের দেশ হইবে অথবা ভারত ইসলাম গ্রহণ করিবে। মধ্য পথে যাহারা চলিতে চায় তাহারা ইসলামের গুপ্তচর। আজ যে পথে ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম হিন্দু শূন্য হইয়াছে, যদি ভারত না বদলায় তবে কাল সমস্ত ভারতই সে পথে হিন্দুশূন্য হইবে। কম্যুনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, কংগ্রেস পন্থী সবই ইসলামের দলের লোক। একথা শক্তিবাদ জানে।

১৮। ভাববাদের আরও একটি নবীন সংস্করণ দেখা দিয়াছে। ভারতের প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে রাষ্ট্রের অর্থে ইহার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। রেডিওতে ইহার গান নিত্যই থাকে। আমরা গান্ধিজীর প্রার্থনাসভা কাশীতে জ্ঞানবাপীতে দেখিয়াছি। তিনি ও তাঁহার পুত্র 'রাম ধূন' গাইলেন এবং জনতাকে গাহিতে বলিলেন। তখন ইহার রূপ ছিল - ''রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। পতিত পাবন সীতা রাম''। গান্ধিজীর মৃত্যুর পূর্বে ইহাতে একটু অলঙ্কার দেওয়া হইল : 'জো হী আল্লা সো হী রাম'। তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলমানদের চাপে ইহার রূপ দেওয়া হইল - 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম'। কিছুদিন বাদ ইহার রূপ দেওয়া হইল - 'ঈশ্বর আল্লা একই নাম'। আমরা জিজ্ঞাসা করি, রাম, ঈশ্বর ও আল্লা যদি এক হন তবে সীতা দেবীকে আল্লাণী বলা হয় কিনা? সতী সাধ্বী সীতাকে রাবণ স্পর্শও করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে এত সহজে আল্লাণী করিয়া দিতে যাহারা দল পাকাইয়াছে উহাদিগকে সমাজ আর কত দিন ক্ষমা করিতে পারিবে? এক দেশ ভাগ হইয়া দুই দেশ হইল। লক্ষ লক্ষ নারীর সতীত্ব গেল। কোটী কোটী নর নারীকে সর্ব্বনাশে নামানো হইল। ইহাতেও গান্ধীবাদীদের মন তুষ্ট হয় নাই। ইহারা এবার সীতার সতীত্ব লইয়া টানা টানি আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের ধারণা নাই, এই টানাটানির প্রতিক্রিয়া আমাদের সতীবাদের উপর কিরূপ প্রভাব দিবে। দুই এক জনের নিকট সতীবাদের মূল্য না থাকিলেও সমাজ জীবনে সতীবাদের প্রয়োজন আছে। দুই দিন বাদ 'সব কা স্বমতি দে ভগবান' এর স্থানে 'সব কা ছুন্নৎ দে ভগবান' করা হইবে তো? যদি ঈশ্বর ও আল্লা একই তবে ছুন্নৎবাদ থাকিবার আর প্রয়োজন কি? মসজিদগুলির মধ্যে রাম মূর্ত্তি রাখিলে ও দেওয়ালে 'রাম' 'রাম' 'সীতারাম' লিখিলে ক্ষতি কি? কংগ্রেস বাদীরা ভারতকে ভাগ করিয়া গদিটী আঁকড়াইয়া এখন হিন্দু মুসলমান মিলনে এক ভারতীয় মহান জাতি প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তোমরা যদি সকলকে এক জাত ও এক সংস্কৃতিই মানো তবে মুসলমানদের নামের পূর্ব্বে জনাব ও হিন্দুদের নামের পূর্ব্বে শ্রী লেখ কেন? আমরা বলি, সকলের নামের পূর্ব্বেই 'জনাব' লেখা কর্ত্তব্য। শ্রীজহরলাল না লিখিয়া ''জনাব জহরলাল'' লেখা কর্ত্তব্য এবং আইন বলে সকলের মুসলমানী নাম লেখানো কর্ত্তব্য। অথবা আইন করিয়া সকলেরই শ্রী ও বৈদিক নাম লেখানো প্রয়োজন। যাহারা নিজেরা দুইটী সংস্কৃতি মানিয়া প্রত্যেকটী কার্য্যে প্রমাণ দিতেছে তাহারা কি ভাবে এক সংস্কৃতির কথা বলিতে সাহস পায়? ইহা সত্যই আশ্চর্য্য ঘটনা।

১৯। অহিংসাবাদ আমাদের দেশে কোন নবীন মতবাদ নহে। প্রহ্লাদ চরিত্রে ইহার কথা আছে। একদিন প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু 'হরি কোথায়' জিজ্ঞাসা করেন। প্রহ্লাদ বলেন তিনি ব্যাপক। হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্ফটিকস্তম্ভে তিনি আছেন কিনা। প্রহ্লাদ বলিলেন, আছেন। হিরণ্যকশিপু স্ফটিকস্তম্ভকে আঘাত করেন। এবং স্তম্ভ হইতে নৃসিংহ নারায়ণ প্রকট হইয়া হিরণ্যকশিপুর পেট চিরিয়া বর্ব্বরতার ভাল প্রতিশোধ দিলেন। প্রহ্লাদ নৃসিংহের স্তুতি করিলেন। বিগত ৩০ বৎসরের অহিংসাবাদী সম্প্রদায়দের কার্য্য কলাপ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন অসুরের বর্ব্বরতা চরমে যায় তখন মানবে ভীষণ হিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহা দেখা দেয়। এই প্রতিশোধ স্পৃহাই নৃসিংহ ভগবান। প্রহ্লাদ ইঁহার স্তব করিলেন। কিন্তু আমাদের ৩০ বৎসরের অহিংসাবাদীরা ইহার বিপরীত সুর ধরিলেন। তাঁহারা বর্ব্বরবাদের তোষণ করিতে লাগিলেন, নৃসিংহ নারায়ণের মূলোচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। ইহারা অহিংসাবাদী কি অতি স্বার্থবাদী, জগৎ ক্রমেই বেশী বুঝিতে পারিবে। ইহাদের স্বার্থে আঘাত পড়িবে জানিতে পারিলে ইহারা যে কোন সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মনিষ্ঠকেও সিকিউরিটী আইনে বাঁধিতে লজ্জা বোধও করে না। পাঠক জানিয়া রাখুন, ভাববাদীরা যদি অপুষ্ট বিষ্ণুপন্থী হয় তবে ইহারা ভীষণ দুর্জ্জন হয়। ভাববাদ কেবল সমাজকেই দুর্ব্বল করে না; ভাববাদে পুষ্ট দুর্জ্জনগণকে প্রকৃতি অসুরবাদী অপেক্ষাও হীন প্রস্তুত করে। সমাজ সাবধান।

২০। ভাববাদ ভারতের সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আমরা বলি পৌরোহিত্যবাদের আড়ালে সমাজ তবুও ১০০০ বৎসর আত্মরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ভাববাদের আড়ালে ভারত আর ২৫ বৎসরও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। ৩০ বৎসরের ভাববাদিতায় আজ ভারতের এক তৃতীয়াংশ হিন্দুহীন এবং বাকী অংশও মৃত্যুর পথে দণ্ডায়মান। দেশবাসীকে বলি শক্তিবাদ বুঝ।

নবম অধ্যায়

শক্তিশালী সমাজে বৌদ্ধবাদ

১। বৌদ্ধবাদ আমাদের দেশের একটী প্রাচীন মতবাদ। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে বুদ্ধিবাদীয় ধর্ম্ম ও সাধনার ধারা প্রবর্ত্তিত ছিল। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র ও অন্যান্য বহু শাস্ত্রে বৌদ্ধবাদীয় ধর্ম্ম, সাধনা ও দার্শনিকতা বিদ্যমান। বুদ্ধ কাহারও নাম ছিল না। রাজর্ষি গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর 'বুদ্ধ' নাম ধারণ করেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি বুদ্ধদেব নামে পরিচিত হন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি সাধনার ফলস্বরূপ যে জ্ঞানধারা লাভ করেন, উহাকেই তিনি ধর্ম্ম প্রচারের ভিত্তিরূপে দাঁড় করান। আমাদের মতে বুদ্ধদেব একজন তান্ত্রিক যোগী ও শক্তি উপাসক ছিলেন। তিনি তারা দেবীর উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধবাদীয় সমস্ত সাধনা ও অনুভূতি তারা সাধনায় বিদ্যমান। আমাদের দেশের ক্রমাভিষিক্ত সাধকদের মধ্যে বৌদ্ধাচার, বৌদ্ধ যোগ ও তারা উপাসনার ধারা প্রবল ভাবেই বিদ্যমান। বুদ্ধের শূন্যবাদের স্তরগুলি তারা উপাসনা মাত্র। তারা মূর্ত্তি দেখিলে ও ধ্যানের অর্থ পাঠ করিলে পাঠক ইহার মর্ম্ম জানিতে পারিবে। বুদ্ধের তারা মন্ত্রের সাধনাও ক্রমাভিষিক্ত অনেক সাধক সম্প্রদায়ে এখনও বিদ্যমান। বুদ্ধদেব যে মন্ত্রে তারা উপাসনা করিয়াছিলেন উহা - "ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা"। এই মন্ত্র সম্বন্ধে তন্ত্র শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। "প্রণবশ্চ ততস্তারে তুত্তারে তুরে পদম্। বহ্নিজায়া নিগদিতো বৌদ্ধ মন্ত্রো মনীষিভিঃ॥" (শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণিঃ॥ ১৮ প্রকাশ। ১৫৭)॥ বৌদ্ধবাদীয় সপ্তশূন্যবাদও তারা উপাসনা মাত্র। এ সম্বন্ধেও বলা যাইতেছে -

এবম্ভূতা মহাদেবী ব্রহ্মাণ্ডে শূন্য মধ্যগা।
সৃষ্টিকরী মহাদেবী তারা রূপা ত্রয়ান্বিতা।
দ্বিতীয়ে শূন্যে চান্তে চ স্থবিরাড্রূপ ধারিণী।
তৃতীয়ে চ মহাশূন্যে তড়িৎ কোটী মহাপ্রভা।
নিরাকারা নিরাধারা তারা সর্ব্বার্থ সাধিকা।
চতুর্থে শূন্যমাশ্রিত্য বিষ্ণুৎপালয়তে ধ্রুবম্।
পঞ্চশূন্যে মহাদেবী শিবরূপা ত্রিলোচনা।
লয়ং নয়াতি ব্রহ্মাণ্ডং মহাকালেন লালিতা।
ষষ্ঠে শূন্যময়ং ব্রহ্ম স্বয়ং বিশ্বেশ্বরস্তথা।
মহা মহা শব্দরূপা কালিকা বীজ তারকা। ইত্যাদি।

তারা রহস্যম্ ১ম পটল।

তারা সাধকদের একটী প্রাচীন গানের সামান্য অংশ এখানে দেওয়া হইতেছে। ইহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বৌদ্ধদের ভেদভাবনাহীন সমাজবাদ নিরাকার ব্রহ্মবাদ, শোক ও শুচিহীন সমাজবাদ সবই তারা উপাসনা মাত্র। এ সম্বন্ধে আমরা ''আচার'' অংশে কিছু বলিব। গানটী যথা - এমন দিন কি হবে তারা, তারা তারা তারা বলে দুনয়নে পড়বে ধারা॥ ঘুচে যাবে ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ। তখন শত শত সত্যবেদ তারা আমার নিরাকারা।

২। ভ্রূমধ্য কেন্দ্রটীকে ভিত্তি করিয়া যোগের প্রায় সব সাধনাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার অন্য নাম বিবেক স্থান। ইহা শূন্যবোধ কেন্দ্র। বুদ্ধবাদের দার্শনিকতার ইহাই কেন্দ্র। বুদ্ধদেব সাধনাকে এইখানেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই; ফলতঃ ইহা কোন যোগীরই এইখানে সীমাবদ্ধ থাকে না। ইহা ক্রমবিকাশে বিকশিত হইয়া শান্তি ও পূর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্কস্থিত বুদ্ধি, শান্তি ও জ্ঞান কেন্দ্রকে ভিত্তি করিয়া সমস্ত বৌদ্ধবাদ ও বৌদ্ধ দার্শনিকতা বিদ্যমান (পরে চিত্র দ্বারা বুঝানো হইবে)। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায় ছিল, তাহাদিগকে বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায় বলা হইত। বুদ্ধদেব এই বিজ্ঞানবাদের এক দার্শনিক ভিত্তিসম্পন্ন মতবাদ দাঁড় করান। এই সম্প্রদায় প্রবল হইয়া ভারতীয় পৌরোহিত্যবাদীয় সম্প্রদায়ের এক প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। শেষকালে ইহারা পৌরোহিত্যবাদকে ভাঙ্গিবার জন্য মন দেয় এবং পৌরোহিত্যবাদীদের আশ্রয় ''বেদকে'' আঘাত করে। এই একটী মাত্র ভুলে বৌদ্ধবাদ এ দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায়। বৌদ্ধবাদীরা যদি বেদকে আঁকড়াইয়া ধরিত তবে পৌরোহিত্যবাদ এ দেশ হইতে পুছিয়া যাইত। বৌদ্ধবাদ বৈদিক ধর্ম্মেরই একটী প্রাচীন মতবাদ। রাজা রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মবাদ যেমন মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে লওয়া হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ বৌদ্ধবাদীয় হিন্দু ধর্ম্মের সমস্ত সাধনা, ক্রিয়া ও আচার, তন্ত্র ও তারা উপাসনা হইতে লওয়া হইয়াছে।

৩। মহাপুরুষগণ নিজেরা কে কি সাধনা করিয়াছেন, উহা প্রথমে বিচার করিতে হয়, পরে তাঁহারা কে কি দার্শনিক ভিত্তিতে উপদেশ দিলেন উহাও বুঝিতে হয়। বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, আচার্য্য শঙ্কর, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব সকলেই তান্ত্রিক সাধক ছিলেন; কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকেরই দার্শনিকতা ও চিন্তা বিজ্ঞানে প্রচুর ভেদ বিদ্যমান। ইহার কারণ জ্ঞানের বিকাশভূমি সকলের সমান নহে। বুদ্ধদেব বিজ্ঞানবাদী, আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মণ্যবাদী, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমবাদী, চৈতন্যদেব ভাববাদী। কিন্তু সকলেই শক্তি উপাসক ও তান্ত্রিক ধারায় সাধক ছিলেন। স্ব স্ব মত দাঁড় করাইবার জন্য সকলেই একই নীতি গ্রহণ করেন নাই। বুদ্ধ সঙ্ঘবাদ প্রবর্ত্তন করেন এবং সন্ন্যাসীগণকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্ঘ বাদীয় সমাজের ভিত্তি দান করেন। আচার্য্য শঙ্কর ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত সম্প্রদায়কে হাতে করেন। এবং সন্ন্যাসীগণকে কর্ম্মহীন করিয়া সমাজজীবন হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিবার জন্য প্রস্থানত্রয়ের নিষ্কর্ম্মবাদ ব্যাখ্যা করেন। চৈতন্যদেব ভালবাসার সাধনা প্রবর্ত্তন করেন এবং বৈরাগী সম্প্রদায় গড়িয়া ভাব ধর্ম্ম প্লাবনের পথ করেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজাগণকে পুরুষোত্তমবাদের আদর্শে গড়িয়া শক্তিবাদীয় যুগ গড়িবার পক্ষে ছিলেন। তিনি ঐ লক্ষ্যেই অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দান করেন। আমাদের শক্তিবাদীদেরও কর্ম্মবিজ্ঞান ও

দার্শনিকতার নীতি আছে। আমরা সঙ্ঘবাদ চাই না, আমরা সমাজবাদ চাই। আমরা ব্রহ্মণ্যবাদ সমর্থন করি, পৌরোহিত্যবাদ চাই না, আমরা ভালবাসার সাধনার বিরোধী নই, কিন্তু বৈরাগীবাদ সমর্থন করি না। আমরা শ্রীকৃষ্ণের মতই পুরুষোত্তমবাদী; কিন্তু এই মতবাদকে সমাজ ও ব্যষ্টি উভয় জীবনেই আনিতে চাই। আমরা এজন্য সমাজে শক্তিবাদীয় উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছি। এই উপাসনায় যোগশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান, তন্ত্রশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মস্তোত্রম, সংহিতার গায়ত্রী এবং উপনিষদের মহামন্ত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সত্য, প্রেম, শান্তি, তেজ (অসুর বিরোধিতা), ও অভয় এই পাঁচটি দৈবী সম্পদের অভ্যাস শক্তিবাদীয় নীতির অলঙ্ঘনীয় অবলম্বন। ইহাতে সমস্ত বর্ণ ও সমস্ত দেশের এবং নারীর প্রবেশের নীতি স্বীকার করা হইয়াছে। ১০ দিন অশৌচ, গোত্র প্রবর্ত্তন ও উপাসনা প্রবর্ত্তন দ্বারা শক্তিবাদীয় সমাজ দেশে বিদেশে প্রবর্ত্তিত হইবে। আমরা সমস্ত হিন্দু দর্শনের মত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটী প্রমাণই স্বীকার করি। বৌদ্ধবাদিগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ স্বীকার করেন কিন্তু আগম মানেন না। (অনুভূতিই প্রত্যক্ষ প্রমাণ; যুক্তিতর্ক ও উপমাকে অনুমান প্রমাণ বলে; কোন বিষয়ের বা জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করিবার জন্য বেদের প্রমাণকে উদ্ধৃত করাকে আগম প্রমাণ বলে)। বৌদ্ধদের মতে বেদে একই তত্ত্ব নিরূপণে অনেক ঋষির অনেক মত পাওয়া যায়, কাজেই আগমকে তাঁহারা প্রমাণ মানিয়া গোলমাল টানিতে চাহেন নাই। আমরা বলিয়াছি, বুদ্ধদের তান্ত্রিক যোগী ছিলেন। বৌদ্ধসাধক মাত্রই তান্ত্রিক সাধক জানিতে হইবে। তান্ত্রিক সাধনা দ্বারা মানুষ অসাধারণ আত্মজ্ঞান ও আত্মশক্তির পরিচয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। বৌদ্ধবাদীরা বেদের প্রমাণ মানেন নাই বলিয়া বৌদ্ধবাদ কোন অবৈদিক ধর্ম্ম নহে। তন্ত্র মানিলে বেদ অমান্য থাকে না। বেদের সাধনার সিদ্ধান্তই তন্ত্রশাস্ত্র। গায়ত্রী ব্রহ্মস্তোত্র, মহামন্ত্র ও ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান, এ সব অবলম্বন দেখিয়া কেহ যদি ভাবেন যে শক্তিবাদীদের আর কোনই সাধনা নাই তবে উহা অত্যন্ত ভুল ধারণা হইবে। সমাজ জীবনকে একমুখী করিবার জন্যই আমরা এই উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছি মাত্র। ইহা ভিন্ন শক্তিবাদীদের অন্তরঙ্গ সাধনায় ক্রম আছে। উহাতে সকলে প্রবেশ করিতে শক্তি বা প্রবৃত্তি রাখে না। বৌদ্ধবাদীদের পঞ্চশীল ও দশশীলের অনুশীলনই সবটুকু সাধনা নয়। বলা প্রয়োজন পঞ্চ ও দশ শীল বহিরঙ্গ সাধনা মাত্র। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের কথা স্মরণ করুন। তিনিও বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। পঞ্চ ও দশ শীলের সাধনা ভিন্ন তাঁহার অন্তরঙ্গ সাধনার ধারা ছিল। আমাদেরও অন্তরঙ্গ সাধনার ধারা আছে। ভারতের বুকে যতপ্রকারের কর্ম্মবিজ্ঞান, দার্শনিকতা ও জ্ঞানের প্রবর্ত্তন হইয়াছে উহাদের সব সাধনাই তন্ত্র শাস্ত্রের অন্তর্গত। ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়েই তান্ত্রিকযোগ অপরিহার্য্য পন্থা। বেদবাদীরাও সকলে তান্ত্রিক সাধক। বুদ্ধদেব যদি স্বাধীন ভিত্তিতে জ্ঞানের উপদেশ দিয়া থাকেন তবে উহা অবৈদিক হইবার কোনই কারণ নাই। ভারতের বুকে পৌরোহিত্যবাদীরা বেদকে হাতে পাইয়া সমাজবিদ্বেষকে বেশ ভাল ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বৌদ্ধবাদী হিন্দুরা পৌরোহিত্যবাদী দিগকে বৌদ্ধবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বেশ ভাল ভাবেই আঘাত দেয়। আচার্য্য শঙ্করের পর বৌদ্ধবাদ খণ্ডিত হইবার পর পৌরোহিত্যবাদীরা বৌদ্ধবাদী হিন্দুগণকে ছলে কলে ও শাস্ত্রের মারপ্যাঁচে ফেলিয়া শূদ্রের সম্প্রদায়ে কোণঠাসা করে। এই সব আঘাত ও প্রতিঘাতের নীতি এখন ত্যাগ করিয়া

আমরা ভারতবাসী মাত্রকেই বলি - সকলে বৈদিক সংস্কার গ্রহণ ও গায়ত্রী উপাসনায় মন দাও এবং সমাজ জীবনের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া অহিন্দুগণকে হিন্দু কর। বেদ হিন্দুমাত্রেরই আপনার বস্তু। বৌদ্ধ ধর্ম্মও হিন্দু ধর্ম্ম মাত্র।

৪। গীতা ও বৌদ্ধবাদ :-

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ অঃ ২। ৪৯॥

বুদ্ধি যোগ অপেক্ষা কর্ম্ম (কাম্য) অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তুমি বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় কর সকামীরা কৃপণ (দীন)॥

টিপ্পনী। এখানে কর্ম্ম অর্থে বেদ বিহিত যজ্ঞ ও ইষ্ট পূর্ত্তা আদি সকাম কর্ম্মের কথা জানিতে হইবে। এ সব কর্ম্মের ফলে মানুষ মৃত্যুর পর নানা প্রকারের স্বর্গগতি লাভ করে এবং পুণ্য ক্ষীণ হইলে আবার মর্ত্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করে। এই সব কর্ম্ম দ্বারা আত্মবিকাশ হইয়া মানুষ জ্ঞানী হইতে পারে না। বুদ্ধি যোগীরা বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বেই বেদ বিহিত সকাম কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা আত্মজ্ঞানবাদিতাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন।

বুদ্ধিযুক্ত জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগ কর্ম্মসুকৌশলম্॥ অঃ ২। ৫০॥

তুমি বুদ্ধি যোগ অবলম্বন কর এবং সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয় কর্ম্ম ত্যাগ কর, যোগে তৎপর হও, কর্ম্মে সুকৌশলই যোগ।

টিপ্পনী। এখানে বেদ বিহিত সকল কর্ম্মকে সুকৃত বলা হইয়াছে। চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামী ও আসুরিকতা করাকে দুষ্কৃত কর্ম্ম বলা হইয়াছে।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ অঃ ২। ৫১॥

বুদ্ধিযোগী মহাত্মাগণ নিশ্চয়ই কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং অনাময় পদ (ব্রহ্ম পদ) প্রাপ্ত হন।

টিপ্পনী। এখানে বেদ বিহিত সকাম কর্ম্ম ও চৌর্য্যাদি দুষ্কৃত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিলেও নিজ নিজ স্বভাব ও শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা মজুর বৃত্তির অবলম্বনে সমাজ সেবা ও শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের পথ ত্যাগ করিতে গীতাতে বলা হয় নাই। সেই সব কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা বেদ বিহিত সকল কর্ম্মের বিরোধী নহি, শ্রীকৃষ্ণও ঐরূপ কর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না। জলাশয় স্থাপন, মন্দির প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণাদি কর্ম্ম দ্বারা সমাজসেবা, ধর্ম্মপ্রচার ও বৃহৎ বৃক্ষরোহণ দ্বারা পরিব্রাজক মহাত্মা ও পথচারীদের সেবার ব্যবস্থা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু এসব কর্ম্ম এত ব্যয়সাধ্য যে ইহা সকলের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে সম্পন্ন করা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর। বর্ত্তমান সময়কার বড় বড় তীর্থস্থানগুলি, বহু দুর্গম পথ ও ঘাট, বড় বড় দানবীরদের দানের ফলেই প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা যে বিশেষ পুণ্য কার্য্য ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থানে দেখা যায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই সব মন্দিরের নামে দুই এক ঘর বিদ্বেষবাদী পুরোহিত পোষণের জন্য প্রচুর সম্পত্তি নিয়োগ এবং মন্দিরে জনসাধারণের প্রবেশের

অধিকার না দিয়া বাদুড় ও চামচিকার নিবাস করা হইয়াছে, এইরূপ কার্য্য অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই আমরা মনে করি। যাহা হউক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বুদ্ধিযোগই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এ বিষয়ে বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই এক মত।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ অঃ ২। ৫২॥

যে সময় তোমার বুদ্ধি মোহরূপ দুর্গ অতিক্রম করিবে (অর্থাৎ যখন তুমি ঠিক ঠিক বুদ্ধিযোগী হইবে) তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে (অর্থাৎ ওঁকারের অর্থবোধে তুমি অবিচলিত হইয়া যাইবে)।

টিপ্পনী। সমস্ত বেদের সার ওঁকার। এই ওঁকার জ্ঞানে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হওয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ। এখানে কৃষ্ণ বলিতেছেন, সকাম কর্ম্মে ইহা হইবে না, ইহা লাভ হইবে বুদ্ধিযোগের পথে। অর্থাৎ বেদজ্ঞানের পথ বুদ্ধিযোগেরই পথ। সকাম কর্ম্মে উহা লাভ হয় না।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ অঃ ২। ৫৩॥

যখন ওঁকার ধ্বনিতে (বা ওঁকার অর্থ জ্ঞানে) তোমার বুদ্ধি নিশ্চল হইয়া যাইবে তখন তুমি যোগলাভ করিবে।

টিপ্পনী। বেদ জ্ঞান ও ওঁকার জ্ঞান একই কথা। এই জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য পুরোহিত ডাকিয়া সকাম কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। এইরূপ কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ যে শ্রেষ্ঠ ইহা কেবল শ্রীবুদ্ধের মত নহে ইহা শ্রীকৃষ্ণেরও মত। বৌদ্ধবাদীরা সকাম কর্ম্মের উচ্ছেদ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গীতা ইহার উচ্ছেদ চাহেন নাই। গীতার মতে সকাম কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ। দুষ্কৃতি হইতে সকাম বৈদিক কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্ম্ম হইতে বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সমাজ সেবার আদর্শে নিজ নিজ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

নাস্তি বুদ্ধির যুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তিস্য কুতঃ সুখম্॥ অঃ ২। ৬৬॥

যাহারা বুদ্ধিযোগী নহে তাহাদের যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা আত্মধ্যান পরায়ণ নহে তাহাদের শান্তি হয় না। যাহারা শান্ত নহে তাহাদের সুখ কোথায়?

টিপ্পনী। এখানে দেখা যাইতেছে বুদ্ধদেব যে ভাবে সমাজকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন উহাই ঠিক ঠিক সুখ ও শান্তির পথ। সকাম কর্ম্মবাদই পৌরোহিত্য বাদ এবং বুদ্ধিবাদই বৌদ্ধবাদ। বৌদ্ধবাদীদের বেদ উচ্ছেদের দুর্ব্বুদ্ধিই উহাদের ধ্বংসের কারণ।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং তেন মামুপযান্তিতে॥ অঃ ১০। ১০॥

যাহারা প্রীতির সহিত আমাকে (আত্মাকে) ভজনা করে এবং সর্ব্বদা আমাতে (আত্মাতে) যুক্ত থাকে তাহাদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, তাহা দ্বারা তাহারা আমাকে (আত্মাকে) লাভ করিতে পারে।

টিপ্পনী। বুদ্ধিযোগ ভিন্ন যে আত্মলাভের পথ নাই ইহা শ্রীকৃষ্ণ আরও স্পষ্ট করিয়া দিতেছেন। যাঁহারা ভক্তিবাদী উপাসক অর্থাৎ যাঁহারা প্রেম বা ভালবাসার মধ্য দিয়া সাধনা করেন তাঁহাদেরও এই বুদ্ধিযোগ খুলিয়া যায় এবং আত্মপ্রাপ্তি সফল হয়।

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ অঃ ১০। ৫॥

অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ ও অযশ এ সব ভাব সকল মনুষ্যগণে আমা (আত্মা) হইতেই আসিয়া থাকে।

টিপ্পনী। অহিংসাবাদ আত্মজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই এ দেশে ছিল। আত্মজ্ঞানহীন অহিংসা ভণ্ডামী মাত্র, ইহা বৈরীভাব বৃদ্ধি করে (৭ সূত্র দেখ)। ১৯৫০ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ বৎসর আমাদের দেশে এইরূপ এক ভণ্ডামীর যুগ চলিয়াছিল।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তি রপৈশুনম্।
দয়া ভূতেস্ব লোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ অঃ ১৬। ২॥

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলহীনতা, জীবে দয়া, লোভহীনতা, আত্মপ্রশংসাহীনতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা (এ সব দৈবীসম্পদের লক্ষণ)।

টিপ্পনী। বৌদ্ধবাদীয় সমস্ত নীতি ও সাধনা বেদবাদীয় অভিব্যক্তি। বেদবাদ অসুর বিরোধিতা অর্থাৎ তেজকে মানিয়া লইয়া অহিংসাবাদ মানিয়াছে। ইহা বৌদ্ধবাদেরও নীতি, কিন্তু গান্ধিবাদীরা অসুরবাদীদিগকে প্রশ্রয় দিয়া হিন্দুদের সর্ব্বনাশ করিয়া অহিংসা নীতি চালাইবার পক্ষপাতী হইতেছিলেন; যাহার ফলে গুণ্ডাবাদী যবনরা ভারতের উপর সাংঘাতিক অত্যাচার করিতে সুযোগ পায় এবং দেশ ভাগ করিয়া পাকিস্থান প্রস্তুত করে এবং পাকিস্থান নিবাসী হিন্দুদের সর্ব্ব রকম সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কার করে। অসুরবাদ ধ্বংসদ্বারা অহিংসাবাদই প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই অহিংসাবাদের মূর্খতার আড়ালে অসুর ও যবনবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। ২৬টী দৈবীভাবের মধ্যে আমরা অন্ততঃ পাঁচটী গ্রহণ করিয়াছি। বৌদ্ধবাদের সমস্ত নীতি গীতারই নীতি। বৌদ্ধবাদে যদি শক্তিবাদীয় নীতি না থাকিত তবে তিব্বত চীন জাপান স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিত না। হীনযানী বৌদ্ধগণ শক্তি উপাসনা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ উপাসনা ও অহিংসাবাদে মন দেয়। ফলে ইহারা শক্তিবাদ হারাইয়া ফেলে। যাহারাই শক্তি উপাসনা ভাঙ্গিয়া দিয়া মহাপুরুষ ও অবতার উপাসনা দেশে আনিয়াছে তাহারাই শক্তিবাদ নষ্ট করিয়াছে।

৫। উত্তর গীতা ও বৌদ্ধবাদ :-

যাবৎ পশ্যেৎ খগাকারং তদাকারং বিচিন্তয়েৎ।
খ মধ্যে কুরু চাত্মনমাত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানাং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ অঃ ১। ৯॥

যতটা আকাশ দেখিতে পাওয়া যায় ততটা আকাশকে চিন্তা বা ধ্যান করিবে। আকাশ মধ্যে নিজেকে স্থাপন করিবে এবং মনকে শূন্য করিয়া দিবে। মনকে শূন্য করিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না।

টিপ্পনী। উত্তর গীতা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুদ্ধিবাদীয় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। উত্তর গীতায় উহারই ক্রম বিদ্যমান। বৌদ্ধবাদীয় শূন্যবাদ

প্রাচীন ভারতে বুদ্ধিযোগী সম্প্রদায় গুলিতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আমরা বহু শাস্ত্র হইতে বুদ্ধিযোগীর সাধনার ধারা প্রমাণ করিতে পারি।

সর্ব্বশূণ্যং নিরাভাসং সমাধি স্তস্য লক্ষণং।
ত্রিশূণ্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যতে বন্ধনাৎ॥

মন যখন সর্ব্ব শূন্য ও আভাসহীন হয়, উহাই সমাধির লক্ষণ। যিনি ত্রিশূন্য অবস্থা বুঝিতে পারেন (অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে যাঁহার শূন্যবাদ আয়ত্তে আসিয়াছে) তিনি বন্ধনহীন হন।

ঊর্দ্ধা শূন্যমধঃ শূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকং।
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্তস্য লক্ষণং॥ অঃ ১। ৩৩॥

যাঁহার ঊর্দ্ধ শূন্য, মধ্য শূন্য ও অধঃ শূন্য হইয়া আত্মবোধ হইয়াছে, যাঁহার আত্মা সর্ব্বশূন্য হইয়াছে, তাঁহারই সমাধি লক্ষণ জানিবে।

শূন্য ভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ অঃ ১। ৩৪॥

যিনি শূন্যভাবে ভাবিত ব্যক্তি তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

৬। বেদান্তদর্শন ও বৌদ্ধবাদ :-

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ॥ (বেদান্ত সূত্রম্)

আকাশ বলিতে ব্রহ্মই বুঝায়; কারণ আকাশ ব্রহ্মেরই মত ব্যাপক।

টিপ্পনী। উপনিষদ ও বেদে আকাশ শব্দের ব্যবহার আছে। বেদান্ত সূত্র বলিতেছেন উহা ব্রহ্ম বাচক শব্দ। পাঠক দেখিতেছেন বৌদ্ধবাদের শূন্যবাদ ও বেদের ব্রহ্মবাদ একার্থ বাচক। বৌদ্ধবাদীয় দর্শন ও শঙ্করের দর্শন প্রায় একার্থ বাচক, এজন্য আচার্য্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ বলা হয়।

৭। যোগদর্শন ও বৌদ্ধবাদ :-

অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহাঃ যমাঃ॥
যোগকারিকা॥ ২য় পাদ। সূ ৩০॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, ইহারা যম॥

অহিংসা* প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ॥ যোগকারিকা॥ ২য় পাদ। সূ ৩৫॥

---

* অনেকের ধারণা গান্ধি একজন অহিংসাসিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। আমরা তাহা স্বীকার করি না। তাঁহার উপর মিঃ জিন্না ও তাহার প্রবর্ত্তিত লিগের অত্যন্ত বৈরীভাব ছিল। এই বৈরীভাব দিন পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। গান্ধি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলমান তোষক এবং হিন্দুদের সর্ব্বনাশকারী ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানস্থিত হিন্দুদের সর্ব্বনাশের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যদের অহিংসা মুসলমান তোষণ ও হিন্দুদের সর্ব্বনাশ করিবার একটা শক্তিশালী অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। গান্ধিবাদীয় কংগ্রেস কিরূপ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ ছিল উহা ইহাদের হাতে শাসনদণ্ড আসিবার পর ভারতের প্রত্যেক ইঞ্চি ইঞ্চি স্থানে দেখা গিয়াছে। ঘুষ, চোর, চোরাকারবার এবং নীতিহীন মুসলমান তোষণে ইঁহারা সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। এতবড় দুর্নীতি পৃথিবীর ইতিহাসে আর হয় নাই। তিনি অহিংসা সিদ্ধ হইলে তাঁহার মৃত্যু শত্রুর গুলিতে অসম্ভব ছিল।

অহিংসা প্রতিষ্ঠা হইলে তাঁহার সন্নিধানে (জীবমাত্রই) বৈরী ভাব ত্যাগ করে।

টিপ্পনী। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজবাদীদের মত বৌদ্ধবাদীয় সমাজবাদ ও সাধনা আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যমান। উপনিষদ ও তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মবাদকে ভিত্তি করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধবাদও শাস্ত্রোক্ত বুদ্ধিবাদীয় দার্শনিকতা ও সাধনাকে ভিত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

৮। তন্ত্রশাস্ত্র ও বৌদ্ধবাদ :-

দেব্যুবাচ। দেব দেব জগন্নাথ ব্রুহি মে পরমেশ্বর।
দর্শনানি কথং দেব ভবন্তি চ পৃথক পৃথক॥
ঈশ্বর উবাচ। ত্রিদণ্ডী চ ভবেদ্ভক্তো বেদাভ্যাসরতঃ সদা।
প্রকৃতি বাদরতাঃ শক্তাঃ বৌদ্ধাঃ শূন্যতি বাদিনঃ॥
ততোর্দ্ধ্বং গামিনো যে বা তত্ত্বজ্ঞাঃ অপি তাদৃশঃ।
সর্ব্বং নাস্তীতি চার্ব্বাকাঃ জল্পন্তিবি ষয়াশ্রিতাঃ॥
জ্ঞান সংকলনী তন্ত্র॥ ১৬। ১৭। ১৮॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন - হে দেবদেব! দে জগন্নাথ! হে পরমেশ্বর! দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কিরূপ?

ঈশ্বর বলিলেন - যাহারা ত্রিদণ্ডী (অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতধারী) তাহারাই ভক্তিবাদী। তাহারা প্রতিনিয়ত বেদাভ্যাসে নিয়ত থাকেন। যাহারা শক্তিবাদী তাহাদিগকে প্রকৃতিবাদী জানিবে। যাহারা শূন্যবাদী তাহাদিগকে বুদ্ধিবাদী বলা হয়। যাহারা এ সব মতের ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছেন তাহারা তত্ত্বজ্ঞ নামে খ্যাত। বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যাহারা সব কিছুর জল্পনা করে তাহাদিগকে নাস্তিকবাদী বলে। ইহারা চার্ব্বাক পন্থী।

টিপ্পনী। ভক্তিবাদী, বেদবাদী, শক্তিবাদী, প্রকৃতিবাদী, বুদ্ধিবাদী, শূন্যবাদী, বস্তুবাদী এবং নাস্তিকবাদীরা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদ্যমান। যত মতবাদীই এই দেশে থাকুক না কেন বেদবাদীদের প্রভাব এইদেশে উচ্চ থাকিবে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর বুদ্ধিবাদীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল মাত্র। গান্ধিবাদীরা আমাদের দেশে ডেমোক্রেসী, সোসিয়ালিজম ও কম্যুনিজম্ ও অস্থর তোষণবাদ স্থাপনা করিবার কারণ। আজকাল চার্ব্বাক ও বস্তুতান্ত্রিকতা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রভাবও বেশী দিন থাকিবে না। বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আমাদের দেশের কম্যুনিষ্টবাদীরা তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও ভারতে এই মতবাদের এখন অনেক দল গজাইয়াছে। র‍্যাডিক্যাল, সোসিয়ালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টরা একই মার্কস পন্থী হইলেও ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ও দার্শনিকতায় বেশ ভেদ দেখা দিয়াছে।

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুতঃ।
তথৈব ভান্তি স্বরূপো হ্যাত্মা সাক্ষীস্বরূপতঃ॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। আত্মনিরোপণম্॥

যেরূপ সকলের অন্তর ও বাহ্যে আকাশ অবস্থিত আছে ঠিক সেইরূপ সাক্ষীস্বরূপ আত্মা সমস্ত বস্তুর অন্তর ও বাহ্যে প্রকাশমান আছেন।

টিপ্পনী। বুদ্ধিবাদীদের শূন্যবাদ বেদান্তের ব্রহ্মবাদ ও তন্ত্রের শক্তিবাদ তত্ত্বত একই।

৯। সগুণ ব্রহ্ম "শিব ও বিষ্ণু" এবং শূন্যবাদ :-

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠকা।
আলয় সর্ব্ব দেবানাং লয়না ল্লিঙ্গ মুচ্যতে॥ লিঙ্গ পুরাণম্॥

আকাশকে লিঙ্গ বলে, পৃথিবী ইহার পীনেট। ইহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করেন এবং ইহাতে সমস্ত দেবতা লয় প্রাপ্ত হন এজন্য ইহার নাম লিঙ্গ। লয়ং গচ্ছতি ইতি লিঙ্গং॥

ওঁ শান্তাকারং ভুজঙ্গ শয়নং পদ্মনাভং স্বরেশং।
বিশ্বাধারং গগন সদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্॥ (বিষ্ণু ধ্যান)

তিনি শান্তাকার, ব্রহ্মনাড়ীতে (ভুজঙ্গে) তিনি ব্যাপ্ত, তাঁহার নাভিই ব্রহ্মা, তিনি বীরদের পূজ্য, তিনি বিশ্বের আধার, তিনি আকাশের মত ব্যাপক, তিনি মেঘবর্ণ এবং শুভ ঘটনার সমষ্টি।

টিপ্পনী। দেখা যাইতেছে শিব ও বিষ্ণু উপাসনায়ও শূন্যবাদ গৃহীত ছিল।

১০। আচার্য্য শঙ্কর ও বৌদ্ধবাদ :-

ধরাবদ্ধ পদ্মাসনস্থঽঙ্ঘ্রি ষষ্ঠীঃ
নিয়মানিলং ন্যস্ত নাসাগ্রদৃষ্টিঃ।
য আস্তে কলৌ যোগীনাং চক্রবর্ত্তী
স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু মচিত্তবর্ত্তী॥

যিনি পৃথিবীতে জঙ্ঘা সংলগ্ন করিয়া পদ্মাসনে আসীন ও দণ্ডধারী, যিনি বায়ুনিরোধ করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়াছেন, যিনি কলিযুগের যোগীদের চক্রবর্ত্তী স্বরূপ, সেই বুদ্ধদেব আমার অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রবুদ্ধ থাকুন।

টিপ্পনী। এখানে আচার্য্য শঙ্করের মতে বুদ্ধ একজন বায়ু নিরোধকারী মহাযোগী ছিলেন। শ্রীবুদ্ধের উপর আচার্য্যের যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায় এইরূপ শ্রদ্ধা প্রত্যেক হিন্দুরই শ্রীবুদ্ধের উপর বিদ্যমান। আচার্য্য শঙ্কর বেদবিদ্বেষী সমাজ ভাঙ্গিয়া দেন ইহা সত্য কথা, কিন্তু শ্রীবুদ্ধে তাঁহার শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি বৌদ্ধবাদীয় সমাজবাদ ভাঙ্গিলেও বুদ্ধিযোগ ভাঙ্গেন নাই। বুদ্ধিযোগ ভাঙ্গিলে সমস্ত যোগবিধান অচল হইয়া যায়।

১১। উপনিষদ ও বৌদ্ধবাদ :-

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিস্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥ কঠ ৫৭

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) জানিবে।

টিপ্পনী। আমাদের দেশে রথযাত্রা উৎসব আছে। এই রথযাত্রা উৎসব আত্মজ্ঞানের উৎসব মাত্র। বেদের আত্মজ্ঞান ও দেহতত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই রথযাত্রা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বুদ্ধিযোগ বুঝাইবার এমন সহজ সংকেত আর হইতে পারে না।

যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥ কঠ ৬২

যিনি বিজ্ঞানবান, যাঁহার মন সংযত, যাঁহার অন্তকরণ শুদ্ধ তিনি সেই পদ লাভ করেন, যাহা লাভ করিবার পর আর জন্ম হয় না।

টিপ্পনী। বুদ্ধিবাদ ও বিজ্ঞানবাদ একার্থবাচক। বুদ্ধিবাদীরা যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেন ইহা বেদেরও মত।

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ কঠ ৬৩

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি, মন যাঁহার সংযত, তিনি এই সংসার চক্রের মধ্যেই সেই বিষ্ণুর (ব্যাপক চৈতন্যের) পরম পদ লাভ করেন।

টিপ্পনী। বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ ব্যাপক চৈতন্য লাভ ও নির্ব্বাণ একই পদ।

১২। শক্তিবাদের দৃষ্টিতে বেদবাদ, বুদ্ধিবাদ, শক্তিবাদ, ব্রহ্মবাদ ও ভাববাদ আলোচনা :-

পৃথিবীতে যত প্রকারের মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে উহাদের আলোচনা করিবার জন্য আমরা মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্র প্রদান করিলাম। পাঠক চিত্র পরিচয় অংশ পাঠ করুন।

মস্তিষ্ক চিত্র পরিচয়

১। মনের কেন্দ্র। পুরাণে ব্রহ্মা বলিতে এই কেন্দ্রকেই বুঝায়। এই কেন্দ্রের প্রভাবে মানুষ বিষয় ভোগী হয় এবং সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। ইহা অগ্নির কেন্দ্র। আমাদের অন্তঃকরণে এই অগ্নি শক্তি প্রভাবিত হইলেই আমরা বহির্মুখী হই। বিবাহ এবং অন্যান্য বৈদিক সংস্কারে এই কেন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ মানা হইয়াছে। সমস্ত সংসারের জীব এই কেন্দ্রের উপাসক। ইহা আমাদের মস্তিষ্কে সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র। ইহাই পুরাণোক্ত ব্রহ্মা ইনিই প্রজাপতি অর্থাৎ সৃষ্টির ঈশ্বর। জীবদেহে এ অংশের অসীম প্রভাব। মনের সমাজই মানব সমাজ। উচ্চ স্তরের কেন্দ্র প্রভাব না মানিলে ইহা দ্বারা প্রভাবিত সমাজ প্রায় পশুর সমান হয়।

২। সূর্য্যকেন্দ্র। ইহা স্নেহভাব ও ভালবাসার কেন্দ্র। ইহা ভাববাদিতার কেন্দ্র। বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণববাদে এই কেন্দ্রের প্রভাব খুব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব জীবমাত্রই অনুভব করে। এসব ভাবদ্বারা মানবসংসার রচিত। ইহা মানব সমাজের একটা প্রকাণ্ড অংশ। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্বামীস্ত্রী, ভৃত্য, ভর্ত্তা আদি সংসারের সব ভাবেই আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহার যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া সাধক সংসারের সব বন্ধন অতিক্রম করিতে পারেন। খৃষ্টবাদে এই কেন্দ্রের কতকটা প্রভাব আছে। ভারতবর্ষের বহু ভক্ত সম্প্রদায় এই কেন্দ্রশক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাধনা করিয়াছেন। ইহা ভাববাদ কেন্দ্র।

৩। বিষ্ণুকেন্দ্র। ইহা সমাজ নীতির কেন্দ্র। মানুষের মনে যত প্রকারের দৈবভাব আছে সকলের ইহাই কেন্দ্র এবং সব রকম আসুরিক ভাবও এখানেই কেন্দ্রীভূত। দৈবী ভাবসম্পন্ন সমাজ ও অসুর ভাবসম্পন্ন সমাজ, দুই রকম সমাজবাদের ইহাই কেন্দ্র; ইহা সমাজবাদ কেন্দ্র। এই সমাজবাদে ২ নং কেন্দ্রের প্রভাব থাকিলে ইহা দুর্ব্বল সমাজ

হয়। এই সমাজ কেন্দ্রে ৭, ৪ ও ১০ চিহ্নিত কেন্দ্রশক্তির প্রভাব থাকিলে ইহা শক্তিশালী সমাজ হয়। এই সমাজ কেন্দ্রে যদি ২, ৪, বা ৭ এর কোন প্রভাব না থাকে তবে ইহা অসুরবাদীয় সমাজ। পৌরোহিত্য ও ভাববাদীয় দুর্ব্বল সমাজ, রাবণবাদী অসুর সমাজ, শ্রীকৃষ্ণ ও মনুদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত শক্তিশালী সমাজের কথা হিন্দুসমাজ ভাল ভাবেই জানে। ইস্‌লামীয় সমাজ, ডেমোক্রেসী, সোসিয়ালিজম্‌, কম্যুনিজম্‌ ও ফ্যাসিজম্‌ সবই অসুরবাদী সমাজ। এই সমাজের মধ্যে ইসলাম সমাজ কিরূপ প্রকৃতির উহা আমরা এদেশের প্রায় ১০০০ বৎসরের ইতিহাসে দেখিতে পাই। চৌদ্দশত বৎসরের সংঘর্ষে এই পৃথিবীর অনেক দেশই ইসলামী সমাজের রূপ জানিয়াছে। ডেমোক্রেসী এবং উহার সন্তান সন্ততি সমাজ - কম্যুনিজম্‌, সোসিয়ালিজম্‌, ফ্যাসিজম্‌ এর জীবন ১০০ বৎসর মাত্র। ইহাদের রূপ অনেক জানা গিয়াছে এবং অনেক জানা যাইবে। আমরা সমাজকে শক্তিবাদের দিকে টানিতে চেষ্টা করিব।

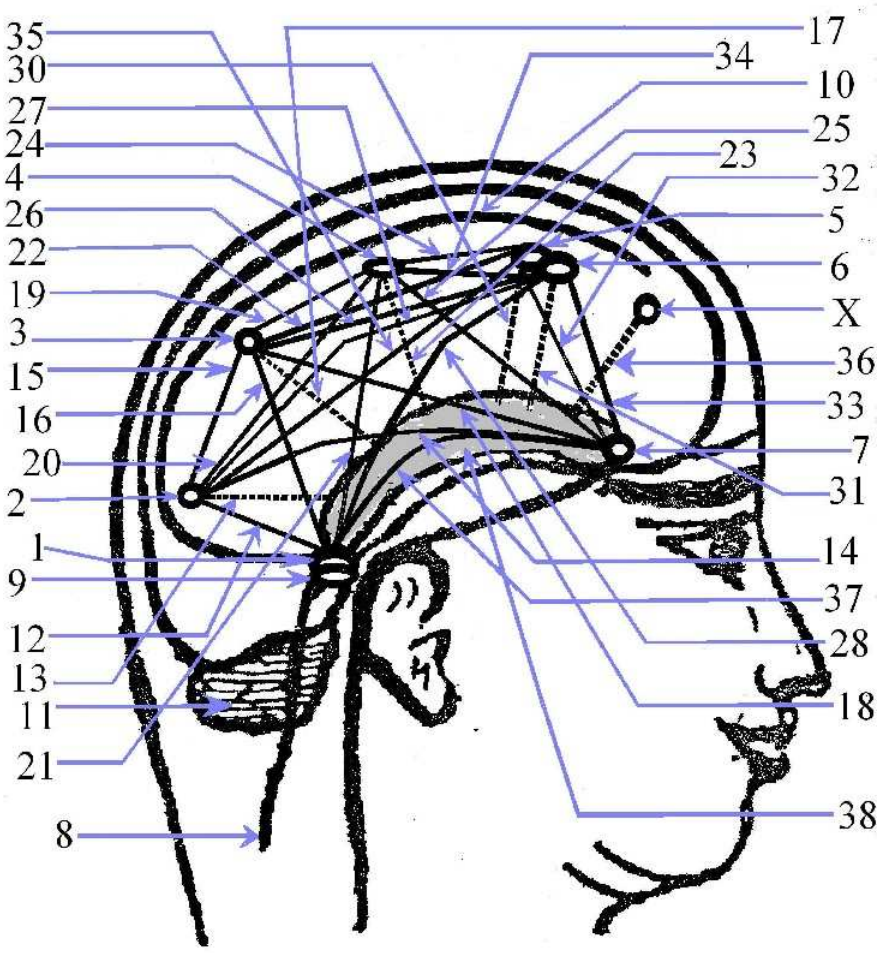

মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্র

৪। শিব কেন্দ্র। ইহা শান্তির কেন্দ্র। আমরা সুষুপ্তি কালে এই কেন্দ্রে থাকি। ইহা ধর্ম্মের কেন্দ্র। এখান হইতে উপনিষদের জ্ঞানধারা আরম্ভ হয়। উপনিষদের জ্ঞানে সব

স্তরের জ্ঞানের কথাই আছে ইহা সত্য; কিন্তু এই কেন্দ্র হইতেই উপনিষদের জ্ঞান আরম্ভ হয়। ইহা ঋষিত্বের কেন্দ্র। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মেই এই স্তরের কোন প্রভাব নাই। এই কেন্দ্রের প্রভাব না থাকিলে ১, ২, ৩ সবই অসুরবাদে ডুবিয়া যাইতে পারে। কাজেই যদি বলা যায় ''ধর্ম্মহীন মানুষ পশুর সমান'' কোনই দোষ হইবে না। এই স্তরের প্রভাবহীন ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে।

৫। জ্ঞানকেন্দ্র। ইহা ৪ চিহ্নিত কেন্দ্রের আরও গভীর স্তর। বিস্তারিত ক্রমবিকাশে দেখুন। বেদ ও জ্ঞান একার্থ বাচক। বেদে সব স্তরের কথাই আছে।

৬। ইহা অব্যক্ত কেন্দ্র। বিস্তারিত ক্রমবিকাশে দ্রষ্টব্য।

৭। গণেশকেন্দ্র। ইহা বুদ্ধির কেন্দ্র। এই বৌদ্ধবাদ অধ্যায়ে এই কেন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইয়াছে।

৮। ইহা শক্তিস্তর। বেদ ও শক্তিবাদীয় সমাজ অধ্যায় দেখুন। বৌদ্ধবাদীরা শক্তিস্তরে জোর দেন নাই। সমাজ বিজ্ঞানের ইহাই নিয়ম যে প্রত্যেকটী স্তরের প্রভাব থাকা চাই। যদি আমরা অন্তরবিকাশের একটী স্তরকেও অমান্য করি তবে সমাজে ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে। যদি সমাজে পৌরোহিত্যবাদ না থাকিত তবে বৌদ্ধবাদীয় যুগ থাকিত না। যদি বৌদ্ধবাদীয় সমাজে সব স্তরের সামঞ্জস্য থাকিত তবে উহার পতন হইত না। বৌদ্ধবাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার পৌরোহিত্যবাদ ও উহাকে ঠ্যাকা দিবার জন্য ভাববাদ যদি* না আসিত তবে এই দেশে ইসলাম আসিত না। ইসলামে যদি মনুষ্যত্ব থাকিত, ইংরেজ আসিত না। যদি তোষণ বাদীয় অহিংসার ভণ্ডামী না হইত তবে পাকিস্তান হইত না। এখন সমাজের মধ্যে নানা মুনির নানা মত চলিয়াছে। আমরা বলি শক্তিশালী সমাজবাদিতায় সমাজ স্থায়িভাবে চলিতে পারে এবং শক্তিবাদী রাষ্ট্রবিধানেই রাষ্ট্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে।

৯। প্রাণ কেন্দ্র। ইহা প্রাণী জগতের কেন্দ্র। পশুদের বিকাশ এখানে সীমাবদ্ধ। মানুষকে এখানে লইয়া যাইবার পথ নাই। কম্যুনিষ্টরা মানব সমাজকে শাসনহীন পশুসমাজ করিতে চায়। ইহা অসম্ভব, উহা আমরা শক্তিবাদে প্রমাণ করিয়াছি। আরও যাঁহারা প্রমাণ চাহেন তাঁহাদিগকে ইতিহাস প্রমাণ দিবে।

১৩। বৌদ্ধবাদ সম্বন্ধে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রায় সবই বলিয়াছি। বুদ্ধের আবির্ভাবের ৫০০ বৎসর পর বৌদ্ধবাদ প্রচারের যুগ আরম্ভ হয়। ইঁহাদের একটা ধারাকে মহাযানী সম্প্রদায় বলে। ইঁহারা বুদ্ধকে অবতার মানেন এবং শক্তির উপাসনা করেন। তিব্বত, চীন, জাপান, রুশ প্রভৃতি দেশে মহাযানীরা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। হীনযানীরা শক্তি উপাসনা করেন না। ইঁহারা বুদ্ধকে অবতার মানেন এবং বৌদ্ধ দার্শনিকতার আলোচনা করেন। লঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্বভারত দ্বীপপুঞ্জে ইঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানেই মহাযানী ও হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছিল। ভারতবর্ষের হীনযানীরা শক্তি উপাসনা ছাড়িয়া দেওয়ার ফলে শক্তিবাদ হারাইয়া ভাববাদীয় অহিংসাবাদে জড়াইয়া দুর্ব্বল হয়। আচার্য্য শঙ্করের পর হিন্দুরা বৈদিক

* প্রকাশকের নিবেদন - ''যদি'' শব্দটি স্বচ্ছতার খাতিরে আমাদের সংযোজন।

গায়ত্রী সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন নাই। তান্ত্রিক শক্তিউপাসনাও বৃথা নিন্দায় লুপ্ত হইতে থাকে। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও অনেক মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া এক হট্টগোল উপাসনার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়া ভারত বেদবাদ ও শক্তিবাদ হারাইয়াছে এবং যবন ও ম্লেচ্ছের পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। ভাববাদের জন্যই বর্ম্মী ও চীনারা মুসলমান ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতেছে এবং ভাববাদের জন্যই আচার্য্য শঙ্করের বিপ্লবের পর মহাযানী ও হীনযানী বৌদ্ধবাদীরা ভারতখণ্ড হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছেন। এখন শক্তিবাদীয় উপাসনা উপাসনাকে সমাজে দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। আমাদের দেশে শক্তিবাদীয় বিপ্লব আসিলে এ দেশ হইতে সব রকম অসুরবাদ মিটিয়া যাইবে এবং পৃথিবীও প্রকৃত শান্তি, সুখ ও মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইবে।

দশম অধ্যায়

হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্ম-সংস্কার ও উহাতে উন্নত বিকাশ বিজ্ঞান

১। হিন্দুধর্ম্মে মানুষকে বিকাশের সর্ব্বোচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পর পর কতকগুলি সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। সংস্কার গুলির কতকগুলি বৈদিক ও কতকগুলি তান্ত্রিক। আমরা প্রথমে বৈদিক সংস্কারগুলির আলোচনা করিব। এই সংস্কারগুলি এবং উহার যথাযথ শিক্ষার সাধনাই হিন্দুধর্ম্ম। এই সংস্কারগুলির এক একটিকে ভিত্তি করিয়া এক এক প্রকার শাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এই সংস্কারগুলির সহিত কিরূপ শিক্ষা ও সাধনা জড়িত আছে সেই সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে আমরা খুব সাধারণ আলোচনা করিব। সংস্কারগুলি সবই শক্তিশালী দৈব অনুষ্ঠান। উহা দ্বারা মনের উপর বিশেষ প্রভাব প্রতিফলিত করান হয়। এই জন্য হিন্দু নরনারীর মুখের উপর যতটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতিবেশী মুসলমান ও খৃষ্টানের মুখে উহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

২। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, সমাবর্ত্তন, বিবাহ এই চৌদ্দটি সংস্কারের পরও আর একটি সংস্কার আছে উহার নাম সন্ন্যাস। বানপ্রস্থ সংস্কার সন্ন্যাসেরই অঙ্গ। এই পনরটি সংস্কার মানুষকে পূর্ণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সংস্কারগুলি বৈদিক সংস্কার। (তান্ত্রিক বিধানেও এসব সংস্কার আছে)। কিভাবে মানুষকে একটি একটি সংস্কার দান করিয়া পূর্ণ করিবে বা সর্ব্বশক্তিমান করিবে ইহার ক্রমধারা যাঁহারা পাঠ করিবেন তাঁহারাও এই সংস্কার বিজ্ঞান হইতে বিপুল মানস শক্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন। হিন্দুরা এই সংস্কারগুলি গ্রহণ করিয়াও আজ এত দুর্ব্বল হইয়া গেল কেন ইহার মীমাংসা আমরা অনেক স্থানেই করিয়াছি। আমরা ইহাই বলিতে পারি হিন্দুরা দুর্ব্বল হয় নাই। পৌরোহিত্যবাদ ও ভাববাদ হিন্দুর এই স্বাভাবিক শক্তিকে সাময়িক চাপিয়া রাখিয়াছে মাত্র। ভাববাদের ও পৌরোহিত্যবাদের উপর যে মুহূর্ত্তে হিন্দুরা পদাঘাত করিবে সেই মুহূর্ত্তে দেখা যাইবে ইহারা মহাশক্তির ক্রোড়েই অবস্থান করিতেছে।

৩। গর্ভাধান মানুষের প্রথম সংস্কার। উন্নত আত্মা যাহাতে গর্ভে জন্ম লয় এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ভাল হয় এই জন্য এই সংস্কারের বিধান। রজঃ ও বীর্য্যের শুদ্ধতা ও পিতামাতার দায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য এই সংস্কারের বিধান আছে।

৪। বিবাহে স্বামীস্ত্রী একত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া যদি সংস্কার বিচার করা হয় তবে বিবাহই প্রথম সংস্কার। গর্ভাধান উহার দ্বিতীয় সংস্কার। আবার সন্তানের ক্রমবিকাশের দিকে যখন মন ফিরাই তখন দেখা যাইবে গর্ভাধানই প্রথম সংস্কার।

প্রত্যেকটি সংস্কারেই এইরূপ দুইমুখী বিকাশবিজ্ঞান ও শক্তিবিজ্ঞান জড়িত। পাঠকগণ দুই দিকেই চিন্তাশক্তি নিয়োজিত করিবেন। পিতামাতার দিকে ও সন্তানের দিকে একই সংস্কার দুইপ্রকার প্রভাব দান করিয়া থাকে।

৫। পৌরোহিত্যবাদ প্রবলরূপ ধারণ করিবার পর আমাদের দেশে কন্যাগণের গায়ত্রী দীক্ষা বন্ধ হয় এবং ব্রহ্মচর্য্য সংস্কারের বয়সে (৮/৯ বৎসর বয়সে) কন্যাগণের বিবাহ দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপ অকাল বিবাহসংস্কারের পর কন্যাগণ পিতামাতার তত্ত্বাবধানে থাকিত এবং প্রথম রজঃ দর্শনের পর তাহাকে আবার আংশিক বিবাহবিধানে বিবাহ দেওয়া হইত। বঙ্গদেশে এই বিবাহকে পুনর্বিবাহ বলে। ইহার বৈদিক নাম গর্ভাধান এবং হিন্দিভাষা-ভাষী দেশে ইহার অপভ্রংশ নাম 'গাবন'।

৬। এখন বাল্যবিবাহ বিধান উঠিয়া গিয়াছে। কাজেই এখন অষ্টম নবম বৎসর বয়সের অনুষ্ঠেয় গায়ত্রী দীক্ষা অপক্ক বিবাহ সংস্কারের আবরণে আর ঢাকা যাইবে না। এই জন্য আমরা শক্তিশালী সমাজ প্রবর্ত্তকগণের জন্য ৮/৯ বৎসর বয়সে গায়ত্রী দীক্ষা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতেছি। এই সময়ে বালকবালিকাদের মন গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয়।

৭। গর্ভাধান সংস্কারের সময় কন্যাগণকে ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষায় দীক্ষিত বালকগণের মত ৫ দিন বা ৭ দিন তীরগৃহে বাসের ব্যবস্থা বঙ্গদেশে ছিল এবং এই সময় কন্যাগণকেও বালকগণের মত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি সবই পালন করিতে হইত। ইহাকে গর্ভাধান সংস্কার না বলিয়া গর্ভাধানের অঙ্গীভূত রজঃসংস্কার বলা কর্ত্তব্য। কন্যাগণের প্রথম রজোদর্শনের সময় ইহা করিতে হয়। অনেকে বয়স্থা কন্যাগণের বিবাহের পর এবং ফুলশয্যানুষ্ঠানের পরও ভ্রান্তিবশে গর্ভাধান সংস্কারের তীরগৃহ অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে। বলা প্রয়োজন ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও নিষ্প্রয়োজন অনুষ্ঠান। এখন ফুলশয্যানুষ্ঠানই গর্ভাধান জানিবেন। সেই সময় বরবধূর রজঃবীর্য্যের শুদ্ধির জন্য কিছু বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ আছে। সেইসব মন্ত্র শিক্ষিত বর বধূরা পদ্ধতি হইতে লিখিয়া লইবে এবং উহার অনুষ্ঠান করিবে। ইহাতে পুরোহিতের খুব প্রয়োজন নাই। এই সব অনুষ্ঠান অশ্লীল মনে হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ মনে করা ভুল, কারণ যাহা নিতান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য উহাকে অশ্লীল মনে করা মূর্খতা সূচক।

৮। মানুষ ভোগসুখের প্রেরণায় বিবাহ বিধানে আকৃষ্ট হয়। এই প্রাকৃতিক আকর্ষণের মূলে থাকে অনাদি শক্তির সৃষ্টি করিবার কৌশল। বিবাহের পূর্ব্বে যৌবনের নেশায় মত্ত মন উহার খবর জানে না। বিবাহের পূর্ব্বে মানুষের মনে থাকে ভোগ সুখের নেশা; কিন্তু গর্ভাধান সংস্কার ইহা স্পষ্ট জানাইয়া দেয়, ইহা ভোগও নহে সুখও নহে; ইহার নাম - ''সৃষ্টির প্রেরণা''। যদি কেহ ভাবিয়া থাকে যে বিবাহ ভোগসুখের অনুষ্ঠান তবে সে উহা নিতান্ত মূর্খতাবশতঃই ভাবিতেছে। শীঘ্রই সে জানিতে পারিবে বিবাহিত জীবনে ভোগ ও সুখ বলিয়া কোনও বাস্তব পদার্থ নাই। যদি ভাবিয়া থাক ইহা সুখের ব্যাপার তবে ইহাও জানিয়া রাখিও, জীবনেও সেই সুখ তুমি দেখিতে পাইবে না। ইহার নাম ''সৃষ্টির প্রেরণা''। এই সুখের চিন্তা সৃষ্টি কারিণী শক্তির একটা ভাঁওতা মাত্র।

৯। বিবাহের মনোবৃত্তি যে কামের ব্যাপার উহা বিবাহ মন্ত্রেই রহিয়াছে; কিন্তু গর্ভাধান সংস্কার উহা ভাঙ্গিয়া দিয়া বরবধূকে জানাইয়া দিল ইহা কামের ব্যাপার নয়, ইহা পবিত্র সৃষ্টির বিধান। কাজেই দেখা যাইতেছে, গর্ভাধান মানুষের মনের উপর একটা নূতন আলো দান করিল। উহা মানুষের মনকে কামের নেশা হইতে কর্ত্তব্যে নিয়োজিত করিল। যাহা ''কাম'' মনে হইতেছিল উহা মোটেই ''কাম'' নহে, উহার নাম ''সৃষ্টি''। কাজেই যাহাতে সুসন্তান লাভ হয় সেই দিকে সকলেরই খেয়াল রাখা কর্ত্তব্য। সন্তান ভাল না হইলে পিতামাতাকে অনেক দুঃখ ও অশান্তি পাইতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে সুসন্তান সুখেরই অঙ্গ। পাঠকগণ, ''গর্ভাধান'' কি ভাবে মানুষের মনকে বদলাইতে সাহায্য করে সেই দিকে চিন্তা করুন।

১০। গর্ভাধান সংস্কার করিলেই কি সুসন্তান সব ক্ষেত্রেই লাভ হইবে? ইহার উত্তর এই যে সুসন্তান হইবার জন্য পিতামাতার স্বাভাবিক মনোবিকাশ এবং সন্তানের গর্ভাধান কালের মনোবৃত্তি বেশী নির্ভর করে। আমরা ইহাই বলিতে পারি, গর্ভাধান সংস্কার মানুষের মনকে কামের নেশা হইতে উন্নত কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইবার একটি দৈব অনুষ্ঠান; পিতামাতার মনোবিকাশে ইহা যে একটা উন্নত সংস্কার ইহাতে একটুকুও সন্দেহ নাই। সুসন্তানলাভের ব্যাপারে কার্য্যক্ষেত্রে ইহা কতটা সাহায্য করিবে সেইটা নির্ভর করে পিতামাতার মন উহা দ্বারা যদি কিছু প্রভাব পাইয়া থাকে, উহার উপর। আমরা ইহাই বলিতে পারি গর্ভাধান বরবধূর মন নূতন ভাবে গড়িতে সাহায্য করে। তাহাদের রজঃ ও বীর্য্য বিশুদ্ধ করিতে সাহায্য করে এবং উহা উন্নত স্তরের আত্মা যাহাতে গর্ভে আসিতে পারে সেইজন্যও সাহায্য করে।

১১। গর্ভাধানকালে যথাবিধি অগ্নি স্থাপন করিয়া উহাকে ''বায়ু'' নাম করিয়া উহাতে আহুতি দিতে হয়। শরীরের বায়ু শুদ্ধি থাকিলে নারীশরীরের রজঃ শুদ্ধি থাকে। যাহারা আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে বায়ু বিকৃতিতেই সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ হইয়া থাকে। উহা শুদ্ধ হইলেই নারী গর্ভ ধারণের উপযুক্ত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক একটী সংস্কারের বিস্তারিত বিজ্ঞান এক একটি শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। বিস্তারিত হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখুন।

১২। কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বিবাহের পর কন্যা পিতামাতার তত্ত্বাবধানে থাকিত। পরে প্রথম রজোদর্শনের পর আংশিক বিবাহবিধানে কন্যার রজঃসংস্কার ও গর্ভাধান সংস্কার একত্র অনুষ্ঠিত হইত। এখন বাল্যবিবাহ উঠিয়া গিয়াছে। রজঃসংস্কার অনুষ্ঠান অবশ্যই পিতামাতা কুমারীগণকে এখনও করাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে রজঃসম্বন্ধীয় রোগের প্রকোপ সাধারণতঃ কম থাকে। বর্ত্তমানকালীন শিক্ষা পদ্ধতি ও বহির্ম্মুখী সভ্যতা বৃদ্ধি হইবার দরুণ এবং রজঃসংস্কার উঠিয়া যাইবার দরুণ স্ত্রীরোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। কাম চিন্তা, যুবকদের সঙ্গে অধিক মিলন ও প্রেম বিষয়ক পুস্তক পাঠদ্বারা জরায়ু স্থিত রজোনিষ্কাশক ধাতুর কার্য্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই জন্য কন্যা ও নারীগণের রজোসম্বন্ধীয় রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে, ক্রমে আরও হইবে। আমরা বাল্য বিবাহ সমর্থন করিনা, কিন্তু কন্যাগণের রজঃসংস্কার ও ব্রহ্মচর্য্য জীবন তাহাদের স্বাস্থ্য ও সমাজের সুখের জন্য একান্ত

প্রয়োজনীয় বিষয় মনে করি। ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শহীন কুমার ও কুমারীজীবন আমাদের সমাজজীবনে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন করিবে ইহার আলোচনা করিবার সময় আমাদের এখনও আসে নাই। শীঘ্রই একদিন আসিবে যেদিন বৈদিক বিধানের দিকে মানুষের চিন্তা ঘুরিয়া যাইবে। রজঃ দর্শনের পূর্ব্বেই ব্রহ্মচর্য্যানুকূল মনের স্থিতি পাইবার জন্য কুমারীগণকে গায়ত্রীদীক্ষা দান করা এবং প্রাথমিক রজো দর্শনের সময় রজোসংস্কার হোম সহ করিয়া দেওয়া এবং গর্ভাধানের অন্যান্য অনুষ্ঠান ফুলশয্যানুষ্ঠানের সময় সম্পন্ন করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক মাসে রজঃ নিঃসরণকালে সংযম ও অন্যান্য নিয়ম (হিন্দুরা সে সব নিয়ম জানে) পালন করিতে হয়। বিশেষ অভ্যাসদ্বারা কামবিষয়ক চিন্তা হইতে মনকে মুক্ত রাখিয়া বায়ুশুদ্ধ রাখিতে হয়, তাহা হইলে রজঃসম্বন্ধীয় রোগ হয় না। মনের শুদ্ধতা পুরুষ হইতে নারীর স্বাস্থ্যের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু। কাজেই নারীর ব্রহ্মচর্য্যের জন্য প্রত্যেকটী শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা নারীরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কামচিন্তা করিলে মাসিক ঋতু অনিয়মিত হইবেই। যাঁহারা এই প্রগতির যুগে অসংযত হইবার জন্য বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা একটু চিন্তাশীল হইবেন। নয়তো স্বাস্থ্য সুখ হারাইবেন।

১৩। পুংসবন। পুংসবন গর্ভে সন্তান আসিবার দ্বিতীয় মাসে বা তৃতীয় মাসে করাইতে হয়। গর্ভে সন্তান আসিলে অনেকে বুঝিতে পারে, আবার অনেকে উহা বুঝিতে পারে না। কাজেই ঠিক সময়ে পুংসবন সংস্কার হওয়া কঠিন। গর্ভস্থ সন্তান যাহাতে বিকলাঙ্গ না হয়, বিশেষ করিয়া নপুংসক না হয়, এই জন্য এই অনুষ্ঠান শক্তিশালী নক্ষত্রযুক্ত দিনে করাইতে হয়। এই জন্য পুংসবনে লতাপাতা, জড়িবুটি ও দ্রব্যগুণের সহায়তা লওয়া হয়। সেই সঙ্গে অগ্নিকে 'চন্দ্র' নামকরণ করিয়া উহাতে আহুতি দিতে হয়। 'চন্দ্র' পিতৃলোকের স্থান। চন্দ্র হইতে আমরা মনের উপাদান লাভ করি। আমাদের খাদ্য ও সবল মন লাভের সমস্ত উপাদান আমরা চন্দ্র কিরণ হইতে পাইয়া থাকি। এই চন্দ্র যে কিরণ বর্ষণ করে উহা দ্বারা বায়ু ও পৃথিবী ভরিয়া যায়। আমরা ও উদ্ভিজ্জাদি সমস্ত জীব সেইচন্দ্র নিঃসৃত অমৃতকণা বায়ু ও খাদ্যের মধ্য দিয়া আহরণ করি। ইহাতেই আমাদের শরীর ও মন পুষ্ট হয়। গর্ভস্থ সন্তানের নপুংসকত্ব বা অঙ্গহীনতা নাশ করিবার জন্য পিতা ও মাতার নিজেদের মধ্যে আহারে বিহারে সাবধান হওয়া ও ক্রোধহীন ব্যবহার রাখা প্রয়োজন। মনে চন্দ্র কিরণঅংশ কম হইলেই মন শীঘ্র ক্রোধিত হয়। তাই চন্দ্র নামকরণ করিয়া এসবের দৈব অনুষ্ঠান ব্যবস্থা আছে। এই সৃষ্টির সঙ্গে চন্দ্র ও চন্দ্রকিরণ কণার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। (ক্রম বিকাশ গ্রন্থে মহত্তত্ত্ব অংশ দেখুন)। চন্দ্রের সঙ্গে মানবের মন, শরীর, কর্ম্ম নিপুণতা ও ভাগ্য কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখে উহার বিস্তারিত বিজ্ঞান বুঝিবার জন্য পাঠকগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করুন। পুংসবন সুস্থ ও সবলকায় সর্ব্বাঙ্গযুক্ত সন্তান লাভের অনুষ্ঠান। ইহা দ্বারা সন্তান ও পিতামাতা দুইই কিরূপ লাভবান হয় এবং অঙ্গহীন সন্তান হইলে দুই দিকেই কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এজন্য চিন্তা করুন।

১৪। সীমন্তোন্নয়ন। ইহা গর্ভের ষষ্ঠ মাসের অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠান। (অনেকে সপ্তম মাসেও ইহা করাইয়া থাকে।) এই সময় গর্ভস্থ শিশুর মনোময় কোষ পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে। কাজেই বরবধূকে এ সময় স্বামীস্ত্রী ভাব ত্যাগ করিয়া পিতামাতার আদর্শ গ্রহণ করিতে

হয়। সন্তানের মনোময় কোষ যাহাতে ভালরূপ পুষ্ট হইয়া উঠে এইজন্য জড়িবুটি, লতাপাতা বা দ্রব্যগুণের সাহায্যও লওয়া হয় এবং অগ্নির 'শিব' নামকরণ করিয়া তাহাতে আহুতি দেওয়া হয়। বরবধূর মন এই সময় ভোগ সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া যাহাতে শিবত্বের আদর্শ গ্রহণ করে এবং বালকের মনের পুষ্টিতে যাহাতে জ্ঞানভাগ পুষ্ট হইতে পারে এই জন্য 'শিব' নামকরণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান করা হয়। পাঠকগণ ক্রমবিকাশ পঞ্চম অধ্যায়ে শিবস্তর পাঠ করিয়া ইহার বিস্তারিত বিজ্ঞান বুঝুন। এ সময় হইতে মা'র কর্ত্তব্য রামায়ণ, মহাভারত, বুদ্ধচরিত্র ও চণ্ডী পাঠ বা শ্রবণ দ্বারা পূর্ব্বপুরুষ ও পূর্ব্বযুগের নারীদের বীরত্ব, ত্যাগ, তেজস্বিতা ও পবিত্রতার কথা আলোচনা করা। ইহাতে গর্ভস্থ সন্তানের মন ভালভাবে গড়িবার সুযোগ পায়। (সন্তান গর্ভে আসিবার পর হইতে ঐ সব ইতিহাস ও তথ্যপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য)। সীমন্তোন্নয়নে বধূর মাতৃবেশ গ্রহণ করিবার জন্য তাহার সিন্দুর তুলিয়া দেওয়া হয়। এসময় বধূগণকে প্রসূতি বিজ্ঞান ও শিশুপালন বিজ্ঞানও শিক্ষা করিতে হয়। গর্ভাধানে শিশুর শরীর গঠনের আদি উপাদান রজঃ ও বীর্য্যশুদ্ধি, পুংসবনে বিকলাঙ্গ না হয় এবং পূর্ণাবয়ব যাহাতে প্রাপ্ত হয় এবং মন যাহাতে ঠিকমত গড়িয়া উঠে এজন্য চেষ্টা করা হয়। গর্ভাবস্থায় সন্তানের এই তিনটী সংস্কারের বিজ্ঞান কত গভীর ও কত দূরদর্শী ইহা ভাবিলে বৈদিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের নিকট মাথা নত হইয়া যায়।

১৫। জাতকর্ম্ম। গর্ভস্থ সন্তানের সংস্কারদান আলোচিত হইল। এবার ভূমিস্থ সন্তানের ক্রম বিকাশের সংস্কারক্রম আলোচিত হইতেছে। সন্তান জন্মগ্রহণের পর পিতামাতার সহিত তাহার যে প্রথম সম্বন্ধ উহারই প্রাথমিক অনুষ্ঠানের নাম "জাতকর্ম্ম"। সন্তানের পালন, পোষণ, রক্ষণ, বিদ্যাদান, কর্ম্মদান এসব অত্যন্ত পবিত্র সমাজ ধর্ম্ম। সন্তানও যাহাতে পিতামাতার উপর কর্ত্তব্যসম্পন্ন হয় এজন্য পিতামাতারই অবহিত হইতে হয়। এই পৃথিবীর মধ্যে এখনও হিন্দুসন্তানরাই পিতামাতার উপর বেশী শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্য সম্পন্ন। ইহার কারণ হিন্দুদের সেইরূপ শিক্ষা ও সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। অন্য কোন ধর্ম্মেই ইহা নাই। বর্ত্তমান বহির্মুখী পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পিতামাতা ও সন্তান সকলেরই মধ্যে এই কর্ত্তব্য বিনিময় যথেষ্ট শিথিল হইয়া যাইতেছে। স্নেহ, মমতা, মোহ, কাম এসব মানুষের নিম্নমুখী স্বাভাবিক মনের ধর্ম্ম। কিন্তু পিতৃসেবা, মাতৃসেবা, সমাজসেবা এসব ঊর্দ্ধমুখী মনোধর্ম্মের ব্যাপার। উন্নত সংস্কার ও ধর্ম্মশিক্ষা ভিন্ন উহা লাভ হয় না। অনেক হিন্দু এখন অত্যন্ত মূর্খতা বশতঃ পুত্রকন্যাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎসাহ দেন না। অনেকে বহির্মুখী, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক অহিন্দু ধর্ম্মকে উচ্চ বিজ্ঞানসম্মত হিন্দুধর্ম্মের সহিত একস্তরে মানিয়া বালকগণের নিকট আলোচনা করিয়া বালক বালিকাদের মন আরও বহির্ম্মুখী হইবার পথ করিয়া দিতেছেন। ইহার দ্বারা হিন্দুরা অত্যন্ত ভুল করিতেছেন। কোন্ অহিন্দু ধর্ম্মের অবলম্বীরা পিতৃমাতৃ সেবক হয়? এই কারণেই অনেক স্থলে হিন্দু সন্তানরাও উহাদেরই মতন স্ত্রী ও শ্বশুর মন্দির সেবক হইয়া অসহায় পিতামাতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে ইতস্ততঃ করে না। সন্তান মাত্রই পিতামাতার সেবাযত্ন করিবে। ইহা হিন্দু সমাজ ধর্ম্মের অত্যন্ত পবিত্র অঙ্গ।

১৬। জন্মগ্রহণের ঠিক সময় রাখিয়া কুষ্ঠী প্রস্তুত করিবে। অনেকে বেশী সন্তান হইলে বা কন্যা সন্তান হইলে তাচ্ছিল্য বশতঃ জন্ম সময়টা পর্য্যন্তও রাখে না। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। কুষ্ঠী করিতে যে সামান্য অর্থ ব্যয় হয় উহা ব্যয় করিবার ক্ষমতা যদি না থাকে তবে জন্ম সময় ও স্থান লিখিয়া রাখিবে।

১৭। পৌরোহিত্য বাদীদের ভয়ে অনেকে কুষ্ঠী করিতে চায় না। তাহারা অদ্ভুত দৈবভয় দেখাইয়া খরচের ফর্দ্দ করিবে ও চাল কলার ছ্যাঁদা বাঁধিবে ইহাতে অনেকে শঙ্কিত হয়। পৌরোহিত্য বাদিতার বাঁচিয়া থাকিবার তিনটী প্রধান অবলম্বন আছে। (১) জ্যোতিষ, (২) পূজা হোমাদি করা, (৩) তীর্থে পাণ্ডামি করা। সমস্তটা প্রাচীন সংস্কৃতি ইহারা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। যতক্ষণ শক্তিবাদীরা এসব বৃত্তি আয়ত্ত করিয়া লইবে না ততক্ষণ নানা রূপ অসুবিধা সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। আমরা প্রত্যেক হিন্দু সমাজ হইতেই জ্যোতিষ, পুরোহিত ও পাণ্ডার বৃত্তি গ্রহণ করিতে বলিতেছি। ইহা দ্বারাই এই শ্রেণীর অত্যাচার হইতে সমাজ রক্ষা পাইতে পারে। ভবিষ্যৎ জানিবার একমাত্র উপায় জ্যোতিষ। ইহা একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৈবী বিধান। পুরোহিত সম্প্রদায় অতি সত্বর ব্রহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করুন এবং সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা উচ্চ করুন।

১৮। জাতকর্ম্মে অগ্নিকে ''প্রগলভ'' নামকরণ করিয়া উহাতে আহুতি দান করিতে হয়। প্রগলভ অর্থে ''প্রতিভা''। শিশু পিতামাতার উচ্চাকাঙ্ক্ষার বস্তু এবং বালকের ভবিষ্যৎ প্রতিভাশালী হইবে, ইহাই এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য।

১৯। নামকরণ। জন্ম হইতে একাদশদিনে নামকরণ করিতে হয়। কুষ্ঠির প্রতিভা ও কুষ্ঠি বিধানে আদ্যাক্ষর মিলাইয়া নাম রাখিতে হয়। নামকরণ দ্বারা বালককে দৈব জগতের সহিত সংযোগ করান হয়। রাশি নক্ষত্র গ্রহাদি দৈবজগতের বিভূতি। তিনটি সংস্কার বালক মাতৃগর্ভে লাভ করিবার পর চতুর্থ সংস্কারে বালক পিতামাতার কোলে আসিল। এবার পঞ্চমে নামকরণ। ইহা দ্বারা বালককে দৈবজগতের সঙ্গে সংযোগ করান হইল। নামকরণের পর সকলেরই ধারণা হয় যে বালকের ইহা নাম এবং এই নামে এইরূপ প্রতিভা বুঝাইয়া থাকে। কর্ম্মক্ষেত্রে এই ধারণা যতটুকুই কাজে আসুক না কেন ইহা যে দৈব ধারণা ইহাতে সন্দেহ নাই। কন্যাদের দেবীসংযুক্ত নাম রাখিবে। বিবাহকালীন বর বধূ, বালকের এই সংস্কারের পর 'অমুকের' পিতামাতায় পরিণত হইল। নামকরণে অগ্নির 'পার্থিব' নামকরণ করিয়া আহুতি দিতে হয়। পৃথিবীতে যাহাতে বালক বেশীদিন থাকে অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হয় এজন্য 'পার্থিব' নামকরণ; অর্থাৎ আত্মা এবার জীবে পরিণত হইল। অনেকে নামের পদবীতে গোত্র উল্লেখ করেন। যেমন অমুক ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র বা অলম্বায়ণ ইত্যাদি। ইহা খুব ভাল নিয়ম।

২০। নিষ্ক্রমণ। জন্মের চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণ সংস্কার করিতে হয়। নিষ্ক্রমণ অর্থে গৃহ হইতে বাহির করা। কন্যাগণ সব সময় আবরণের মধ্যে রক্ষণীয় বলিয়া কন্যাগণের জন্য এই সংস্কারের বিধান নাই। নিষ্ক্রমণের পর বালক, কেবল পিতা মাতারই রহিল না, এবার সে পল্লীবাসী ও আত্মীয়দেরও একজন হইল। বালককে কেবল পিতা মাতাই পালন করেন না পল্লীবাসী ও আত্মীয়রা তাহাকে পালনের উৎসাহ লয়। পরবর্ত্তী জীবনে বালক কেবল পিতার নিকটই কর্ত্তব্যশীল হইবে না, পল্লীবাসী ও আত্মীয়দের জন্যও তাহার

কর্ত্তব্য আছে। এই সংস্কারে কেবল সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয়। সূর্য্য তেজ, বীর্য্য, প্রতিভা, আরোগ্য, পুষ্টি ও কর্ম্মশক্তির কেন্দ্র স্বরূপ। বালকে এইসব বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হইলেই সে পিতামাতা, আত্মীয় ও গ্রামবাসীর উপর কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইতে পারে।

২১। অন্নপ্রাশন। জন্মের ষষ্ঠমাসে করণীয় সংস্কার। বালকের বাক্‌পটুতা, অন্নপ্রাচুর্য্য, দ্রুতগতি, আয়ুবৃদ্ধি ও ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তির জন্য এই সংস্কার করিতে হয়। বালকে এসব গুণ প্রতিফলিত করিবার জন্য খাদ্যশক্তি, দ্রব্যশক্তি, মন্ত্রশক্তির আশ্রয় লওয়া হয় ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। অন্নপ্রাশনে বালকের সংযোগের ক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি করা হইল। শরীর ধারণের জন্য অন্নবস্ত্র কেবল গ্রামে জন্মে না। ইহার সঙ্গে দেশের ও পৃথিবীর শস্যোৎপাদন ও আদান প্রদান জড়িত। এই অন্নের জন্য এই পৃথিবী ব্যাপী কি ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। পুরাকাল হইতে অমৃতের (অন্নই অমৃত, ইহা চন্দ্রকণা হইতে আসিয়া থাকে) ভাগ লইয়া দেবাসুরের টানাটানি চলিয়াছে। পাঠক দেখিতেছেন বালকের অন্নপ্রাশন সংস্কার বালককে দেশের অর্থনীতির সহিত জড়িত করিয়া দিবার সংস্কার। ভবিষ্যতে বালক এসব সমস্যায় জড়িত হইতে বাধ্য। পিতা, মাতা, সমাজ, গ্রাম, দেশ, সূর্য্য, চন্দ্র সকলেই বালককে গড়িয়া তোলে। ভবিষ্যৎ জীবনে বালক ইহারই যদি ঠিক ঠিক প্রতিদানে তৎপর না হয় তবে জানিতে হইবে সে ঠিক ভাবে গঠিত বা সংস্কৃত হয় নাই। ভবিষ্যতের সমস্ত উচ্চ প্রতিভার প্রত্যেকটি বীজ বালককে ৬ মাসের মধ্যে দেওয়া হইয়া থাকে। অন্নপ্রাশনে অগ্নির 'শুচি' নামকরণ করিয়া উহাতে আহুতি দিতে হয়। বিশুদ্ধভাবে অন্ন প্রস্তুত করিবে ও রক্ষা করিবে। এইরূপ অন্নকে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিয়মে আহার করিবে; কারণ ইহা শরীর, মন, জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি পুষ্টির একমাত্র অবলম্বন। অন্নকে ব্রহ্ম জানিবে। এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুদের অন্নপ্রস্তুত প্রণালী ও ভোজন প্রণালী নিখুঁত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

২২। চূড়াকরণ। তিন বৎসর বয়সে এই সংস্কার দান করিতে হয়। শরীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান কোথায় উহা স্থির করিয়া দিবার জন্য ''চূড়াকরণ'' করিতে হয়। ঈশ্বর কোথায় এ কথার উত্তর মাত্র হিন্দুরা জানে। মস্তিষ্কের মধ্যে বিষ্ণুকেন্দ্রকে ভিত্তি করিয়া ব্যাপক ঈশ্বরের অনুভূতি হয়। চূড়াকরণে সেই স্থানটা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার সংস্কার। ঈশ্বর বা আত্মা ব্যাপক এবং সেই ব্যাপক সত্ত্বার অনুভূতির কেন্দ্র মস্তিষ্কেই বিদ্যমান। সমস্ত অহিন্দু ধর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তকগণ ঈশ্বরকে আকাশের কোন না কোন স্থলে লট্‌কাইয়াছেন। মস্তিষ্কের ঐ স্থানটি যাহাতে বালকের খুব প্রিয় হয় এই জন্য মস্তিষ্কের বিষ্ণুকেন্দ্রের সম সূত্র স্থানে শিখা রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। ''চূড়া'' অর্থে সর্ব্বউচ্চস্থান। ''করণ'' অর্থে স্থিরীকরণ। অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান স্থিরীকরণ।

২৩। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পৌরোহিত্য বাদ ও ভাব বাদ আমাদের হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞান, সাধনা ও শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে দিনের পর দিন অন্ধ করিয়া দিতেছে। সুপ্রাচীন বৈদিক সংস্কারের মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব, জ্ঞান, প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির সমস্ত উপাদান নিহিত। আসুন আমরা ভাব বাদ ও পৌরোহিত্য বাদের ছোব্‌রার ধর্ম্মে পদাঘাত করিয়া সেই প্রাচীন ধর্ম্মের মর্ম্মোদ্ঘাটনে, প্রচারে ও স্থাপনে শক্তি অনুসারে আত্মনিয়োগ করি। ইহাদ্বারা আমাদের সমাজ ও পৃথিবী সকলই লাভবান হইবে।

২৪। চূড়াকরণে অগ্নির 'সত্য' নাম করণ করিয়া উহাতে আহুতি দিতে হয়। এই সৃষ্টিবিজ্ঞানের উপাদানে ও নিমিত্তে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব ভিন্ন আর কি সত্য আছে? কাজেই চূড়াকরণে তাহার অস্তিত্ব নির্ণয়ে 'সত্য' নামকরণে আহুতি দিবার বিধান। ''ঈশ্বর আকাশে থাকেন, তিনি মাটির পুতুল করিয়া উহাতে 'ফু' দিয়া মানব সৃষ্টি করেন, তিনি মানুষ বিশেষ,'' ইত্যাদি মিথ্যা কথা বালকগণকে শিক্ষা দিও না। তাহাকে শিক্ষা দাও, তিনি আকাশের মত ব্যাপক ও সর্ব্বনিয়ামক। তিনি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যস্থানে থাকিয়া আমাদিগকে পরিচালনা করেন। এই সৃষ্টি তাঁহার প্রাকৃতিক বিধান। তাঁহার পথে পৌঁছিবার জন্য যে সব জ্ঞানের ভূমি অতিক্রম করিতে হয় সেই সব স্তরকে বুঝাইবার জন্য হিন্দুরা মূর্ত্তিকলার আশ্রয় লইয়াছে। তুমি মূর্ত্তিতে সেই সব জ্ঞানের স্তর বুঝিতে চেষ্টা কর। (ক্রমবিকাশের ৯ অধ্যায়ে কোন মূর্ত্তিতে জ্ঞানের কোন স্তর, উহা বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝানো হইয়াছে)। সত্য ও যোগের অবলম্বন দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। পূজা, জপ, মন্ত্র, যজ্ঞাদি সেই যোগ বিদ্যারই অঙ্গ স্বরূপ। এই সৃষ্টি তাঁহারই প্রাকৃতিক বিধানে আপনিই হইতেছে ও লয় হইতেছে, যোগবলে এই নিয়মও জানা যায়।

২৫। কর্ণবেধ। ইহা চূড়া করণেরই অন্তর্ভুক্ত একটু অগ্রবর্ত্তী সংস্কার। কর্ণবেধ অর্থে ''সদুপদেশ দীক্ষা''। কাণে কাণে ব্যাপক ঈশ্বরোপদেশের প্রথম দীক্ষাই কর্ণবেধ। ব্যাপক ঈশ্বরীয় শক্তি সম্বন্ধীয় কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র কাণে শুনাইতে হয় - ইহাই 'কর্ণবেধ'। কর্ণবেধ কালে কাণ ফুটাইয়া দিবার প্রথা আছে। ইহা কেবল ঈশ্বরোপদেশ দেওয়া হইয়াছে, উহা নিদর্শনের জন্য। ৩ বৎসর বয়সের সময়ই বালকের সৃষ্টিতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও প্রকৃতির রহস্য জানিবার ইচ্ছা প্রস্ফুটিত হয়। কর্ণবেধ সেই অনুসন্ধিৎসা মিটাইবার প্রথম অনুষ্ঠান। ঈশ্বর সর্ব্বত্র এবং উহার অনুভূতির কেন্দ্র মস্তিষ্কস্থিত বিষ্ণুকেন্দ্রে বিদ্যমান। এ সময় বালককে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ভাববাদ ও মিথ্যা বিশ্বাসবাদ সম্মত ঈশ্বরের ধারণা দিবেনা। যুক্তিবাদ সম্মত বেদ প্রতিপাদ্য ব্যাপক ঈশ্বর ও সৃষ্টিতত্ত্বের কথা শিক্ষা দিবে।

২৬। একটি বালককে তিন বৎসর বয়সে যে সব শিক্ষার সংস্কার দিতে হয় পরবর্ত্তী জীবনের সাধনায় উহাই পুষ্ট করা হয়। শক্তিবাদীগণকে আমরা বলিয়া রাখিতেছি যে সংস্কারগুলি শিক্ষা ও বিকাশের এক একটী অধ্যায়। যে সময় উহা দেওয়া হয় সে সময় হইতে উহার আরম্ভ বুঝিতে হইবে। উহার পুষ্টির জন্য পরবর্ত্তী সংস্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিতেই হইবে। ইহা ভিন্নও সমস্ত জীবনই যে এ সব সংস্কারের কর্ম্মক্ষেত্র ইহাও বুঝিতে হইবে। বিকাশের পথে সমস্ত জীবনের জীবনযুদ্ধে যে সব জ্ঞান ও শক্তির প্রয়োজন উহার সব বীজই বাল্যকালে বপন করিতে হয় এবং বাল্যকালে উহার ক্ষেত্র হইয়া যায়। প্রত্যেকটি সংস্কার সম্বন্ধেই এই কথা জানিতে হইবে। ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা একান্তই অসম্ভব।

২৭। গর্ভে আসিবার সময় হইতে কি ভাবে একটী মানুষ বিকশিত হইতে থাকিবে সেইজন্য ধারাবাহিক সংস্কারক্রম সেই প্রাচীন কালেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আধুনিক জড়বাদিরা জানে আত্মা বলিয়া কোন পদার্থই নাই। তাহাদের মতে শরীরই সব। কিন্তু ইহা অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত সত্য যে, যে শিশুকে তুমি আজ একটি কচি শিশু মনে

করিতেছ সে মোটেই কচি নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সে যে যুবক ও বৃদ্ধ ছিল ইহা অতি সাধারণ অনুসন্ধানেও জানা যায়। একটি শিশু কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে যে সব ইসারা ও চেষ্টা দেখায় তাহাতে তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে যে সে একেবারে বাক্য ও ভাবহীন শিশু নহে। তাহার মধ্যস্থিত আত্মাটি কেবল শরীর যন্ত্রটির অপুষ্টতার জন্যই কথা বলিতে পারেনা। শরীর মধ্যস্থিত মন অংশের কর্ম্মস্থল ঠিক ঠিক পুষ্ট হয় নাই বলিয়াই তাহাতে যুবা-ধর্ম্ম এখনও ফোটে নাই। কিন্তু জানিয়া রাখিও তাহার ভিতরে আত্মাটিতে এই সব শক্তির উপাদানই বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি তুমি একটু লক্ষ্য কর তবে সবই পাইবে। একটি বালককে তুমি কম বুদ্ধিমান বলিলে সে নিজেকে অপমানিত মনে করিবে। তাহার ধারণা সে যে কোন বয়স্থ লোকের সমকক্ষ।

২৮। বিদ্যারম্ভ। পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ সংস্কার দান করিতে হয়। বিদ্যারম্ভ বালকের জ্ঞান জগতে প্রবেশের প্রথম সোপান। এতদিন ছিল শোনা কথায় জ্ঞান লাভ; এবার নিজেকে সব পড়িতে ও লিখিতে হইবে। বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়িতে হইলে উহার জন্য অক্ষর জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। বালকের দায়িত্ব এবার অন্যপথে প্রবাহিত হইল। সেও যে একদিন পিতা, শিক্ষক ও কর্ম্মী হইবে। তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে, শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাকে সেজন্য যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। বিদ্যারম্ভ উহারই প্রাথমিক সূত্রপাত। অ, আ ইত্যাদি ১৬টি স্বর এবং ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ৩৪টি ব্যঞ্জন বর্ণ ও সমষ্টিতে ৫০টি বর্ণমালা মূর্ত্তিই জ্ঞানশক্তি বা সরস্বতী (সরস্বতী ধ্যান দেখ)। এই ৫০টি মাতৃকাবর্ণের উপাসনাই জ্ঞানাভ্যাস জানিতে হইবে। এই জ্ঞানপ্রতীকই 'বেদ' এবং বেদমাতা সরস্বতী। এইখান হইতেই বেদ বিদ্যা প্রথম আরম্ভ হইল। 'ওঁ' এই বেদ বীজ সহ অ, আ ইত্যাদি সমগ্র বর্ণমালা অতি পবিত্রভাবে স্পষ্ট উচ্চারণ সহ বিদ্যার্থীকে শ্রবণ করাইতে হয় ও লিখাইতে হয়। বঙ্গদেশে স্বরে 'অ', স্বরে 'আ' ইত্যাদি অযৌক্তিক ভাবে পড়াইবার বিধান আছে। ঐ ভাবে না পড়াইয়া অ আ ইত্যাদি ক্রমে হ্রস্ব দীর্ঘ বিধিতে উচ্চারণ করাইবে। ক, খ আদি ব্যঞ্জন বর্ণ গুলিকেও যথাযথ স্থানে উচ্চারণ করিয়া বালককে শিক্ষা দিবে। ইহাই জ্ঞানদীক্ষা। ধ্বনিগুলি জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের প্রতীক (ক্রমবিকাশ দেখুন)। (বঙ্গভাষাতে হ্রস্ব দীর্ঘ বিধিতে উচ্চারণ প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। ইহাতে ভাষা অত্যন্ত সতেজ হয়। ইহা মানুষকে তেজস্বী করে। বঙ্গভাষা যেরূপ শক্তিশালী ভাষা তাহাতে পড়াইবার বিধান একটু সংস্কার করিলে ইহা আরো শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।) ৫০টী বর্ণই অখণ্ড বেদমূর্ত্তি। ইহাই জ্ঞানপ্রতীক সরস্বতী। হিন্দুদের বেদ যে মানুষের কল্পিত নহে এবং ইহা যে অনাদি জ্ঞান জগতেরই জ্ঞান, ইহার প্রধান প্রমাণ হিন্দু ভাষায় এই ৫০টি বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক সংস্থান। পৃথিবীর কোন দেশের ভাষারই এই শক্তি নাই। অন্যান্য ভাষায় 'ইসলাম' লিখিলাম কি 'এসলাম' লিখিলাম উহা বুঝা যায় না। আবার 'Put' (পুট্) কি পাট্ লিখিলাম উহাও বুঝিবার উপায় নাই। ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিতে হইলে উহাদিগকে অন্য ভাষার সাহায্য লইতে হইবে অথবা আরো জটিল কাণ্ডী অভিধান লিখিতে হইবে। আজকাল ভাষাকে সহজ করিবার আন্দোলন দেখা দিয়াছে। পাকিস্তানে বঙ্গভাষাকে বিকৃত করিয়া হ্রস্বদীর্ঘ হীন ও স্থানস্পর্শহীন করিবারও চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা মূর্খগণকে বলি - মানুষ জ্ঞানপ্রধান

শ্রেষ্ঠ জীব। তাহার ভাষাকে হাম্বারবের মত সহজ করিবার চেষ্টার মূলে বেশী বর্ব্বরতা মানুষের জন্য অশোভনীয়। এমনি তো বঙ্গভাষা সংস্কৃতের বিকৃত ভাষা; আমরা মোহবশে ইহাকে যতই উচ্চ মনে করিনা কেন, এই ভাষা সংস্কৃত পর্য্যায়ে আসিলেই ইহা শক্তিশালী হইবে। ইহাকে বিকৃত করিয়া সহজ করিয়া লাভ নাই। যখন একটা জাতির সভ্যতা উচ্চ হয় তখন তাহার ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গী উচ্চ হয়। গরুরা একই হাম্বারবে সব ভাব প্রকাশ করে বলিয়া মানুষের ভাষাকে হাম্বারবে পরিণত করিয়া প্রগতি ও বর্ব্বরতা ফলাইতে হইবে ইহা উচ্চকথা নয়। উচ্চ সভ্যতা ও উচ্চ মনোবিকাশের ভিত্তি যাহারা পৃথিবীতে গড়ে নাই, যাহারা উচ্চ সভ্যতার উপাদান ভাঙ্গিয়া কেবল সঙ্ঘ বদ্ধতার বলে আসুরিকতা স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে আমরা শক্তিবাদের ভিত্তিতে না দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতে চাই না। কারণ দুর্ব্বলবাদ হইতে অসুরবাদ শ্রেষ্ঠ। অসুরবাদীরা দুর্ব্বল বাদীদের কথা শুনিবে কেন?

২৯। বিদ্যারম্ভের সময় ২৬টি অক্ষরের ইংরাজি বর্ণমালা বা ৩৭টী অক্ষরের সমষ্টি আরবি বর্ণমালাকে ভিত্তি করিয়া বিদ্যারম্ভ করাইবে না। অধিক কি বিদ্যারম্ভের পরও অন্ততঃ একবৎসর কাল বালককে এইসব খণ্ড বর্ণমালা শিখাইবে না। বর্ণদীক্ষাকে শক্তিশালী জ্ঞানদীক্ষা জানিবে। খণ্ড বর্ণমালার দীক্ষা দিলে মানুষ যুক্তিবাদী হয় না এবং বুদ্ধি অত্যন্ত জড়তা প্রাপ্ত হয় এবং ইহার প্রভাবে মানুষের মস্তিষ্কের জ্ঞানকেন্দ্রগুলি (ক্রম বিকাশ দ্রষ্টব্য) যথাযথ ভাবে ফুটিতে পারে না। ইহার প্রভাবে মানুষ স্বার্থবাদী অথবা ভাববাদী হইতে প্রভাবিত হয়। স্বার্থ ও ভাববাদ দুইই মানুষের অল্পবুদ্ধি ও অল্পবিকাশের লক্ষণ। এমনিই ত জীব সহজে স্বার্থ ও নীচতার প্রভাবে পড়িয়া যায়, তাহার উপর যদি তাহার জ্ঞান দীক্ষা যথাযথভাবে না হয় এবং তাহাকে জ্ঞানের অনুকূলে গড়িতে চেষ্টা না করা হয় তবে মানুষের সমাজে বিশেষ অকল্যাণ করা হইয়া থাকে। মানুষের কণ্ঠে যতগুলি ধ্বনি উচ্চারিত হইতে পারে ইংরাজী ও আরবী বর্ণমালায় উহার খণ্ডন হইয়াছে। আবার যেরূপ বিজ্ঞানে বর্ণমালাগুলি সাজানো প্রয়োজন ইংরাজী ও আরবী বর্ণমালায় সেই ভাবে সাজানো হয় নাই। বলা প্রয়োজন ইহার প্রভাবে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা খণ্ডিত হয়। ঐ বর্ণমালাগুলি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও অল্পজ্ঞানী পণ্ডিতগণদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উহাদের উচ্চারণ ভঙ্গী আরো মূর্খতাব্যঞ্জক। যাহাকে বলা কর্ত্তব্য 'অ' উহাকে বলা হয় 'অলিফ'। যাহাকে বলা কর্ত্তব্য 'ব' উহাকে বলা হয় 'বি'। আমরা এসব বর্ণমালা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ আলোচনা স্থগিত রাখিলাম।

৩০। পাখী, পশু ও মানুষের ঘণ্টিকা যন্ত্রের সৃষ্টির পার্থক্য আছে। এই পৃথিবীতে কণ্ঠ ধ্বনিতে ঐ ৫০টীর বেশী ধ্বনি নাই। (আরবী বর্ণমালাতে ও ইংরেজী বর্ণমালাতে কতগুলি বিকৃত ধ্বনি আছে, ঐগুলিকে কেহ যেন মৌলিক ধ্বনি মনে না করেন। যেমন 'কাফ্'; ইহা 'ক' ধ্বনিরই বিকৃত ধ্বনি। 'ক' এর উচ্চারণ স্থান কণ্ঠে। কিন্তু 'ক' কে যদি আমরা মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারণ করি তবে 'কাফ্' উচ্চারণ হয়। এইরূপ আরও কতগুলি বিকৃত স্বর আছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা ব্যর্থ মনে করি।) এই ৫০টির সবগুলি মানুষ উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু পশু পাখীরা ইহাদের সবগুলি উচ্চারণ করিতে

পারেনা। সৃষ্টির কলা অনুসারে এক একস্তরের জীবে এই ৫০টী বর্ণমালার ৫, ৭ টি বা ৮, ১০ টি হয়তো কোন কোন জীবের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তাহাদের কণ্ঠধ্বনিতে অত্যন্ত কম ও বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী ধ্বনি বাজিবার সংস্থান হেতু, একস্তরের জীব অন্যস্তরের জীবের সহিত কথা বলিতে পারে না। গরু, মহিষ, কাক, চিল, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির কণ্ঠধ্বনিতে এই ৫০টি বর্ণের অতি সামান্য কয়েকটি মাত্র উচ্চারিত হয়। এই জন্য ইহারা পরস্পরের সহিত কথা বলিতে পারে না। এবং আমাদের সঙ্গেও বলিতে পারে না। যদি কখনও সুযোগ হয় তবে এ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়া কোন জীবের কথায় কয়টি ধ্বনি আছে তাহা দেখাইব। যাঁহারা মানুষের বর্ণমালা প্রস্তুত করিতে যাইয়া মানুষের ঘণ্টিকা যন্ত্রের শক্তির খর্ব্বতা সূচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অদূরদর্শিতাও ইহাতে প্রদর্শিত হইবে।

৩১। বিদ্যারম্ভের সময় যথাবিধি স্বর ব্যঞ্জনদীক্ষা ও উচ্চারণ আয়ত্ত হইবার পর এবং যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর প্রয়োজন বোধে বালকগণকে আরবী ও ইংরেজী বর্ণমালা শিখাইতে পারিবে।

৩২। বিদ্যারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই দাঁতুন করা, শৌচ, শৌচান্তে হাতে মাটী দেওয়া, আহারের পর মুখ ধোয়া, শরীর ও বস্ত্রাদিকে পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধ রাখা ও পরিশ্রমসাধ্য ছোট ছোট কাজের অভ্যাস করাইবে। মলত্যাগের পর ঠিক ঠিক হাতে মাটি দেয় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এই সময় জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার অভ্যাস ঠিক ঠিক আয়ত্ত না করাইলে পরবর্ত্তী জীবনে উহা আয়ত্ত হইতে অনেক বেগ পাইতে হয়। দাঁতামাজা, শৌচ ও আচমনাদি ঠিকমত না হইলে বালক অনেক কঠিন রোগাক্রান্ত হইতে পারে। অনেকের বাড়ীতে ছারপোকার আড্ডা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা শিশুদের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। ইহাদের দ্বারা রক্ত মোক্ষণে বালকের রক্তদুষ্টি (পাঁচড়া, জ্বর ইত্যাদি) রোগ হইতে পারে এবং মস্তিষ্কপুষ্টির উপাদান মোক্ষিত হয় বলিয়া মস্তিষ্কও পুষ্ট হইতে পারেনা। বালকদের মলদ্বারে ও নাকে মুখে মাছি বসিলে তাহাদের কৃমি রোগ হয়। সে বিষয়ে নিজেরা সাবধান হইবে ও বালককে সাবধান করিয়া দিবে। যে কোন স্থানে ছারপোকা জন্মে সেখানে ডি.ডি.টী. পাউডার লাগাইলে এক বৎসরেও ছারপোকা হয় না। বালকদের মাথায় উকুন হইলেও মস্তিষ্ক ও শরীর পুষ্টির বহু মূল্যবান উপাদান মোক্ষিত হয়। বালকদের অসুস্থতা কেবল বালকদের জন্য কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকারক নহে, উহা পিতামাতারও বিশেষ উদ্বেগ ও কষ্টের কারণ।

৩৩। উপনয়ন। আট বৎসর বয়সেই বালকের উপনয়ন দান করিবে, ১৬ বৎসর এই সংস্কারের শেষ বয়স। এই বয়স অতিক্রম হইলে ব্রাত্য হোম করিতে হয়।

৩৪। কুষ্ঠির যোগাযোগ দেখিয়া যদি বুঝিতে পারা যায় যে বালক বিশেষ ব্রহ্মবীর্য্য সম্পন্ন মহাত্মার লক্ষণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইলে উপনয়ন পাঁচবৎসর বয়সে দিবে। যদি দেখা যায় বিশেষ ক্ষত্রিয় বীরোচিত ঈশ্বরভাবসম্পন্ন লক্ষণ আছে তবে উপনয়ন ৬ বৎসরে দিবে। যদি দেখা যায় বিশেষ বাণিজ্য নিপুণ হইবার লক্ষণ তবে উপনয়ন ৭ বৎসরে দিবে।

৩৫। উপনয়ন বালককে শক্তিজগতের সহিত সংযোগ দান করিবার সংস্কার। ঈশ্বরীয় জগৎ ও শক্তি জগতের যে ভেদ উহা বলা যাইতেছে। চূড়াকরণে ঈশ্বরীয় জগৎ এবং

উপনয়নে শক্তিজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন জানিতে হইবে। মানুষের জ্ঞান যখন নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে থাকে সেইসময় একই ব্যাপক ঈশ্বরের অনেকগুলি অনুভূতির স্তর অতিক্রম করিতে হয়। এই স্তর গুলির নাম ঈশ্বরীয় জগৎ, পূর্ব্বে এই সব স্তরগুলিকেই আমরা গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু আদি স্তর বলিয়াছি। এইসব স্তরে সৃষ্টিবিজ্ঞানের ঠিক ঠিক মীমাংসা করা যায় না। (কোরান ও বাইবেলে যে রূপ সৃষ্টি তত্ত্বের সন্ধান আছে উহার সহিত কোন স্তরের ঈশ্বরীয় ভূমিরই সম্বন্ধ নাই। উহারা অনেকটা হিন্দু পুরাণের যমকথার মত অত্যন্ত কাল্পনিক ঈশ্বর ও সৃষ্টি কথা মাত্র।) সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানভূমি হইতেই করা যায়। ইহারই নাম শক্তিস্তর। গায়ত্রীদীক্ষা এই স্তরের জ্ঞানের প্রাথমিক দীক্ষা মাত্র। জ্ঞানভূমির বিভিন্নতায় আমাদের ৬খানি দর্শন শাস্ত্র আছে। হিন্দুদের আরও অনেকগুলি উচ্চস্তরের দর্শনশাস্ত্র আছে, সেই গুলিও এসব স্তরের কোন না কোনটির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। সর্ব্বশেষ জ্ঞান ভূমি শক্তিজগৎ। ইহার অন্য নাম জ্ঞানের তুরীয় ভূমি। ইহার লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার জন্য গায়ত্রী দীক্ষা।

৩৬। উপ = নিকট, নয়ন = জ্ঞান। উপনয়ন = জ্ঞানে উপনীত হও বা জ্ঞানের দিকে চল। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা। এই সময় বালক উপবীত ধারণ করেন। ইহা অত্যন্ত মহান ও পবিত্র ব্রত। ইহা মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম সংস্কার। ইহাকে এত উচ্চদৃষ্টিতে দেখিবার বিধান যে সদ্য সংস্কৃত কচি বালককে একজন বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রণাম করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। যেখানে বিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠান সহ এই সংস্কার দেওয়া হয় সেখানে কাছে থাকিয়া না দেখিলে এই সংস্কারের পবিত্রতা হৃদয়াঙ্গম করা অসম্ভব।

৩৭। উপনয়নে অগ্নিকে 'সমুদ্ভব' নামকরণ করিয়া আহুতি দিতে হয়। ইহার অর্থ যাহা হইতে সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে অর্থাৎ ''অনাদি মহাশক্তি''; ''গায়ত্রী'' সেই ''মহাশক্তি''। ইহা মহাশক্তির দীক্ষা। কি বিজ্ঞানে এই সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে সেই বিজ্ঞানকে জানাই শক্তিকে জানা। উহা জানিবার ইহা প্রাথমিক দীক্ষা মাত্র। ইহা সফল করিতে হইলে সাধনা ও যোগাভ্যাসে আত্ম নিয়োগ করিতে হইবে। এই গায়ত্রীকে জানিবার জন্যই যোগ, তন্ত্র, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি।

৩৮। আমরা কন্যাগণের জন্যও গায়ত্রী দীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছি। ইহা বর্ত্তমান সময় বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বত্র অহিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিরা নিজ নিজ উপাসনার বিধানে নিজেদের কন্যাগণকে সংস্কৃত করিয়া পাঠাইতেছে। হিন্দুরাও আর পৌরোহিত্যবাদের সর্ব্বনাশকর অনুষ্ঠানে জড়াইয়া থাকিতে পারে না। ইহার ফলে হিন্দুকন্যাগণে ধর্ম্মসংস্কার প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না। ইহার জন্য সমাজ নানা প্রকারেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মেয়েদের মধ্যে এইজন্য ভাববাদধর্ম্ম ও পৌরোহিত্যবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে এই জন্য নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বালক বালিকাগণে যাহাতে শক্তিশালী ধর্ম্ম সংস্কার শক্তিশালী ভিত্তি লয় এই জন্য গায়ত্রী দীক্ষা, বেদপাঠ, রামায়ণ মহাভারত পাঠ প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। বিলাতেও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদপাঠ প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

৩৯। গায়ত্রীসংস্কার লাভ করিবার পর যাহারা শক্তি উপাসনা করে না, তাহাদিগকে পাষণ্ডই বলিতে হইবে। এই শক্তিশালী সংস্কারের পর বালকগণকে যজ্ঞোপবীত ধারণ

করিতে হয়। ইহারই অন্য নাম ব্রহ্মসূত্র। মূলাধার হইতে মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মনাড়ীই ব্রহ্মসূত্র। উপবীত হইলে উহারই ধ্যান করিতে হইবে। এই সূত্রে মহর্ষিগণের নামে গ্রন্থিদান করিতে হয়। উহার অর্থ ঋষিগণের চেষ্টা, উদারতা, তেজস্বিতা, মহান চিন্তাশীলতা ও সরল জীবনের নীতি মানিয়া লওয়া হইল। উপবীতটি ৯টি সূত্রের সমষ্টি। ইহার অর্থ মেরুদণ্ডস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর কয়েকটি প্রধান শাখা নাড়ী। এইসব নাড়ীগুলির অনুভূতিই ব্রহ্মজ্ঞানের পথে বিভিন্ন স্তর। ক্রমে সেইসব স্তর অতিক্রম করিতে হইবে। আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত বালকবালিকাকে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে বলিতেছি। অভিভাবক বা শিক্ষকগণ যদি ইহাদের সংস্কারের ব্যবস্থা না করিয়া দেন তবে বালক এবং যুবকগণ নিজেরা গায়ত্রী জপ, উপবীত ধারণ ও ১০ দিন অশৌচ বিধানের নীতি নিজেরাই নিজেদের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়া লইবে। ইহাতে কোন দোষ ত হইবে না অধিকন্তু ইহা মহান পুণ্যের কাজ হইবে। ইহাতে সমাজ সংস্কার দ্রুত হইবে এবং মনের শক্তি বিকশিত হইবে।

৪০। বেদারম্ভ। উপনয়নের পর বালক ঋষিসুলভ সরল ও পবিত্র বেশ ধারণ করিয়া গুরুগৃহে গমন করে। এখন হইতে পিতামাতা বালকের উপর আর কোনই কর্ত্তৃত্ব করেন না। এখনও ষ্টেট যদি চেষ্টা করে তবে স্কুল কলেজ 'গুরুগৃহ' ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা কঠিন হইবে না। আচার্য্য বালককে বেদারম্ভ করাইতেন। এখন স্কুল কলেজগুলিকে বেদারম্ভের স্থানে পরিণত করিতে হইবে। গর্ভাধান হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত শিশুর বিকাশক্রম ও উহার সংস্কার ক্রম সম্বন্ধে চিন্তা করুন এবং জন্ম হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত বালকের সংস্কার ক্রমের বিজ্ঞান বুঝুন। এ পর্য্যন্ত বালক পিতামাতার অধীন, বেদারম্ভে সে গুরুর অধীন হইল। কাজেই সংস্কারগুলি যে কেবল বালকেরই 'ক্রম বিকাশ' সংস্কার নহে এবং ইহা পিতামাতারও মনোবিকাশসংস্কার ইহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন।

৪১। স্কুল কলেজগুলিতে বৈদেশিক চিন্তার ভিত্তিতে শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইবার দরুণ এবং দেশের নেতারা বৈদেশিক চিন্তার ভিত্তিতে আন্দোলন করিবার কারণে আমাদের বালকগণ নিজেদের কৃষ্টিজ্ঞান হইতে অত্যন্ত পেছনে পড়িয়া যাইতেছে এবং ভাববাদীদের শিকারে পরিণত হইতেছে। নেতারা হিন্দু চিন্তা ত্যাগ করিবার দরুণ এবং ধর্ম্ম প্রচারক সন্ন্যাসীর দল ভাব বাদী হইবার কারণে যে সব সমস্যা সমাজে দেখা দিয়াছে সে জন্য শক্তিশালী চিন্তায় চিন্তাশীল নেতার আবির্ভাব প্রয়োজন।

৪২। সমাবর্ত্তন। বিদ্যালাভের পর বালককে গৃহে পাঠাইবার সংস্কারের নাম সমাবর্ত্তন। ইহাও আচার্য্যের তত্ত্বাবধানেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় প্রত্যেক উচ্চশিক্ষা নিকেতনে (কলেজে) সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া থাকে। আমরা সেই সব অনুষ্ঠানকে বৈদিক বিধানে করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বালককে বিদ্যাদান অন্তে যে সব উপদেশ দান করিয়া গৃহে পাঠানো হইয়া থাকে সেই সব উপদেশগুলি খুবই সুন্দর এবং স্মরণীয় বিষয়। কি করিয়া বালক গৃহস্থ আশ্রমে নিজের দেশের, সমাজের ও ধর্ম্মের কর্ত্তব্য পালন করিবে বৈদিক সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানে সেই সব উপদেশ মন্ত্রাকারে রহিয়াছে। সেই সময় মন্ত্রপূত জলে অভিষেক করিয়া বালককে শক্তিশালী করিবারও বিধান রহিয়াছে। পাঠকগণ পদ্ধতি দেখুন। ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব।

৪৩। বিবাহ। ইহা যৌবনসংস্কার। একদিকে বালকগণ গুরুর আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাভ্যাস করিবে অন্যদিকে কন্যাও পিতার তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যালাভ করিবে। ইহার পর যাহাদের ইচ্ছা তাহারা বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। অথবা আরও উন্নত স্তরের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যোগাভ্যাস, সাধনা ও তপস্যার জীবনযাপন লক্ষ্যে কৌমার্য্য জীবন গ্রহণ করিবে। এখন সর্ব্বত্র কন্যাপাঠশালা ও ছাত্রী আবাস স্থাপিত হইয়াছে, সেই সব স্থানেও গায়ত্রী দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪৪। বিবাহ সম্বন্ধে মোটামুটী আমরা গর্ভাধান সংস্কারে বলিয়াছি। বিবাহের সময়কার বরবধূর মনোবৃত্তি এবং সন্তানকে বিবাহ দিবার সময়কার মনোবৃত্তিতে কিরূপ পার্থক্য ইহা এখন বুঝা সহজ হইবে।

৪৫। বিবাহে অগ্নিকে 'যোজক' নামকরণ করিয়া আহুতি দিতে হয়। যোজক অর্থে দুইটী প্রাণকে এক করা বুঝিতে হইবে। এই একীকরণ সিদ্ধ হইলেই সন্তানের জন্ম হয়, আবার এই একীকরণ সিদ্ধ হইলেই উভয়ের জীবন সুখময় হয়। স্বামী যদি স্ত্রীকে এবং স্ত্রী যদি স্বামীকে একটা বিশেষ স্থাবর সম্পত্তি মনে করিয়া বেশী বশে রাখিতে চায় তাহা হইলে এই যোজক বিজ্ঞান ফাঁসিয়া যায় এবং সংসারজীবন নিতান্ত নরক তুল্য হয়। আবার স্বামী বা স্ত্রী যদি এই যোজক বিজ্ঞানের সূত্র হারাইয়া ফেলিয়া উচ্ছৃঙ্খল হয় তাহা হইলেও 'যোজক' বিজ্ঞান নষ্ট হয় ও সাংসারিক জীবন দুঃখময় হয়। পুরুষ মস্তিষ্ক ও জ্ঞানশক্তি প্রধান জীব এবং নারী হৃদয় ও স্নেহশক্তি প্রধান জীব। উভয়ের চিন্তাবিজ্ঞান একরূপ হইতে পারে না। কিন্তু এই দুইয়ের সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে, কিছুতেই জীবন শান্তি ও সুখময় হয়না। যুক্তিজ্ঞান প্রধান পুরুষ যুক্তিজ্ঞানহীনা হৃদয়ধর্ম্মপুষ্টা নারী দ্বারা এই বিবাহিত জীবনে অনেক স্থানেই লাঞ্ছিত হইতে দেখা যায়। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় নারীরা যুক্তিবাদী পুরুষের মনকে কুৎসিত সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রসূত নীচতা দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করে এবং ফলে নারীরা পুরুষের ভালবাসাময় জীবনের মধুময় জীবন হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে আরম্ভ করে। নারীদের কল্যাণের জন্য একথা বলাই প্রয়োজন যে ইহার প্রতিক্রিয়াতে অধিকাংশ স্থলেই নারীরা যেটুকু হারায় সেটুকু আর পায় না। পুরুষের যৌবন সুলভ হৃদয়ের ধর্ম্ম নারীর দুর্ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে কম হইতে থাকে এবং সে ক্রমেই যুক্তিবাদের নীতিতে শক্ত হইতে থাকে। ফলে নারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নির এই নাম করণের বিজ্ঞানটুকু পুরুষ তো মনে রাখিবেই নারীকে ইহা আরো বেশী মনে রাখা প্রয়োজন। প্রগতিপন্থিনী নারীরা নিজেরা স্বাধীন জীবন পছন্দ করে কিন্তু পুরুষের জন্য উহা তাহাদের অসহ্য। নরনারী মনোবিজ্ঞানের জটীল আলোচনা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসম্ভব। আমরা এই মাত্র উপদেশ দিতে পারি যে তোমরা যে সুখের জন্য সংসারে প্রবেশ করিয়াছ উহার ছায়া মাত্র সংসারে বিদ্যমান। উভয়েই উভয়কে শক্তিশালী পন্থায় সাধনা করিতে উৎসাহিত করিও। ইহাতেই কতকটা সামঞ্জস্য সম্ভব হইবে। বিবাহে যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গ স্বরূপ 'সপ্ত পদীগমন' নামক একটী অনুষ্ঠান আছে। মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ী পথ আছে, এই পথে স্বামী স্ত্রীকে সাহায্য করিবে এবং স্ত্রী

স্বামীকে সাহায্য করিবে। বিবাহ ইহারই বন্ধন জানিবে। কাজেই বিবাহ যে বিকাশেরই বন্ধন ইহা মনে রাখিবে। ব্রহ্মনাড়ীর ৭টী চক্রই সপ্তপদী।

৪৬। বর্ত্তমান সময় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের বিবাহ খরচা অত্যন্ত অন্যায় ভাবে বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। ইহা হিন্দুদের সমাজের একটা প্রকাণ্ড সমাজসমস্যা। কঠোর দণ্ডবিধান প্রস্তুত করিয়া ইহার শীঘ্র প্রতিবিধান করিতে হইবে। ভাগ্যবতী, সুশীলা, শিক্ষিতা ও স্বাস্থ্যবতী কন্যা এবং স্বাস্থ্যবান, কর্ম্মঠ, যুক্তিবাদী, কর্ম্মী ও উপার্জ্জনক্ষম বরের মিলনই শ্রেষ্ঠ বিবাহ জানিবে। কৌলিন্য প্রথা ও পণ প্রথা আমাদের সমাজে পৌরোহিত্য চিন্তার অত্যন্ত ঘৃণিত ও কুৎসিত কুফল। দেখা যায় বিবাহ আদি ব্যাপারে কুলীন পক্ষেই বেশী হীন স্বার্থ ও নীচতার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না। সুখের বিষয় পৌরোহিত্য চিন্তা অনগ্রবর্ত্তী সমাজে কম প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের বিবাহ বেশ অল্পব্যয়ে সম্পন্ন হয়। পুরোহিতরা নিজেদের সুবিধা, দক্ষিণা ও প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখিবার জন্য সমাজের প্রত্যেক শাখা প্রশাখাতে বিদ্বেষ ও ছোটবড় সংস্কার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। এসব করিবার জন্য মিথ্যা ইতিহাস লিখিতেও ইহারা পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহার ফলে মধ্যযুগে বঙ্গদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাগণের বিবাহ পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া গিয়াছিল।

৪৭। বিবাহে পণের দাবী বা গহনার দাবী কখনও করিবে না। পিতা স্বেচ্ছায় কন্যাকে গহনা, সম্পত্তি ও ধন দিতে পারিবেন। সেই ধন সম্পূর্ণরূপে মেয়ের সম্পত্তি হইবে। ইহা মেয়ের অসময়ে কাজে আসিবে বলিয়া সঞ্চিত থাকিবে। এই ধন শ্বশুর বা স্বামী কেহ নষ্ট করিলে মেয়ে তাহা নালিশ করিয়া আদায় করিতে পারিবে। পিতা এমনভাবেও সম্পত্তি দিতে পারিবেন যাহাতে নিঃসন্তান কন্যার মৃত্যু হইলে উহা পিতৃপক্ষের সম্পত্তি হইবে। বিবাহে অধিক ব্যয় হইলে সমাজ গরীব হয়। প্রত্যেকে পিতামাতা বা শ্বশুরের ধনের আশা ত্যাগ করিয়া নিজেদের কর্ম্মশক্তি ও ভাগ্যের উপর নির্ভর করিবে। সমাজকে শক্তিশালী ও বড় করিয়া গড়িবার জন্য নিজেদের যথেষ্ট উচ্চ অন্তঃকরণ থাকা চাই ও আত্মবিশ্বাসও থাকা চাই। আর্থিক ব্যাপারে হিসাব করিয়া সাবধানে চলা কর্ত্তব্য। লেন্ দেন্ লইয়া আত্মীয়দের সঙ্গে কখনও নীচতা করিবে না। ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। বিবাহ সমাজ বিধানের সব চেয়ে সুখের অনুষ্ঠান। ইহার লক্ষ্য প্রেম ও মিলন।

৪৮। বিবাহে অনেক অবান্তর অনুষ্ঠান ও স্ত্রী আচার প্রবেশ করিয়াছে। বলা বাহুল্য ঐ সব বিবাহ বিধানের কোনই অঙ্গ নহে। উহা আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান মাত্র। বিবাহের আসল খরচা মাত্র আড়াই ছটাক ঘৃত। ইহার মূল্য সংগৃহীত হইলেই বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারিবে। এই ঘৃত দ্বারা হোম হইবে এবং বৈদিক মন্ত্রে বিবাহের অন্যান্য সব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। দেখা গিয়াছে একটি বিবাহ এক টাকা খরচায় অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারিবে। যে সব পাপাত্মা বিবাহে পণ গ্রহণ করে শাস্ত্রে তাহাদিগকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিবার জন্য রাজাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে (দেখ - মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র, উঃ ১১, ৮৪)

৪৯। বিবাহ কম খরচায় সম্পন্ন করিতেই হইবে। অবুঝ সমাজ যদি ইহাতে গোলমাল করিবে মনে কর তবে রেজিষ্ট্রেশন করিয়া লইবে ও বৈদিক বিধানে বিবাহানুষ্ঠান ও যজ্ঞ করিয়া লইবে। বিবাহের কন্যাদান ও কন্যাগ্রহণের অতিরিক্ত কোনও প্রকারের লেনদেনের প্রথাই সমাজ ধর্ম্মের বিরোধী। কারণ উহা দ্বারা সমাজের নীচতা, দুঃখ, পীড়ন ও অশান্তি

বৃদ্ধি হইয়াছে। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সমর্থন করিবে। বিধবা কালে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারিণীগণকে সম্মান করিবে। এইরূপ আত্মীয়গণকে সম্মানে অন্ন বস্ত্র-দ্বারা রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। অনাত্মীয় হইলেও ইহাদিগকে মাতার মত শ্রদ্ধা ও পালনের ব্যবস্থা করিবে। নারীরাও কুমারী, বিবাহিতা, পুনর্বিবাহিতা বা বিধবা সর্ব্বাবস্থায় কর্ম্মনিপুণা ও সুস্থ থাকিতে চেষ্টা করিবে।

৫০। গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত যতগুলি সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে, উহার যে কোন একটি সংস্কারই এক আনা হইতে চার আনা খরচায় সম্পন্ন হইতে পারে। সংস্কার পদ্ধতি নামক পুস্তকে বিস্তারিত বলা হইবে। সংস্কার বিধানগুলি সম্বন্ধে এতটা প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয় যে যে কোন হিন্দু উহার প্রয়োগ ও প্রক্রিয়া জ্ঞাত হইতে পারে।

৫০। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস সংস্কার। গৃহস্থাশ্রমে ৫০ বৎসর অতিবাহিত করিবার পর উপযুক্ত পুত্রের হস্তে গৃহস্থাশ্রমের ভার প্রদান করিয়া বানপ্রস্থ (বনে প্রস্থান) আশ্রমের সংস্কার লইতে হয়। উপনয়নে যে শক্তিদীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য গৃহস্থাশ্রম হইতেই চেষ্টা করিতে হয়। বানপ্রস্থ আশ্রম উহার আনুষ্ঠানিক জীবন। এখানে সেই অনুষ্ঠান পূর্ণ হইবার পর সন্ন্যাস। সন্ন্যাসে যে হোম হয় সেই অগ্নিকে 'ব্রহ্ম' নামকরণ করিয়া আহুতি দিতে হয়। উপনয়নের অগ্নি 'সমুদ্ভব' অর্থাৎ মহাশক্তির দীক্ষা, সন্ন্যাসে 'ব্রহ্মদীক্ষা'। হিন্দুদের জন্য এই দুইটি ভেদ বোঝা কঠিন নহে। ক্রম বিকাশে এবার মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানের স্তরে আসিয়া উপনীত হইল। ইহাই বেদ বিহিত সমস্ত সংস্কার। প্রত্যেক সংস্কারের পরই দেখিতে পাওয়া যায় যে বালকের স্বভাবের একটা বেশ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। শিক্ষাদ্বারা উহা পুষ্ট করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসসংস্কার মানুষকে আদি যুগের সরল, প্রাকৃতিক জীবনযাপী ঋষিস্তরের মানুষরূপে প্রতিষ্ঠা দান করে।

তান্ত্রিক সংস্কার

৫২। বৈদিক সংস্কার সম্বন্ধে বলা হইল। এবার তান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে বলা হইবে। বৈদিক উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া সন্ন্যাস অবস্থা লাভ করিবার জন্য যে সব সাধনা ও যোগাভ্যাস অবলম্বন করিতে হয় উহাদের সংস্কারের একটা ক্রম আছে। এইগুলির নাম তান্ত্রিক সংস্কার। তন্ত্র মতে গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত সব সংস্কারেরই বিধান আছে; কিন্তু বৈদিক বিধানে এসব সংস্কার থাকা হেতু আমরা এসবে তান্ত্রিক বিধানের কোন প্রয়োজন দেখি না। বৈদিক উপনয়নের পর হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত জ্ঞান ভূমিগুলি অতিক্রম করিবার জন্য যেসব সংস্কার তন্ত্রে আছে আমরা সেইগুলির সংক্ষেপ পরিচয় দিব।

৫৩। বৈদিক চিন্তা ও তান্ত্রিক চিন্তা, এই দুইটি চিন্তা ভারত খণ্ডের অতি প্রাচীন চিন্তা। এই দুইটি চিন্তার প্রসার এই পৃথিবীতে কিভাবে কতটা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে

পাঠকগণের ধারণা একটু স্পষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইংরেজ মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা করিয়া আমাদের দৃষ্টিকোণ নিতান্তই সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

৫৪। বৈদিক চিন্তার আবিষ্কারকগণ ঋষি, ইহার প্রধান প্রবর্ত্তক রাজর্ষি স্বয়ম্ভূব মনু। তিনি নিজের রাজত্ব মধ্যে এই চিন্তার প্রবর্ত্তন করেন। এই চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য চার বর্ণ ও চার আশ্রম। স্বয়ম্ভূব মনুর রাজ্যের বাহিরে এই চিন্তার প্রসার বিশেষ হয় নাই। মহারাজ স্বয়ম্ভূবের এই চিন্তা প্রবর্ত্তনে যাঁহারা সহায়ক হইয়াছিলেন তাঁহারাও ঋষি ছিলেন। স্বয়ম্ভূবের রাজত্বের বাহিরে স্থিত দেশগুলি ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া অভিহিত হইত। ক্রমে ম্লেচ্ছ সীমার প্রসারতা বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বকালে মনুর রাজ্যসীমা আরও বিস্তৃত ছিল। পরবর্ত্তী যুগে এই চিন্তার কোঠাবন্দী কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট হাত হইয়াছিল। পরে উহা পৌরোহিত্যবাদীদের কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। যাহার প্রভাবে আমরা আজ এতটা দূরদৃষ্টিহীন ও পদানত হইয়াছি।

৫৫। তান্ত্রিক চিন্তারও আবিষ্কারকগণ ঋষি ছিলেন। ইহা যে বৈদিক জ্ঞানকে (থিওরীকে) সাধনায় (প্রাকটীস্এ) পরিবর্ত্তন করার কৌশল মাত্র ইহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজ স্বয়ম্ভূব প্রভৃতি মনুগণ ও রাজর্ষিগণও এই চিন্তায় চিন্তাশীল ছিলেন। এই চিন্তার প্রসার মহারাজ স্বয়ম্ভূবের রাজ্য সীমা অতিক্রম করিয়া বহু দূরদূরান্তরে প্রচলিত হইয়াছিল। উহার প্রসারতায় ঋষি, মনু, রাজা, যোগী, সাধক সকলেই সহায়ক ছিলেন। ইহাতে বর্ণ ধর্ম্মের স্থান নাই। ইহার আশ্রমধর্ম্মে যেরূপ সন্ন্যাসবাদ উহাও বৈদিক আদর্শ বাদের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। এই চিন্তার সঙ্গে গীতা নির্দ্দিষ্ট পুরুষোত্তমবাদ বেশী সম্বন্ধ রাখে। গীতায় গুণানুসারে বর্ণধর্ম্ম ও সেই কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আজীবন সমাজ সেবা ও শরীর যাত্রার উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের যেরূপ বিধান ব্রহ্মণ্যবাদে আছে, গীতার পুরুষোত্তমবাদ উহার সমর্থন করে নাই। ইহা চির কর্ম্মবাদিতার উপর বেশী জোর দিয়াছে, যদিও বর্ণাশ্রমকে ইহা অমান্য করে নাই। তান্ত্রিক সাধনায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ ও নারী সকলেরই প্রবেশ ছিল। ইহার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে ইহাতে পৌরোহিত্য বাদীদের কোনই হাত ছিল না। সমগ্র এসিয়া খণ্ডে এই চিন্তার প্রসার ছিল। আফ্রিকাও এই চিন্তারই কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। ইহার বিস্তৃতি পূর্ব্বদিকে ক্রমে মার্কিন দেশেও হইয়াছিল। তন্ত্র মতে সমগ্র পৃথিবীকে তিন ক্রান্তা বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। উহার প্রত্যেক ক্রান্তায় ৬৪ খানা করিয়া তন্ত্র প্রচলিত ছিল। এইরূপ প্রমাণ শক্তিমঙ্গল তন্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। তান্ত্রিক চিন্তা যদি বৈদিক চিন্তার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া একত্রে প্রসার লাভ করিতে পারিত তবে হিন্দুধর্ম্মকে আমরা আজ সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত দেখিতে পাইতাম। খৃষ্টবাদ ও ইস্লাম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্মত এই হিন্দু চিন্তাকে পৃথিবীর বহু স্থান হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। বৈদিক ও তান্ত্রিক চিন্তাকে পাশাপাশি রাখিয়া হিন্দুরা একটি শক্তিশালী অভিযান চালাইলে আগামী কয়েকশত বৎসরের মধ্যে যুক্তিহীন বিশ্বাসবাদ নামধারী ধর্ম্মগুলি এই পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। হিন্দুর তীর্থ-মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি হইতে ইহার অনুকূলে আইন প্রস্তুত করিয়া এই মহান কার্য্যের জন্য যথেষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা হিন্দু মহাসভাকে অনুরোধ করিতেছি। হিন্দুর সমাজধর্ম্ম বেদকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। কিন্তু হিন্দুর অধ্যাত্ম ধর্ম্মের ভিত্তি বেদ হইলেও উহার সাধন ভাগ

বেশীটা তন্ত্রে ও যোগেই স্থান পাইয়াছে। বেদকে ত্যাগ করিয়া যোগ ও তন্ত্রে সমাজধর্ম্মের কোন ভাল ভিত্তি নাই, যাহার জন্য বেদের শক্তিশালী সামাজিক জীবনের ভিত্তিহীন হিন্দুরা অনেক স্থানে ইস্‌লাম ও খৃষ্টবাদীদের আক্রমণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

৫৬। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের পথে এসব পাঁচটি উচ্চজ্ঞান, ধর্ম্ম ও শক্তিভূমি। হিন্দুশাস্ত্রে এসব স্তরকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যে কোন প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে গেলে দেখিতে পাইবেন পঞ্চায়তন সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আছে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব বা যে কোন শক্তি মন্দিরে পঞ্চায়তন সগুণ ব্রহ্মের মূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন বিধানে স্থান পাইয়াছে, দেখা যায়।

৫৭। হিন্দুধর্ম্মের উপাসনা বিজ্ঞানকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। একটি বিধানের নাম পঞ্চ তাত্ত্বিক বিজ্ঞান এবং অন্যটির নাম ত্রিগুণ তত্ত্ববিজ্ঞান। মানুষ ক্রমবিকাশের পথে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বাধিক্যে কিরূপ স্বভাব ও মন লাভ করে সে সম্বন্ধে তন্ত্রাদি শাস্ত্রে বিশদ আলোচনা আছে। আমরা 'ক্রম বিকাশে' বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বাধিক্যে মানুষ যেরূপ স্বভাব, মন ও শক্তি লাভ করে উহার বিশুদ্ধ আলোচনা করিয়াছি। ত্রিগুণ তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া সন্ধ্যোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ক্ষিতি অপ আদি পঞ্চতত্ত্বের ভিত্তিতে পঞ্চ সগুণ ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মন্দিরে এই শেষোক্ত বিজ্ঞানে সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। বলা প্রয়োজন এ সব বিভাগ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুষ্ঠান মাত্র।

৫৮। মূর্ত্তির নাম শুনিলে অনেকেই আজকাল আতঙ্কিত হইয়া থাকে। আমরা একথা বহুবার বলিয়াছি মূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান, কর্ম্ম ও অনুভূতিকে বুঝাইবার এক একটী কৌশল মাত্র। ভাষায় এবং দার্শনিকতায় উহা বুঝানো যত কষ্টসাধ্য মূর্ত্তিদ্বারা উহা বুঝানো তত কষ্টসাধ্য হয় না। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন হিন্দু মন্দিরগুলি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের কেন্দ্রমাত্র। অনুভূতিতে প্রত্যেকটী সগুণ ব্রহ্মের অনুভূতিই ব্যাপক। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের সিঁড়ি ত্যাগ করিয়া সোজা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় ব্রতী হইতে চাহেন শাস্ত্রে তাঁহাদের জন্যও পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই পথেও এই পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞান-ভূমি ও ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতত্ত্বের লয় ভূমি অতিক্রম করা ভিন্ন পথ নাই। ত্রিগুণতত্ত্বের উপাসনার নামই গায়ত্রী উপাসনা। ইহার অন্য নাম সন্ধ্যোপাসনা। উপনয়নে এই উপাসনা আরম্ভ হয়।

৫৯। রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ প্রকৃতির এই তিনগুণ। এই তিন গুণ যে স্তরে সাম্যাবস্থায় থাকে উহার নাম তুরীয়া শক্তি। গায়ত্রী উপাসনায় ত্রিগুণের উপাসনা হয় এবং তুরীয়া শক্তির উপাসনায় প্রবেশ করিবার জন্য তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। তন্ত্র বেদেরই অগ্রবর্ত্তী জ্ঞান। (বিস্তারিত দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে দেখুন; বেদের এই সূক্তগুলি চণ্ডী পাঠের অঙ্গরূপে বিদ্যমান।)

৬০। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া মহাশক্তির তিন প্রকারের শক্তি কণা জগতে পরিবেশিত হইয়া থাকে। উপবীত বালককে এই জন্য সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রাথমিক শক্তি উপাসনায় ব্রতী করান হইয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসুর মনের খোরাক দিবার মত স্থান এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসম্ভব। তবুও সংক্ষেপে এই শক্তিকণারহস্য উদ্‌ঘাটন না করিলে চলিবে না। সূর্য্য পৃথিবী সংযোগে প্রাতঃকালে সৃষ্টিকারিণী (রজঃ) শক্তি কণা, মধ্যাহ্নে (১০টার পর ১২টা

পর্য্যন্ত) পালনী বা পুষ্টিকারিণী সূক্ষ্ম কণা এবং সায়ংকালে ধ্বংসকারিণী শক্তির সূক্ষ্মকণা সূর্য্যজ্যোতির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। জীব ও জগৎ সেই কণা আহরণ করিয়া শরীর ও মনকে পুষ্ট করে। দেখিতে পাইবেন সকালে সূর্য্যের জ্যোতি যেখানে পতিত হয় না, সেই খানে কোন শস্যই ভাল ফলে না। আবার যেখানে কেবলই সায়ংকালীন সূর্য্যজ্যোতি পতিত হয় সেখানে কিছুই ফলে না। কোন বৃহৎ বৃক্ষের ছায়া সকাল ৯টা পর্য্যন্ত যতটা স্থানকে আবরণ দিয়া রাখে সেখানে একটীও রবিশস্য জন্মিবে না। বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি সম্পন্ন দুই একটী ঔষধি গাছ ভিন্ন কোন গাছই সেখানে জন্মে না। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী এই শক্তিকণাকে জানাই গায়ত্রী জ্ঞান। ব্রহ্মসূত্রে আছে - জন্মাদ্যস্য যতঃ = যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয় (তিনিই ব্রহ্ম)। গায়ত্রী উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা। এইজন্য এই দীক্ষার নাম ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া।

৬১। তুরীয়া শক্তির উপাসনার প্রধান সময় মধ্য রাত্রি। ইহার অন্য নাম মহাসন্ধ্যোপাসনা। সূর্য্যজ্যোতির আলোর অংশ পৃথিবীর আড়ালে পড়িয়া থাকে এবং সূর্য্যজ্যোতির অন্ধকার অংশ মহানিশায় আমাদের নিকট পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। (রাত্রি সাড়ে ১০টা হইতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত মহাসন্ধ্যার সময়।) এই অমাজ্যোতির মধ্যে তুরীয় শক্তিকণা বেশী ক্রিয়াশীল হয়। (তুরীয় কণা ক্রিয়াশীল হওয়া অর্থ প্রকাশকণা অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিলয় কণা নিষ্ক্রিয় হওয়া বুঝিতে হইবে।) মহাসন্ধ্যা ও ত্রি-সন্ধ্যার উপাস্য তত্ত্বের প্রত্যক্ষ সন্ধানে অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্য যোগবিধান ও তান্ত্রিকদীক্ষায় প্রবেশ ভিন্ন পথ নাই। মহাসন্ধ্যায় উপাসনাক্রম ও উহার গভীর বিজ্ঞান সম্মত দীক্ষা সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। পশু, বীর ও দিব্য এই তিনটি ভাবের মধ্যে তুরীয়া উপাসনা প্রচলিত আছে। আমরা দিব্য বিধানের অন্তর্গত তুরীয়া উপাসনার ক্রম বিবৃত করিব।

৬২। শাক্তদীক্ষা। ইহা তুরীয়া শক্তির প্রথম দীক্ষা। তুরীয় শক্তির এই অংশের নাম ''ইচ্ছাশক্তি''। তুরীয়া শক্তি হইতে সৃষ্টির সূত্রপাত যে বিজ্ঞানে বা যে নিয়মে হয় সেই নিয়মটীর নাম ইচ্ছাশক্তি। ইহার অন্য নাম 'সৃষ্টির বেগ' (ক্রম বিকাশ দ্রষ্টব্য)। কালীপূজা এই শক্তিউপাসনার বাহ্য অনুষ্ঠান। বঙ্গদেশে এই শক্তিপূজার বিশেষ প্রচলন আছে।

৬৩। শাক্তদীক্ষা কালে অনেকে গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব ও শৈব দীক্ষাও লইয়া থাকেন। শক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিবার জন্য মনে ও শরীরে যথেষ্ট 'তেজ' (আসুরিক বিরোধি মনোবৃত্তি) সম্পদ থাকা প্রয়োজন। নিস্তেজ মানুষ শক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে না। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচটী তত্ত্বে শরীর ও মন গঠিত। ইহাদের মধ্যে তেজই মানুষকে উচ্চ বিকাশ ভূমিতে লইয়া যায়। মানুষের মনে যদি যথেষ্ট তেজভাব না থাকে তবে জানিতে হইবে তাহার শরীরে ও মনে ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ বা ব্যোম এখনও ঠিক অংশে পরিণত হয় নাই। এই তত্ত্বাধিক্য প্রশমিত করিবার জন্য শিব, গণেশ, সূর্য্য বা বিষ্ণু দীক্ষা দিবার প্রয়োজন হইতে পারে। বলা প্রয়োজন এই সব তত্ত্বদীক্ষা সাময়িক দীক্ষা মাত্র। আসল দীক্ষা ইচ্ছাশক্তির দীক্ষাকেই জানিতে হইবে। শরীর ও মনকে তত্ত্বসাম্য করিয়া লইয়া পরে ইচ্ছাশক্তিরই দীক্ষা দান করিতে হয়।

৬৪। হিন্দু সমাজের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষারও বিভ্রাট দেখা গিয়াছিল। সেই সময় এক একটী তত্ত্বদীক্ষাই এক একটী সাম্প্রদায়িক দীক্ষায় পরিণত হইয়াছিল। এই

দুর্দ্দশা যখন আরও নিম্ন গতি লইয়াছিল তখন 'অবতার' দীক্ষা এই তত্ত্বদীক্ষার স্থান লইয়াছিল। অবতারগণ আমাদের নমস্য ও পূজ্য; কারণ তাঁহারা ছিলেন হিন্দু সমাজের এক একজন মহান্ স্ফুরণ। কিন্তু গায়ত্রী দীক্ষার পর যে ভাবে সমাজে তুরীয়া দীক্ষার স্থানে অবতারবাদ প্রবেশ করিয়াছে ইহা অত্যন্তই বিস্ময়কর ঘটনা। হিন্দু ধর্ম্মের আরও অধঃপতনের লক্ষণ আছে, আমরা সেইগুলিকে স্পষ্ট করিয়া না দিলে সমাজের ভ্রান্তি যাইবে না। কোন কোন স্থানে মহাপুরুষ উপাসনা, পিতৃউপাসনা, প্রেতউপাসনাও দীক্ষার স্থান লইয়াছে। গায়ত্রী দীক্ষার পর তুরীয় দীক্ষা ভিন্ন অন্য সব দীক্ষাই ভ্রান্তিভ্রমণ মাত্র। ইহা দ্বারা 'উপনয়নে' জ্ঞানের যে সূত্রপাত করা হইয়াছে উহার মূলোচ্ছেদ করা হইতেছে মাত্র। গায়ত্রী দীক্ষার অগ্রবর্ত্তী দীক্ষার নাম তুরীয়া দীক্ষা। যাঁহারা মহাসন্ধ্যোপাসনা ও ব্রহ্ম উপাসনায় প্রবেশ করিতে চান না তাঁহারা গায়ত্রী দীক্ষা পর্য্যন্তই থাকিবেন; আর নামিবেন না। এবং সমস্ত জীবন গায়ত্রী উপাসনা অনুশীলন করিবেন।

৬৫। পূর্ণদীক্ষা। ইহা তুরীয় শক্তির দ্বিতীয় দীক্ষা। ইহাও ইচ্ছাশক্তিরই দীক্ষা। ইচ্ছাশক্তির দুইটি দীক্ষার বিধান আছে। ইহার প্রথম দীক্ষাটি তত্ত্বসাম্যের দীক্ষা। ''পূর্ণদীক্ষা'' অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে যে তত্ত্বাভাব পূর্ণ হইয়া দিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দীক্ষায় মন্ত্র ভেদ আছে। এই সময় ব্রহ্ম মন্ত্রেরও দীক্ষা হইয়া থাকে। শাক্তদীক্ষা শক্তিজ্ঞানে প্রবেশ এবং পূর্ণদীক্ষায় ব্রহ্মমন্ত্রের দীক্ষা থাকায় ইহার লক্ষ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান উহা বুঝাইয়া দেওয়া।

৬৬। ক্রমদীক্ষা। ইহা তুরীয় শক্তির তৃতীয় দীক্ষা। এই শক্তির নাম ক্রিয়াশক্তি। ''ক্রিয়া'' অর্থে ব্রহ্মমুখীক্রিয়া বা গতি বুঝিতে হইবে। প্রথম দীক্ষায় শক্তিতত্ত্বে প্রবেশ, দ্বিতীয়ে উহার লক্ষ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান উহা নিশ্চয় করা, তৃতীয় দীক্ষায় ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া বুঝিতে হইবে। এখানে সাধকের উপাসনার বিষয় - ''ক্রিয়াশক্তি ও ব্রহ্ম''। তারাপূজা এই শক্তি উপাসনার বাহ্যানুষ্ঠান। বৌদ্ধ সাধকদের মধ্যে ক্রিয়াশক্তির সাধনা বেশী প্রচলিত ছিল। তারার অন্য নাম নীল সরস্বতী। আমাদের দেশ হইতে তীব্বত চীন প্রভৃতি দেশে তারা উপাসনা বেশী প্রচলিত।

৬৭। পৃথিবীস্থিত যে কোন দেশ, সমাজ ও জাতির নর নারীরা শাক্তাদি তুরীয় উপাসনায় প্রবেশ করিতে পারে। ইহার নিয়ম অনেকটা থিয়োসোফিক্যাল কলেজের মত। বিশেষ এই যে থিওসোফিষ্টরা ভাববাদী কিন্তু ইহারা শক্তিবাদী। যেসব নর নারীরা গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ না করিয়াই শাক্তাদি দীক্ষায় প্রবেশ করে তাহাদিগকে এ সময় বৈদিক গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয় এবং বৈদিক নিয়মে সন্ধ্যোপাসনাও করিতে হয়।

৬৮। শাক্তাদি তুরীয়া দীক্ষায় প্রবেশ করিবার পর, পর পর আটটি আচার গ্রহণ করিতে হয়। এই আচারগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে পৃথিবীস্থিত সমস্ত জাতীয় মানুষের আচার এই আচারগুলির অন্তর্ভুক্ত। ইহার যে কোন আচারে থাকিয়াও ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির উপাসনায় ব্রতী হওয়া যায়। আচারগুলির সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। (১) বেদাচার। ইতিপূর্ব্বে গর্ভাধান আদি বৈদিক সংস্কারগুলির কথা বলা হইয়াছে, এ সব সংস্কার গ্রহণ এবং উহার অনুশীলনই বেদাচার। হিন্দু মাত্রকেই বেদাচারী বলা যায়। যাঁহারা যথা বিধি ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী উপাসনা করেন তাঁহারাই

বেদাচারী শক্তি সাধক। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা অধিক। (২) বৈষ্ণবাচার। যথাবিধি মহাশক্তি দুর্গার উপাসনা করা এবং সমাজরক্ষার জন্য অসুরবাদ ধ্বংস করাই বৈষ্ণবাচার। প্রাচীন বৈষ্ণবাচার উঠিয়া গিয়াছে। চণ্ডীতে আছে ''ত্বং, বৈষ্ণবীশক্তি রনন্তবীর্য্যা'' তুমি অনন্তবীর্য্যসম্পন্না 'বৈষ্ণবী শক্তি'। সমাজ রক্ষার জন্য এইরূপ শক্তি উপাসনাই বৈষ্ণবাচার। বঙ্গদেশে এখনও উৎসাহ সহকারে বৈষ্ণবীশক্তির (দুর্গাপূজা) উপাসনা হইয়া থাকে। ইহাকে সমস্ত হিন্দুস্থানে নবরাত্রি অনুষ্ঠান বলা হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ, মহারাজ স্বয়ম্ভূব মনু, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাত্মাগণ বৈষ্ণবাচারী মহাপুরুষ ছিলেন। সেই মহান বৈষ্ণবাচার আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এখন নূতন বৈষ্ণবাচার দেখা গিয়াছে, উহা ভাববাদ মাত্র। আধুনিক বৈষ্ণব শ্রেণীর হিন্দুরা এখন দুর্ব্বলবাদ বেশী পছন্দ করায় ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় পৌরোহিত্যবাদী হইতেও বিশেষ ছুঁৎমার্গী হইয়াছেন। বৈশ্যদের মধ্যে এইরূপ বৈষ্ণবাচারী (?) লোক বেশী পাওয়া যাইবে। ইঁহারা গায়ত্রী উপাসনার নামও বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। (৩) শৈবাচার। উন্নত শৈবাচার উঠিয়া গিয়াছে। ইঁহাদের কীর্ত্তি হিন্দু গৌরবের অনেক কথা স্মরণ করায়। ইঁহারা সমস্ত পৃথিবীতে এক যুগে শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ঋষিদের মত উন্নত জীবন যাপন করা ও তপস্যাই ইঁহাদের ব্রত ছিল। শিব লিঙ্গই ওঁকার মূর্ত্তি। এই ওঁকারই বেদের সার। শৈব ও শাক্তগণ এই ওঁকার মূর্ত্তি স্থাপনা দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেদবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনেকে মূর্খের মত মূর্ত্তিবাদের নিন্দা করে। জানিয়া রাখিও মূর্ত্তিবাদী তান্ত্রিকগণই বেদ-বাদের প্রধান প্রচারক। এখন নিম্নস্তরের শৈবাচারের কঙ্কাল মাত্র আছে। ভূত, প্রেত, পিশাচ সাধনা ইহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। শিবের গাজন, চড়কপূজা ও কাল বৈশাখীর উৎসব - শৈবাচারের সামান্য কঙ্কাল বঙ্গদেশে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অনুশীলন ও প্রচারের অভাবে শৈবাচারীরা প্রায় সকলেই ভাববাদীদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে নিম্নস্তরের শৈবাচার প্রচলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক অলৌকিক ও অদ্ভূত শক্তিসম্পন্ন তান্ত্রিক সাধক দেখিতে পাওয়া যাইত। (৪) দক্ষিণাচার। ইহার অন্য নাম বীরাচার। সমাজ ও দেশরক্ষার জন্য আত্মদান ও অসুরনাশের ব্রত গ্রহণ করিয়া ইঁহারা বীরভাবে শক্তির উপাসনা করিতেন। ইঁহারাই ঠিক ঠিক কালী উপাসক ছিলেন। ভারতের ক্ষত্রিয়গণ সকলেই দক্ষিণাচারী শক্তিসাধক। এখন আসল বীরাচার হিন্দুদের ক্ষাত্রশক্তির পতনে উঠিয়া গিয়াছে। এখন সেই স্থানে মদ্যপান লীলা স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সাধকশ্রেষ্ঠ ত্রৈলঙ্গস্বামী উচ্চস্তরের বীরাচারী সাধক ছিলেন। (৫) সিদ্ধান্তাচার। ইহাও বীরাচারী সাধকদের আরও অগ্রবর্ত্তী আচার। যখন সাধকগণ এতটা অগ্রবর্ত্তী হইয়া যান যে যৌন পতনের আর আশঙ্কা থাকে না সেইরূপ অবস্থায় স্থিত সাধকই সিদ্ধান্তাচারী সাধক। বঙ্গদেশীয় সহজিয়া এবং পারশ্য দেশীয় সুফী সম্প্রদায় এই আচারের শাখা। অনেক পণ্ডিতের ধারণা সুফীবাদ ইস্‌লামের শাখা। এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। ইস্‌লামের সমাজব্যবস্থা এমন বিধানে গঠিত যে উহা দার্শনিকতা প্রসব করিতে পারিবে না। পারশ্যস্থিত প্রাচীন হিন্দুগণ ইস্‌লামের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর সুফীরূপ ধারণ করিয়াছিল। (৬) বামাচার। ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম ব্রত পরায়ণ থাকিয়া আচার ও অনাচারকে একই দৃষ্টিতে দেখার জন্য এই আচার গ্রহণ করিতে হয়। ইহাকে বিষ্ঠা চন্দনে

সমজ্ঞান, আচার বলা যায়। জাতিভেদ, দেশভেদ, সমাজভেদ, শুচিভেদ, আহারভেদ, সবরকম ভেদ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, অভয়, তেজ অবলম্বনসহ একান্ত সাধনাই বামাচার। ক্রিয়াশক্তির উপাসনা কালে (ক্রমাভিষেক সাধনায়) বামাচার অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়। (৭) অঘোরাচার। উন্নতস্তরের অঘোরাচারী এখন প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত নাড়ীগুলির সংস্থান প্রত্যক্ষে জানিবার জন্য শক্তি সাধকগণকে সাময়িক ভাবে অঘোরাচার গ্রহণ করিতে হয়। এখন অঘোরাচারী একটা সম্প্রদায়ই হইয়া গিয়াছে। 'শবব্যবচ্ছেদ' বিধান এখন চিকিৎসাশিক্ষায় স্থান পাইবার দরুণ অঘোরাচারের প্রয়োজন অনেক কমিয়া গিয়াছে। চীন, জাপান, তীব্বতবাসীরা অঘোরাচারী শক্তি সাধক। অঘোরাচারের অন্য নাম 'চীনাচার'। (৮) যোগাচার। চিত্তবৃত্তিনিরোধ কামনায় যোগাভ্যাস ও উহার আচারের বিশদ বিধান গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখুন। শরীরস্থিত পঞ্চ বায়ু, পঞ্চপ্রাণ, সপ্ত ধাতুর গতিবিধি, ষট্চক্রাদি, গণেশ, সূর্য্যাদি শক্তিকেন্দ্র, শরীরস্থিত নাড়ীতত্ত্ব, মস্তিষ্কের জ্ঞানভূমি, পঞ্চতন্মাত্রাজ্ঞান, পঞ্চতত্ত্ব কেন্দ্র, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ আদি লোক সংস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভই যোগাচারের অন্তর্গত কথা। যোগাচার অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং পবিত্র আচার। (৯) নবম আচারের নাম 'কৌলাচার'। সমস্তগুলি আচারে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবার পর সমস্তগুলি আচারত্যাগই কৌলাচার। ইহার অপর নাম সন্ন্যাসাচার, অবধূতাচার, পরমহংসাচার। পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন যেসব আচার ও সংস্কার গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব আদি সম্প্রদায়ে এবং এই পৃথিবীস্থিত বিভিন্ন দেশস্থিত হিন্দুগণকে ভাগ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে সেই গুলি মোটেই ভাগ হইয়া যাইবার লক্ষণ নহে। সেইগুলি হইতেছে একই শক্তিশালী উচ্চ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা। আচার সম্বন্ধে বলা হইল। এবার আমরা চতুর্থ দীক্ষায় প্রবেশ করিব।

৬৯। সাম্রাজ্য দীক্ষা। তুরীয়া শক্তির চতুর্থ দীক্ষার নাম সাম্রাজ্য দীক্ষা। এখানে সাধনার বিষয় 'জ্ঞানশক্তি'। এই দীক্ষায় অনেক দীক্ষা আছে। তুরীয়াস্তরে সৃষ্টিবিজ্ঞানের মূলে এক প্রকার শক্তি আছে যাহা শক্তির মূল উপাদানকে বিবর্ত্তিত করিয়া জীব ও জগদাকারে গড়িবার জন্য গতি বা প্রেরণা দান করে। আমরা ঐ শক্তির নাম দিয়াছি 'ইচ্ছাশক্তি'। আবার এই তুরীয় স্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবে আরও এক প্রকার শক্তি বিদ্যমান থাকে যাহা জীব ও জগদাকারে পরিণত সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া তুরীয়া মূলশক্তিরূপে পরিণত করিবার প্রেরণা দান করে। তুরীয় শক্তিস্থিত এই শক্তির নাম 'ক্রিয়াশক্তি'। কেবল জগৎই সৃষ্টির সব নহে। জীবও সৃষ্টির একটা অংশ। এই ইচ্ছা ও ক্রিয়ারূপ গতির মধ্যস্থানে জীবকে জ্ঞান ও সৃষ্টি রহস্য বুঝাইবার জন্য আরও একপ্রকার শক্তি তুরীয়স্তরে বিদ্যমান। এই শক্তির নাম 'জ্ঞানশক্তি'। ''সাম্রাজ্য দীক্ষা'' জ্ঞানশক্তির দীক্ষা। জ্ঞানশক্তি উপাসনার কঙ্কাল যাঁহারা বুঝিতে চাহেন তাঁহারা 'শ্রী-যন্ত্র' ও উহার পূজা বিধানের কথা তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দেখুন ও ভাবুন।

৭০। মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা। তুরীয় শক্তির পঞ্চম দীক্ষার নাম 'মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা'। ইহা জ্ঞান শক্তির আরও অগ্রবর্ত্তী দীক্ষা। জ্ঞানশক্তি ও উহার জ্ঞাতা পুরুষ যে একই তত্ত্ব উহা

সাধনার জন্যই এই দীক্ষা। উচ্চস্তরের মহাত্মাগণকে এ দীক্ষার জন্যই 'মহারাজ' বলিবার প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে।

৭১। যোগদীক্ষা। ইহা তুরীয় শক্তির ষষ্ঠ দীক্ষা। ইহা জ্ঞানশক্তির সাধনার একটি বিশিষ্ট শাখা। ইতিপূর্ব্বে 'যোগাচারে' যে সাধনার কথা বলা হইয়াছে এই দীক্ষায় সেই সব অনুষ্ঠান সবই সম্পন্ন করিতে হয়। এই দীক্ষায়ও অনেক দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

৭২। মহাপূর্ণদীক্ষা। ইহা তুরীয় শক্তির অন্তিম দীক্ষা। জ্ঞান সাধনায় আর কিছু বাকী না থাকার নাম মহা-পূর্ণ-দীক্ষা। এই দীক্ষায় শক্তি জগতের ভিন্ন ভিন্ন কণা যে একই পূর্ণশক্তির অন্তর্ভুক্ত, ইহারই দীক্ষা। এই পূর্ণ শক্তিতত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' আদি বেদ চতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট মহাবাক্য নির্দ্দেশক ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানময় দীক্ষাই মহাপূর্ণ দীক্ষা। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ প্রান্ত।

৭৩। বিরজা সন্ন্যাস। ইহাতে আর কোন দীক্ষা নাই। রজ অর্থে ক্রিয়া বা গতি বা শক্তি বুঝিতে হইবে। মহাশক্তিস্তরের এই ক্রিয়া না থাকার নামই ব্রহ্মতত্ত্ব। জ্ঞানীর উহাই শেষ লক্ষ্য, এইজন্য এই বিরজা হোম করিতে হয়। বি = বিগত। রজ = ক্রিয়া। অর্থাৎ একেবারে ক্রিয়াশূন্য অবস্থা। ইহাই সমস্ত সংস্কারের শেষ অনুষ্ঠান। বিরজা ও ব্রহ্ম একই তত্ত্ব।

৭৪। তন্ত্রমতে সন্ন্যাস চারি প্রকারের। (১) কুটীচক, (২) বহূদক, (৩) হংস ও (৪) পরমহংস। কোন একস্থানে কুটীরে অবস্থান পূর্ব্বক সাধনার অভ্যাসের নাম 'কুটীচক'। দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ ভ্রমণের নাম এবং অন্তর্জগতের ষট্‌চক্রাদি কেন্দ্র পর্য্যালোচনাসহ যোগাভ্যাসের নাম 'বহূদক'। ইহার অন্য নাম 'পরিব্রাজক'। সাধনার শেষ প্রান্তে সাধক যখন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন উহান নাম 'হংস'। সমস্ত সাধনা ও সমস্ত দীক্ষার কাজ শেষ করিয়া বিরজা সংস্কার গ্রহণ করিলে উহার নাম হয় 'পরমহংস'। উপরি উক্ত তুরীয়া দীক্ষার শাক্ত ও পূর্ণ দীক্ষিতগণ কুটীচক। ক্রম, সাম্রাজ্য, মহা সাম্রাজ্য ও যোগদীক্ষিতগণ 'বহূদক'। মহাপূর্ণ দীক্ষিতগণ 'হংস'। এবং বিরজা সংস্কারে সংস্কৃতগণ 'পরমহংস'। মহাপূর্ণ দীক্ষার পর বার বৎসর অতীত হইলেও সেই সাধক পরমহংস বলিয়া কথিত হন।

৭৫। মঠ, আচার্য্য ও সাধনার ধারা।

প্রাচীনকাল হইতেই সাধনার ধারা শিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত আছে। সেই সব সাধনার ধারার মূলে সাধক সম্প্রদায়ের মঠ আছে। মঠের সাধন ধারা কোন কোন মহাপুরুষে অতীব শক্তিশালী রূপ লইয়াছে দেখা যায়। তাঁহাদিগকে আচার্য্য বলে। বেদ ও ইঁহার সাধনার ধারা এবং বৈদিক ভিত্তিতে সমাজসংস্কার এবং কর্ম্মপ্রতিষ্ঠা এবং বৈদিক দার্শনিকতাকে সমাজজীবনে সুদৃঢ় করিবার জন্য যে সব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছেন সেই সম্বন্ধে আমাদের সমাজ অজ্ঞ হইয়া চলিয়াছে। অনেকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন - আপনি কোন আশ্রমের। আমরা অব্যক্ত মঠের সাধক সম্প্রদায় হইবার দরুণ আমাদের এই প্রশ্নে সত্যই বিব্রত হইতে হয়। যাঁহারা প্রশ্ন করেন তাঁহাদের মনে থাকে রামকৃষ্ণমঠ, ভারত সেবাশ্রম বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠ। কিন্তু আমাদের মনে জাগে সেই সুপ্রাচীন আনন্দ মঠ ও উহার সুসংবদ্ধ সাধনা ও যোগের

ধারা। প্রাচীনকাল হইতেই মঠধারা ও সাধনার ধারা গুরু পরম্পরায় প্রচলিত আছে। এবং ঐসব মঠ হইতে বিশেষ বিশেষ সময়ে সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান ধারার প্রতিষ্ঠার জন্য আচার্য্যদের আবির্ভাব হইয়াছে। সত্যযুগের আচার্য্য তিনজন (১) বৃষবাহন মহাদেব, (২) নীলমণিকান্তি বিষ্ণু, (৩) প্রজাপতি ব্রহ্মা। শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা ও সমস্ত যোগবিধানের প্রথম প্রবর্ত্তক মহাদেব। আমাদের সমস্ত প্রকার সাধনার ধারা এই মহান গুরু হইতে আসিয়াছে। সত্য যুগ দেবতাদেরই যুগ। এই যুগে আচার্য্যগণ সকলেই দেবতা নামে খ্যাত।

৭৬। ত্রেতা যুগের আচার্য্য তিনজন। (১) মহর্ষি বশিষ্ঠদেব পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার গুরু। (২) দ্বিতীয় আচার্য্য মহর্ষি শক্তি। ইনি বশিষ্ঠদেবের শিষ্য ছিলেন। (৩) মহর্ষি শক্তির শিষ্য মহর্ষি পরাশর। ইনি মাতৃগর্ভে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭৭। দ্বাপরের আচার্য্য দুইজন। (১) মহর্ষি ব্যাস প্রথম আচার্য্য ইনি পরাশরের শিষ্য ছিলেন। (২) মহর্ষি শুকদেব দ্বাপরের দ্বিতীয় আচার্য্য। ইনি পরাশরের শিষ্য ছিলেন।

৭৮। কলিযুগের প্রথম আচার্য্য গৌড়পাদ। ইনি আমাদের সাধক সম্প্রদায়ে ব্রহ্মানন্দনাথ নামে পরিচিত। গৌড় (বঙ্গদেশ) দেশের পদতলে অর্থাৎ সাগর সংগমে ইনি থাকিতেন বলিয়া ইনি গৌড় পাদস্বামী নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। ইনি শুকদেবের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার শিষ্য গোবিন্দপাদ কলিযুগের দ্বিতীয় আচার্য্য। আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই সুদীর্ঘজীবি মহাপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে গৌড় পাদ স্বামী এখনও জীবিত আছেন। আচার্য্য শঙ্করকে কলির তৃতীয় আচার্য্য মানা হয়। ইনি গোবিন্দ পাদের শিষ্য ছিলেন। শঙ্করের সঙ্গে যখন গোবিন্দ পাদের মিলন হয় তখন গোবিন্দ পাদ ১০০০ বৎসরের সমাধিস্থ মহাপুরুষ ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর গোবিন্দ পাদের সমাধি ভঙ্গ করেন। ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। কেহ কেহ বলিতে চান যে আচার্য্য শঙ্কর মুসলমান আক্রমণের পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন; ইহা মোটেই সত্য কথা নহে। আচার্য্য শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর রাজা সুধন্বা যে তাম্রলিপি স্থাপনা করেন উহাতে কলের্গতাব্দা ২৬৬৩ উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে ১৯৫১ সনে কলের্গতাব্দা ৫০৫২। আচার্য্য দেবের পূর্ব্বে যদি ভারতে মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হইত তবে আচার্য্য যে সমাজবাদের ভিত্তি দিয়াছেন তাহাতে বৌদ্ধবাদের মত ইসলামবাদেরও বিলুপ্ত হইবার ব্যবস্থা থাকিত।

৭৯। সাধনার ধারা সমন্বিত মঠগুলি ব্যক্ত ও অব্যক্ত মঠ এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত। ব্যক্ত মঠ চারটি। (১) পশ্চিমে সারদা মঠ। ইহার ক্ষেত্র দ্বারকা, ইহা গোমতী তীর্থ নামে পরিচিত। এখানে ভদ্রকালী (কালীরই এক নাম) উপাস্য দেবী। শিব সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত। (২) পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন মঠ, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে স্থিত। তীর্থ মহাসাগর। এখানে শক্তি বিমলা, দেবতা জগন্নাথ নামে খ্যাত। এই প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠকে ভাববাদী চৈতন্য দেব ভাববাদের কেন্দ্রে পরিণত করেন। এবং উড়িষ্যার রাজারা চৈতন্যদেবের প্রভাবে শক্তিবাদ হারাইয়া ফেলেন। যাহার জন্য উড়িষ্যা ও ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে বর্ব্বরবাদী মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা শক্ত হয়। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে রঘুনন্দনীয় শূদ্রবাদের সমর্থক হন এবং বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় শক্তিবাদীয় জীবনের মূলে একজন আঘাতকারী হন। (৩) উত্তরে (বদরিকায়) জোসি মঠ। ইহা মুক্তি ক্ষেত্র। তীর্থ অলকানন্দা। দেবতা নারায়ণ। দেবী পুণ্যা গিরি। (৪) দক্ষিণে শৃঙ্গিরী মঠ রামেশ্বর ক্ষেত্রে, দেবী কামাখ্যা। দেবতা

আদিবরাহ। ব্যক্ত মঠ চারিটীর কথা বলা হইল। অব্যক্ত মঠ তিনটির কথা বলা যাইতেছে।

৮০। অব্যক্ত মঠের ১ম আশ্রম ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার নাম সুমেরু মঠ। ক্ষেত্র কৈলাস। তীর্থ ত্রিবেণী বা সুমানস। দেবতা নিরঞ্জন। দেবী মায়া। এই মঠের কোন মূল ঠিকানা নাই। অব্যক্ত মঠের ২য় মঠের নাম গুপ্ত আশ্রম। ইহার নাম পরমাত্মা মঠ। ক্ষেত্র মানস সরোবর। দেবতা পরমহংস। দেবী মানসী মায়া। ইহারও কোন ঠিকানা নাই। অব্যক্ত মঠের ৩য় মঠের নাম আনন্দমঠ, ইহা নিস্ফল মঠ। ক্ষেত্র অনুভূতি। তীর্থ নাদ। দেবতা বিশ্বরূপ। দেবী চিৎশক্তি। অব্যক্ত মঠের সাধকগণ সকলেই পরব্রহ্ম গোত্র নামে পরিচিত। কাজেই তিনটি অব্যক্ত মঠই যে একই সম্প্রদায়ের মঠ ইহাতে সন্দেহ নাই। এ সব মঠের সাধকগণই বিভিন্ন সময়ে শক্তিবাদীয় বৈদিক ধর্ম্মের কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান ধর্ম্মের সংস্কারও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর এই মঠের এখনকার মত শেষ সমাজপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মসংস্থাপক। তাঁহার শিষ্যগণ এখন ব্যক্ত ৪টীর কোন একটীর সাধনার ধারায় অবস্থিত। তাঁহারা সকলে দশ নামী সন্ন্যাসী নামে খ্যাত। আমাদের আনন্দমঠের গুরু ধারা আচার্য্য গৌড় পাদ হইতে টানা হইয়াছে। আমরা এই ধারায় আচার্য্য গৌড় পাদ হইতে ১৪২ ধারায় শিষ্য। সাধনার এই সুপ্রাচীন ধারা এখন বেশ ক্ষীণভাবেই আছে। তান্ত্রিক শক্তিসাধনা তো বৈদিকযুগের ইন্দ্র, বরুণ, বসু, রুদ্র আদি দেবতাগণেরই সাধনা; কিন্তু উপাসকগণ শাক্ত কর্ম্মী ও শাক্তজ্ঞানী না হইলেই অসুবিধা হয়। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্ম উপাসনা ও ব্রহ্ম কর্ম্মকেই আমরা শাক্ত জ্ঞান, শক্তি উপাসনা ও শক্তি কর্ম্ম নাম দিয়াছি। শক্তি উপাসনা করিয়া শাক্ত কর্ম্ম ও শাক্তজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা না করিবার দরুণই আমাদের সমাজের ক্ষতি হইয়াছে। আমরা বলিব তাঁহাদের শক্তি উপাসনা ব্যর্থ হইয়াছে। যাঁহারা শক্তি উপাসনা করিয়া অসুরবাদী হইয়াছিলেন রাবণ তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় প্রধান ছিলেন। ইদানীং শক্তি উপাসক নিত্যানন্দ চৈতন্য রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া দুর্ব্বল ভাববাদের সর্ব্বনাশলীলা চলিয়াছে। শক্তি উপাসকগণকে শ্রদ্ধা করিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানধর্ম্মে দুর্ব্বলবাদিতা অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন। শক্তি উপাসনা শক্তিশালী উপাসনা ইহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই শক্তিউপাসকগণ পৃথিবীতে বড়ই শ্রদ্ধার স্থান পাইয়াছেন। আমরা শক্তিবাদীয় কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা প্রাচীন যুগের মতই কামনা করি। আমরা জ্ঞানবাদ এবং শক্তিবাদের সামঞ্জস্যময় ব্যক্তিগত, সমাজগত ও রাষ্ট্রগত জীবন চাই। ফলতঃ মঠের সাধনা ও আচার্য্যদের কর্ম্মধারায় এই সত্য অত্যন্ত প্রবল ভাবেই বিদ্যমান।

৮১। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসীগণকে 'দণ্ডী' ও 'পরমহংস' এই দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্কর 'বিবিদিষা' সন্ন্যাস প্রবর্ত্তন করেন। ইহার অর্থ এই যে আগে সন্ন্যাস গ্রহণ, পরে সাধনার অভ্যাস। আরও এক প্রকারের সন্ন্যাসী আছেন যাঁহাদিগকে বিদ্বৎ সন্ন্যাসী বলে। যে কোন পন্থায় হউক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে ভাবিয়া পরম হংসের মত উলঙ্গ ও পূর্ণ ত্যাগীর জীবন যাপন করা ইঁহাদের বাহ্য লক্ষণ। ইঁহারা বিরজা সংস্কার গ্রহণ করেন না। মহাপূর্ণ দীক্ষার পর ১২ বৎসর অতীত হইলে যে বিরজা সংস্কারহীন পরমহংস উহাও 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস'। ইহাই বিদ্বৎ সন্ন্যাসের ঠিক নিয়ম।

৮২। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধমতকে ভাঙ্গিবার জন্য এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণকে বৈদিকপন্থী করিবার জন্য 'বিবিদিষা' সন্ন্যাস প্রবর্ত্তন করেন। ইহা দ্বারা সন্ন্যাস বিধানে বেশ ভাল রকমেই হস্তক্ষেপ হইল। আচার্য্য শঙ্কর ছিলেন পূর্ব্বোক্ত আটটী দীক্ষার ফল স্বরূপ। তিনি যাহা প্রবর্ত্তন করেন তাহা 'দশনামী' সন্ন্যাসী নামে খ্যাত। 'বিবিদিষা' সন্ন্যাস অপক্ক সন্ন্যাসবাদ মাত্র। আচার্য্য সস্তায় কর্ম্মী পাইবার জন্য ইহা প্রবর্ত্তন করেন। ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে ধুরন্ধর বিদ্বান সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধক বা যোগী অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

৮৩। কর্ম্মীমাত্রকেই সস্তায় কর্ম্মী পাইবার জন্য এইরূপ অপক্ক কিছু করিতেই হয়। গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতিকেও সস্তায় কর্ম্মী যোগাড় করিবার জন্য স্কুল, কলেজ ও সরকারী কার্য্যে অসহযোগ ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অপক্ক সন্ন্যাসবাদ প্রবর্ত্তন হেতু পরবর্ত্তী যুগে সমাজে ভোগী সন্ন্যাসীদের দ্বারা গোঁসাই জাতের উদ্ভব হয়। অপক্ক সন্ন্যাসীরা শেষ কালে সমাজের অনেক জাত সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের বংশধরগণ অনেকে অন্ত্যজ শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল। যাহা হউক, সন্ন্যাসী প্রবর্ত্তিত জাতি হইবার দরুণ সমাজ যে উপকৃত হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যদেব এই সন্ন্যাসবাদেরই এক শাখাতে (ভারতী) আরও এক প্রকার অপক্ক সন্ন্যাসবাদ প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারও ভাববাদ ছড়াইবার জন্য সস্তায় কর্ম্মীর প্রয়োজন হইয়াছিল। এই অপক্ক সন্ন্যাসীগণ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব জাতের সৃষ্টি করেন। ইহা দ্বারাও সমাজের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। পৌরোহিত্য গণ্ডীর বাহিরে এই সব সমাজ গড়িয়া উঠিবার দরুণ সমাজে ইহা ভালভাবেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে পৌরোহিত্য কোঠার বাহিরেও খণ্ড সমাজ গড়া যায়। আমরা এইসব সমাজকে দ্বিজাতি সংস্কার গ্রহণ করিতে বলিতেছি। এখনও অনেক নবীন সন্ন্যাসপন্থী গড়িয়া উঠিতেছেন। উহাদের মধ্যে যাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিতে চাহেন তাঁহারা যদি সুবিধাবোধে অহিন্দু কন্যা বিবাহ করেন তবে উহাও সমাজের উপকারে আসিবে।

৮৪। আদর্শবাদীরা সমাজে কিছুই গড়েন নাই। ইহাদের দান কেবলই পরনিন্দা ও দুর্ব্বলতা। ভোগী, কর্ম্মী এবং জ্ঞানীরাই কিছু গড়েন। অপক্ক সন্ন্যাসবাদীরা যাহা গড়িয়াছেন উহা দ্বারা সমাজ পৌরোহিত্য কোঠার বাহিরে কিছু গড়িয়াছেন। এইভাবে হিন্দুরা যদি দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র পৌরোহিত্যবাদের ছোব্ড়ার মোহ ত্যাগ করিয়া হিন্দু, অহিন্দু মিশ্রণে কিছু গড়িতে পারে তবে উহা হিন্দু সমাজের একটা গৌরবময় অধ্যায় বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, গোঁসাই, বৈষ্ণব ও সংসার আশ্রমে প্রবেশ ইচ্ছুক অপক্ক সন্ন্যাসী সকলকে আমরা এই ভাবে হিন্দু সমাজ গড়ার দিকে মন দিতে বলিতেছি। প্রত্যেকটী খণ্ড সমাজের নেতাগণকে আমরা এজন্য উৎসাহ দিতে অনুরোধ করিতেছি। এসব হিন্দুগণেও গায়ত্রী সংস্কার দান, ১০ দিন অশৌচ বিধান প্রবর্ত্তনের নীতি মানিয়া লইয়াছি। সব খণ্ড সমাজ হইতেই পুরোহিত গড়া যায়, সব দেশ ও সমাজ হইতেই নারী গ্রহণ করা যায় এবং সর্ব্বাবস্থায় পৌরোহিত্যবাদে পদাঘাত করিয়া উন্নত শিরে নিজের সমাজেই প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়; ইহা আমরা জানি। গায়ত্রী সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিবে ইহাই প্রথম ও প্রধান কথা। হিন্দুসমাজ যিনি গড়িয়াছিলেন

তিনি ব্রাহ্মণও ছিলেন না, পুরোহিতও ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমাজ কর্ত্তা মহারাজ স্বয়ম্ভুব মনু। পুরোহিত তাঁহারই গড়া। তোমরাও সমাজ এবং পুরোহিত দুইই গড়িতে পারিবে, কারণ তোমরা শক্তিশালী। পৃথ্বীরাজের শ্বশুর রাজা জয়চন্দ্রও অতি নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র হইতে কয়েকজন পুরোহিত গড়িয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের মর্য্যাদা প্রাচীন ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ হইয়া গিয়াছে এবং পরস্পর বিবাহ আদিও হইয়া থাকে। আমরা এইরূপ কয়েকঘর ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় রাখি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অন্ত্যজ সবই মানুষের গড়া। পৌরোহিত্যবাদীরা শূদ্র ও বিদ্বেষ ভিন্ন অন্য কিছুই গড়ে নাই। ইহার কারণ উহাদের মন শূদ্রতুল্য ও উহাদের মন অত্যন্ত বিদ্বেষী।

৮৫। সন্ধ্যোপাসনায় প্রকৃতির ত্রিগুণের উপাসনা এবং মহা সন্ধ্যায় তুরীয়া শক্তির উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়া ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মকে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক এবং প্রাকৃতিক নিয়ম ও শক্তিক্রিয়ার মূলস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণ জানিয়া রাখিবেন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসবাদের স্থান নাই। হিন্দুধর্ম্মে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি উপাসনা মানুষের ক্রম বিকাশের বিভিন্ন স্তর। এবং হিন্দুধর্ম্মে এই শক্তিস্তরকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও তুরীয় ভেদে যেরূপ সন্ধ্যা ও মহাসন্ধ্যার বিধান প্রবর্ত্তন হইয়াছে উহাদ্বারা হিন্দুকে সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে যে শক্তি বিদ্যমান সেই সঙ্গে এবং উহার ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ব্যবস্থা করিয়া সৃষ্টির বিবর্ত্তন বিজ্ঞানে পরিচিত করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৮৬। ত্রিসন্ধ্যা সকলেরই নিত্য কর্ত্তব্য। কিন্তু মহাসন্ধ্যানুষ্ঠান উচ্চশ্রেণীর সাধকগণে মাত্র প্রচলিত। নিত্য এইরূপ কঠোর সাধনায় ব্রতী হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু তুরীয় শক্তির সহিত জনসাধারণের পরিচয় দৃঢ় করিবার জন্য ঋষিগণ পৃথিবীর বাৎসরিক গতির মধ্য হইতে কতকগুলি শক্তিশালী সন্ধি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সেই সব শক্তিশালী সন্ধিকালে মহাশক্তির নৈমিত্তিক পূজারও প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সব হিন্দুরা উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া মহাশক্তির যথেষ্ট আভাষ লাভ করিয়া শক্তিলাভ করিয়া থাকে।

৮৭। পৃথিবীর বার রাশিতে ভ্রমণ ও নক্ষত্রদের বিশেষ বিশেষ সন্ধিকালে কতকগুলি শক্তিশালী সন্ধিকাল আবিষ্কার করা হইয়াছে। সন্ধিকালের শক্তির তারতম্যে এক একটি সন্ধিকালে এক এক প্রকার শক্তির উৎসব হইয়া থাকে। আমরা দুই চারটি সন্ধিকাল সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব।

৮৮। নবরাত্রি ও দুর্গোৎসব সন্ধিকাল। বৎসরে দুইটি নবরাত্রি হইয়া থাকে। ইহার একটি শরৎকালে (চান্দ্র আশ্বিন মাসে) অন্যটি বসন্তকালে (চান্দ্র চৈত্র মাসে)। সমাজকে আসুরিক শক্তির অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য, মহাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এই সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। অসুরবাদের বিরুদ্ধে সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইবে এবং সেই সঙ্ঘবদ্ধ সমাজই মহাশক্তি দুর্গা। নবরাত্রে ইহারই পূজোৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে চণ্ডীপাঠ সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠান। কিভাবে সঙ্ঘশক্তি প্রস্তুত হইয়া দুর্গা রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং কিভাবে আসুরিক শক্তি ধ্বংস হইয়াছিল চণ্ডীতে সেই সব লীলাকাহিনী মন্ত্রাকারে বিদ্যমান। এই দুইটী নবরাত্রেই বিশ্ব প্রকৃতিতে শক্তি, উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনা এতই স্পষ্ট হয় যে যে কোন লোক উহা বুঝিতে পারে।

৮৯। দীপাবলি অমাবস্যা। ইহা সবচেয়ে শক্তিশালী তুরীয়া সন্ধিকাল। এই সময় সবচেয়ে বেশী তুরীয়াশক্তি পৃথিবীতে স্পষ্ট হয় বলিয়া হিন্দুরা শুচি অশুচি নির্ব্বিশেষে সমস্ত স্থানে দীপাবলি (দীপের বলিদান) প্রদান করিয়া মহাশক্তির স্বাগত ও পূজা করিয়া থাকে। এই অমাবস্যায় কালীর পূজা হইয়া থাকে। বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় সর্ব্বত্র যেন মহাশক্তির প্রলয়কণা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অমাবস্যার পূর্ব্বদিনকে ভূত চতুর্দ্দশী বলে। বল বৃদ্ধির জন্য এইদিন প্রাতঃকালে নানা প্রকার শাক তুলিয়া উহা রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। রাত্রে চন্দ্র হইতে শক্তিকণা সমস্ত শাকে ও বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে।

৯০। কোজাগর পূর্ণিমা। ইহা চান্দ্র আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে হইয়া থাকে। এই সময় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান ও অমৃতকণা বর্ষিত হইয়া থাকে। চন্দ্রকিরণকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অমৃতকণা এই পূর্ণিমাতে পৃথিবীতে যেন ঢালিয়া দিয়া যায়। ইহা দ্বারা সমস্ত উদ্ভিজ্জ জগৎ পরিতৃপ্ত হয়। এই কণা মানুষের জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি করে বলিয়া হিন্দুরা কোজাগর রাত্রে জাগিয়া থাকে এবং বাহিরের চন্দ্রাতপে জল, ক্ষীর, মিষ্টান্ন আদি রাখিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আহার করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক পুষ্ট হইয়া থাকে। এই চন্দ্রাতপে দুগ্ধ শর্করা রাখিয়া রাত্রিশেষে শিশিতে ভরিয়া রাখিতে হয়। এই শর্করা মস্তিষ্ক পুষ্টির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ। হোমিওপ্যাথিকে ইহার নাম লুনা (চন্দ্র প্রভা)। কোজাগরে পৃথিবীর জল ও বায়ু মণ্ডল অমৃতে ভরিয়া যায়। এই রাত্রে হিন্দুরা লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান করে, এবং জ্ঞানেচ্ছুগণ প্রাতঃস্নান করিয়া থাকেন।

৯১। পৌষ সংক্রান্তি। ইহাকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে। এই সময় পৃথিবী ধ্রুবতারার নিকটবর্ত্তী হয়। এই জন্য ইহাকে নিবৃত্তিমার্গের অয়ন বলে। এই সময় হইতে ৬ মাসকাল পৃথিবীতে জ্ঞান ও সত্যের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। মহাবীর ভীষ্ম এই সময় দেহত্যাগ করেন। এই সময়কে পৃথিবীতে গঙ্গার আবির্ভাব সময় মানা হইয়া থাকে। ইহা হিন্দুদের অতি পবিত্র সন্ধি সময়। এই সন্ধিকালে আমাদের শক্তিশালী সমাজের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কাজেই শক্তিবাদীদের জন্য ইহা স্মরণযোগ্য সন্ধিকাল। শক্তিবাদীরা এই দিন সর্ব্বত্র সমবেত হইয়া সমবেত উপাসনা করিয়া থাকে এবং শক্তিশালী সমাজের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়া থাকে। শক্তিবাদীরা সবগুলি উৎসবই সমবেত ভাবে অনুষ্ঠান করেন। এভাবে অনুষ্ঠান বৈদিক যুগের দেবতারাও অনুষ্ঠান করিতেন। কাজেই সব হিন্দুরাই ইহাতে যোগদান করিবে।

৯২। বসন্ত পঞ্চমী। ইহা চান্দ্র মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী। এইদিন হইতে ১০দিন পৃথিবীতে জ্ঞানকণা বর্ষিত হয়। কোজাগরের জ্ঞানকণা ও এই সময়কার জ্ঞানকণার ভেদ আছে। কোজাগর শান্তি প্রধান (শিব + মহৎ) জ্ঞানকণা, কিন্তু বাসন্তীতে ত্যাগ প্রধান (গণেশ + মহৎ) জ্ঞানকণা বৃদ্ধির সময়। এই সময় হিন্দুরা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করে এবং জ্ঞানশক্তির উপাসনা করে। বিদ্যার্থীদের জন্য ইহা অত্যন্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় উৎসব।

৯৩। মহাবিষুব্ সংক্রান্তি। ইহা সৌর চৈত্র মাসের শেষ দিন। এই দিন এক বৎসর বিদায় লয় এবং নূতন আরও একটি বৎসর আগমন করে। ইহা তুরীয়া শক্তির একটি বিশেষ সন্ধি কাল। উহার প্রভাব পৃথিবীতে বেশ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই সময় হিন্দুরা নীলপূজা, অর্দ্ধনারীশ্বর পূজা, সন্ন্যাস আচার গ্রহণ, প্রলয় নৃত্য, কালকর পূজা, সৃষ্টি চক্রের পরিবর্ত্তন সূচক চড়ক এবং আরো সব উৎসব করিয়া থাকে। এই সময় মহাশক্তি

কালী কি ভাবে রক্তবীজাদি অসুর নাশ করিয়া আসুরিক উৎপাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন উহার নৃত্য অত্যন্ত সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুদের মধ্যে অসুরনাশের উৎসাহ উদ্দীপন করিবারও প্রথা আছে।

৯৪। বর্ষ চক্রে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব পূজা উৎসবের মহাসন্ধিকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরো অনেক সন্ধি কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তদনুরূপ উৎসবেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হিন্দুদের সব উৎসবই বৈজ্ঞানিক ও শক্তিবাদমূলক।

৯৫। বিকাশের পথে ৯ম হইতে ১৪শ পর্য্যন্ত কলায় বিকশিত মহাপুরুষগণকে হিন্দুরা অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। উন্নত স্তরের মহাপুরুষগণ কিরূপ যুক্তিবাদের ভিত্তিতে নিজেদের কর্ম্মজীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা সমাজ কল্যাণ ও অসুর নাশের আদর্শ কি ভাবে তাঁহাদের সময়কার সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল উহার প্রচারার্থে অবতারদের জন্ম তিথিতেও উৎসবাদির ব্যবস্থা আছে।

৯৬। পূজাগুলি সবই জাতীয় উৎসব। উৎসবগুলিকে অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন করিবার জন্য আমরা প্রতি বৎসর মূর্ত্তিগুলি বিসর্জ্জন না দিবার পক্ষে। খুব সুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়া লইবে ও প্রতি বৎসর হালকা রং করিয়া লইবে। আরও সুন্দর মূর্ত্তি গড়িতে পারিলে পুরাতন মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে পারিবে।

৯৭। হিন্দুদের প্রধান ৫১টি তীর্থ স্থান আছে। এই তীর্থস্থানগুলিকে ৫১টি পীঠ বলে। ইহারা ৫১টি বর্ণমালার প্রতীক। প্রত্যেকটীই এক একটী মহাশক্তি পীঠ। তুরীয়া শক্তির বিশেষ বিকাশ এক একটী তীর্থ স্থানে বিদ্যমান। বেশীর ভাগ তীর্থগুলিই হিন্দুস্থানের মধ্যেই রহিয়াছে। আফগানীস্থানে ও তিব্বতেও পীঠস্থান আছে। ব্রহ্মজ্ঞান লক্ষ্যে এই সব তুরীয় শক্তির পীঠ, গণেশ আদি সগুণ ব্রহ্ম, অবতারাদি মহাত্মাগণ, মনুগণ ও ঋষিগণ সকলেই হিন্দুকে একই লক্ষ্যে উপনীত হইতে ইঙ্গিত দিতেছে। কাজেই ইহারা হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র।

৯৮। হিন্দু চিন্তার দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন হইতেছে ব্রহ্মণ্যবাদ এবং পুরুষোত্তমবাদ। ঋষিগণের চিন্তায় ব্রহ্মণ্যবাদের প্রতিভা অধিক প্রকাশ পাইয়াছে এবং রাজর্ষি ও মনুগণের চিন্তায় পুরুষোত্তমবাদ বেশী পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এই দুইটী চিন্তারত্ন ওতঃপ্রোতঃ জড়িত। বৈদিক সংস্কার ও বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও শ্রাদ্ধ বিধান ব্রহ্মণ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তান্ত্রিক দীক্ষা, অভিষেক যোগমার্গ ও নিষ্কাম কর্ম্মবাদ পুরুষোত্তমবাদের সহিত অধিক সম্বন্ধযুক্ত। বেদে উভয়বিধ চিন্তারই কঙ্কাল আছে। যখনই পুরুষোত্তমবাদের চিন্তা মন্দীভূত হইয়াছে তখনই ব্রহ্মণ্যবাদের ছায়ার আড়ালে পৌরোহিত্যবাদ গজাইয়া উঠিয়াছে। ইহারা তান্ত্রিক জ্ঞান ও যোগধারাকেও বংশগত আয়ের ব্যবস্থায় নিযুক্ত করিয়া পুরুষোত্তম স্তরের চিন্তাকেও নষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। এ যুগের অবতার শ্রীবুদ্ধদেব পৌরোহিত্যবাদরূপ আসুরিকতাকে বহিষ্কারের রাস্তা করিয়াছিলেন কিন্তু শিষ্য পরম্পরায় বেদ বিরোধিতা আসিয়া উহার পতন হয়। উন্নতস্তরের ঋষি ও রাজর্ষিগণের মধ্যে কেহ ব্রহ্মণ্যবাদের উপর বেশী জোর দিয়াছেন এবং কেহ বা পুরুষোত্তমবাদের উপর অধিক জোর দিয়াছেন। সবই পারিপার্শ্বিক স্থিতির জন্যই হইয়াছে। ব্রহ্মণ্যবাদের একনিষ্ঠ আদর্শ বশিষ্ঠদেব এবং আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি, কিন্তু পুরুষোত্তমবাদের চিন্তায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক - শ্রীকৃষ্ণ, মনুগণ সকলেই এই স্তরের

চিন্তার ক্ষেত্র ছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অষ্টাবক্র, গর্গ, ভৃগু, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক প্রভৃতি সকলেই পুরুষোত্তম স্তরের জ্ঞানী ও কর্ম্মবীর ছিলেন।

৯৯। মৃত্যুকালীন সংস্কার। সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে। এবার মৃত্যুকালীন সংস্কারের কথা বলা যাইতেছে। পূর্ব্বযুগের সন্ন্যাস মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে অনুষ্ঠিত হইত। এখনও গঙ্গাযাত্রীবিধানে সেই বিধানই প্রচলিত আছে। মৃত্যুকালে যাহাতে মানুষ বেশ জ্ঞানসহ মরিতে পারে সেই জন্য সকলেই চেষ্টা করিবে।

১০০। মৃত্যুকালে মানুষকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিবে, সম্ভব পক্ষে চন্দনাদি, ধুনাদি ও পুষ্পাদি দ্বারা যথাসাধ্য পবিত্র স্থিতি প্রস্তুত করিয়া দিবে। শরীর যাহাতে একটু গরম থাকে, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। প্রয়োজন হইলে গরম জলের বোতলের সাহায্য লইবে। কান্নাকাটি করিয়া পরলোকগামীকে অকারণ ব্যস্ত করিও না। মৃত্যুর যথেষ্ট সময় পূর্ব্বেই শীতাতপ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা সহ আকাশের তলে রাখিবে। মৃত্যুকালে অনেকে শীতল বস্তু পাইতে চায় তাহাদিগকে উহাই দিবে। গৃহের মধ্যে এবং বদ্ধ স্থানে মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া থাকে। খোলা স্থানের মৃত্যুতে মৃত্যু আরামের হয় এবং নূতন প্রাণশরীর গঠনের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রাণ শরীর, নাভী, হৃদয় বা ভ্রূমধ্য স্থানকে কেন্দ্র করিয়া একটু সূক্ষ্ম সূত্রে সংযুক্ত থাকিয়া শরীরের বাহিরে চলিয়া যায়। সে সময় বদ্ধ গৃহে তাহাকে রাখিলে তাহার ভীষণ কষ্ট হয়। কাজেই তাহাকে খোলা স্থানে রাখিবে। যথাবিধি উপাসনা বা মহামন্ত্রগুলি শ্রবণ করাইবার পর মৃত্যুর প্রাক্কালে দীর্ঘ প্রণব শুনাইবে।

১০১। এই সব মহামন্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে অথবা স্মরণ করিতে করিতে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া শরীর ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবে। মোহ ও লোভ থাকিলে কিছুদিন প্রেত অবস্থায় থাকিতে হয়। উহা বেশ কষ্টদায়ক। মৃত্যুকালে কাহারও ভূতভবিষ্যতের কথা ভাবিবে না। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিণ্ডের আশা ত্যাগ করিয়া নিজের জ্ঞান ও নিশ্চিত মৃত্যুর উপর নির্ভর করিবে। মৃত্যুকালে যত নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে তত উত্তম মৃত্যু হইল জানিবে।

১০২। মৃতের সৎকার। হিন্দুদের মধ্যে জল সমাধি, মৃত্তিকা সমাধি ও অগ্নি সংযোগে সৎকার এই তিন প্রকারের সৎকার বিধি আছে। অগ্নি সংযোগে সৎকার সব চেয়ে বৈজ্ঞানিক সৎকার জানিবে। ইহাতে আত্মার প্রেত হইবার কারণ কমিয়া যায়। সন্ন্যাসীগণের মোহ মোটেই থাকে না বলিয়া তাঁহাদিগকে মৃত্তিকা সমাধি বা জল সমাধি দিবার ব্যবস্থা আছে। অজ্ঞানীদিগকে ভূমি সমাধি দান করিলে সেই প্রেতাত্মা মোহবশে সেই স্থানে বহুদিন থাকিবার চেষ্টা করে। ইহা দ্বারা সেই আত্মার অকল্যাণ সাধন হইয়া থাকে। হিন্দু মাত্রেরই মৃত শরীর যাহাতে সৎকার হয় সেজন্য ব্যবস্থা করিয়া দিবে বা নিজেরা সৎকার করিবে। মৃতের সৎকার অত্যন্ত পবিত্র যজ্ঞ জানিবে। পৌরোহিত্যবাদীরা মৃত শরীর লইয়াও বর্ণধর্ম্ম ছুঁতমার্গ ফলাইয়াছে। ঐ সব অত্যন্ত ভ্রান্ত সংস্কার সর্ব্বথা বিসর্জ্জন দিবে। শবযাত্রাকালে "ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" বা "হরি ওঁ" মহামন্ত্র ধ্বনি করিতে করিতে যাইবে।

১০৩। অশৌচ বিধান। কাহারও মৃত্যু হইলে আত্মীয়দের মনে শোক হয়। শোক হইবার দরুণ মন অশুদ্ধ হয়। মনের অশুদ্ধতার জন্য অশৌচ পালন করিতে হয়। অশুদ্ধ

মনে পিতৃকার্য্য ও দৈবকার্য্য করা যায় না। কেহ জন্মিলেও অশৌচ বিধান (পিতামাতার জন্য মাত্র) আছে। শক্তিবাদীদের জন্য ১০ দিন অশৌচ বিধান করা হইয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিয়মেও অশৌচ পালন করিতে পারিবে। বেশীদিন অশৌচ পালন করিলে মন ছোট হইয়া যায় এবং মৃত আত্মার অশান্তি হয় এবং শ্রাদ্ধাদি হইতে বেশী সময় লাগে বলিয়া বিশেষ কষ্টও হয়। বেশীদিন অশৌচ ধারণ করিলে মৃত ব্যক্তির অধোগতি হয়। কাজেই যথাসম্ভব সত্বর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিবে। যাঁহারা 'ক্রম দীক্ষা' গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অশৌচ ধারণ করিতে হয় না। যাঁহারা সন্ন্যাসী তাঁহাদের শোক হয় না। ক্রমদীক্ষিতগণ ও উন্নত দীক্ষিতগণ বা সন্ন্যাসীগণ নিকটস্থ আত্মীয়গণের মৃত্যুজনিত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে উপনিষদ পাঠ, ব্রহ্মমন্ত্র জপ ও সাধুভোজনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন ইঁহাদের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। সন্ন্যাসীর মৃত্যুতেও শোক হয় না, অশৌচও হয় না, শ্রাদ্ধাদিও করিতে হয় না। তবে উপনিষদ পাঠ, সমবেত উপাসনা ও সাধুভোজনের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

১০৪। শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ বৈদিক বিধানে সম্পন্ন করিবে। শ্রাদ্ধে ৬ দান, ১৬শ দান, তিলকাঞ্চন উৎসর্গ পৌরোহিত্য লুণ্ঠনবাদ মাত্র; ইহা ত্যাগ করিবে। শ্রাদ্ধে আসল কাজ পিতৃতৃপ্তির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান অংশ। এই যজ্ঞানুষ্ঠানেও অনেক চালকলা থালা ঘটী বাটী স্থান পাইয়াছে। শ্রাদ্ধ অর্থে পিতৃপূজা। বেদ বিধিতে সম্ভব হইলে নিজেরা উহা সম্পন্ন করিবে অথবা পুরোহিতের সাহায্য লইবে। যাহারা যজ্ঞ অংশ গ্রহণ করিতে চায় না তাহারা পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীদের নিয়মে শ্রাদ্ধ করিবে এবং সেই সঙ্গে সংক্ষেপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। শ্রাদ্ধ বৈদিক অনুষ্ঠান বিধায় উহা বিশেষ পবিত্রভাবে এবং পবিত্র পারিপার্শ্বিক স্থিতির মধ্যে সম্পন্ন করিতে হয়। বিশেষ জানাশুনা পবিত্র আচার সম্পন্ন ধার্ম্মিক লোক বা ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য কাহাকেও ইহাতে আহার করাইবার বিধি নাই। করাইলে আত্মার অধোগতি হয়।

১০৫। পিতামাতা বা বিশেষ আত্মীয় স্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যুর তিথিতে পিতৃপক্ষে তর্পণ করিবে এবং শক্তি থাকিলে একজন সজ্জন স্বজাতিকে অন্ন আহার করাইবে। ইহাতে আত্মার দুর্গতি হয় না। শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে বৃথা ব্যয় করিবে না, পিতৃপূজায়ও ত্রুটি করিবে না, ছাঁদা বৃত্তির বেশী প্রশ্রয় দিবে না। সমাজ সংস্কারের জন্য অনেক ব্যয়ের বিধান করিতে হইবে, কাজেই বৃথা ব্যয় ত্যাগ করিয়া ঐদিকে দান বৃদ্ধি করিবে।

১০৬। গয়ায় পিণ্ডদান। অনেকে মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ড দিবার জন্য স্বপ্ন দেয়। তখন জানিতে হইবে সেই লোকটি গয়ার পিণ্ড সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রান্ত সংস্কার লইয়া মারা গিয়াছে। এই ভ্রান্তি কাটাইবার জন্য অনেক সময় বাধ্য হইয়া গয়ায় যাইতে হয়। গয়ায় পিণ্ডের সঙ্গে মুক্তির কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহা কেবলই নিম্নস্তরের প্রেত আত্মার প্রেতত্ব খণ্ডনের কার্য্য। ইহা প্রেতের ভ্রান্ত সংস্কার কাটাইবার একটা অনুষ্ঠান মাত্র। যাঁহারা এইরূপ ভ্রান্তি লইয়া মরেন তাঁহারা আত্মীয়গণকে পিণ্ডের জন্য ব্যস্ত করেন। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিবার দরুণ পৌরোহিত্য সংস্কার নানা প্রকারেই প্রাধান্য জমাইয়াছে। এরূপ স্বপ্ন দিলে তাহার ভ্রান্তি নাশের জন্য একজন সজ্জনকে কঠোপনিষদ শুনাইবে এবং অন্নাহার করাইবে। যদি এইরূপ অনুষ্ঠানের পরও আবার স্বপ্ন হয় তবে সংস্কার নাশের জন্য গয়ায় যাইয়া পিণ্ড দিবে। পুরোহিত বা পাণ্ডা ভিন্নও পিণ্ডদান করা যায়। গয়ায় পাণ্ডারা

টাকা লইয়া 'সফল' অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে। শক্তিবাদীদের ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইবার প্রয়োজন নাই। যাহাদের মন নিতান্তই দুর্ব্বল ও যাহাদের আত্মায় বিশ্বাস নাই, পাণ্ডারা তাহাদিগকেই এই অনুষ্ঠানে ঠকাইয়া থাকে। মৃত আত্মায় জ্ঞান প্রতিফলিত করিবার জন্য কোন সজ্জনকে উপনিষদ শুনাইতে হয় এবং তাহার তৃপ্তির জন্য তর্পণ ও একজনকে আহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাই আত্মার ঊর্দ্ধগতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। এইরূপ করিবার পর দেখিবে কখনও সেই আত্মার আর পিণ্ড লোভের স্বপ্ন হইবে না।

১০৭। রাষ্ট্রভাষা। সমস্ত সমাজশাখায় এক সাধারণ ভাষার ভিত্তি দেওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষাই এই স্থান লইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়াই চালাইতে হইবে। এক উপাসনা এবং এক ভাষা ভিন্ন শক্তিশালী সমাজ দৃঢ় ভিত্তি লইতে পারিবে না। দেশে বিদেশে শক্তিবাদীয় সমাজ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র প্রবর্ত্তনে আমাদের সংস্কৃত ভাষার সাহায্য লইতে হইবে। কোন প্রাদেশিক ভাষাই সংস্কৃত ভাষার এই মহান কার্য্য গ্রহণ করিতে শক্তি রাখে না। সংস্কৃতকে রাষ্ট্র ভাষা করিলে, সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কৃত বিদ্বানদের হাতে চলিয়া যাইবে। সংস্কৃতকে সরল ও সহজ করিয়া লইয়া ইহাকে রাষ্ট্র ভাষা করিলে ইহার ফল আমাদের পক্ষে ভাল হইবে।

হিন্দী ভাষাকেও সংশোধন করা প্রয়োজন হইবে। হিন্দী ভাষাকে কি ভাবে সংশোধন করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে ২, ১টি কথা বলা যাইতেছে।

১০৮। হিন্দী ভাষায় ক্রিয়ারও লিঙ্গ ব্যবহার হয়। যেমন ম্যায় জাতা হায় (পুং)। ম্যায় জাতী হুঁ (স্ত্রী)। আমরা বলি - ক্রিয়ার লিঙ্গ থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই। ইংরেজী, বাংলা এবং সংস্কৃতে ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ হয় না। সংস্কৃতে ক্তবতু প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ হয়। যেমন - স গতবৎ (পুং), সা গতবতী (স্ত্রী)। সংস্কৃতে ইহাকে বিশেষণ বলা হয়। কাজেই ইহাকে ক্রিয়াপদের লিঙ্গ প্রয়োগ বলা চলে না। কিন্তু হিন্দীতে প্রত্যেকটী ক্রিয়ারই লিঙ্গ ভেদ হয়। আমরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে হিন্দীভাষার ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ উঠাইয়া দিয়া লিখিতে ও বলিতে অনুরোধ করি। বেশী লিঙ্গজ্ঞান থাকিলে জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হওয়া কঠিন। ইহা জাতিকে ভোগমুখী করে। বঙ্গ ভাষায় সর্ব্বনামের লিঙ্গভেদ নাই, ক্রিয়ারও নাই। নব্য বঙ্গের বিশেষণেরও লিঙ্গভেদ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ইহা বঙ্গভাষার ভাল লক্ষণ।

১০৯। হিন্দী ভাষার আরও জঞ্জাল 'হ্যায়' শব্দের প্রয়োগ। তুলসীদাসের ভাষায় 'হ্যায়' কম বলিয়া উহার মাধুর্য্য বেশী। 'হ্যায়' অর্থ 'হয়'। ইংরাজীতে ইহার প্রতিশব্দ is। 'আমি বাড়ী যাই।' ইহার হিন্দী 'হম্ ঘর জাতা' বলিলেই চলে। যেমন ইংরেজীতে I go home বলিয়া is বলিবার প্রয়োজন হয় না এবং বাংলায়ও 'আমি বাড়ী যাই' বলিয়া 'হয়' বলিবার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ হিন্দী ভাষাতে 'হ্যায়' শব্দ অর্থহীন অত্যধিক শব্দ। ইহা ভাষার মধুরতা নাশ করে। হিন্দী লিখনে আরও একটী বড় অসুবিধা কী, কে এবং কা এর প্রয়োগ। এই তিনটি কথা একার্থবাচক। রামকী দুহিতা। এখানে যেহেতু দুহিতা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ (বা স্ত্রীলিঙ্গবৎ) অতএব এখানে কে, বা কা, না হইয়া কি হইবে। কে, কা অথবা কী কথাটীর পরে দুহিতা শব্দ আসিয়াছে। যতক্ষণ দুহিতা শব্দটী জানা হইবে না ততক্ষণ কে লিখিব বা কা লিখিব অথবা কী লিখিব ঠিক করা যায় না। হিন্দী

ভাষায় এই অব্যয়গুলির লিঙ্গ বোধ সত্যই বিরক্তিকর। পাঠকগণ রাষ্ট্রভাষায় প্রবেশ করুন। লিঙ্গজ্ঞানের প্রাচুর্য্য আপনাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে। ''মোটর জাতা হ্যায়'', ''গাড়ী জাতী হ্যায়'', ''গগড়া টুট গয়া'', ''গগড়ী টুট গয়ী'' ইত্যাদি নানাভাবে লিঙ্গভেদ হিন্দীর এক ভীষণ বিচিত্রতা। হিন্দী মোটেই সহজ ভাষা নহে।

১১০। হিন্দী ভাষার লিখন প্রণালী অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। অবৈজ্ঞানিক লিখন প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রভাষা করা চলে না। সংস্কৃত ভাষার লিখন প্রণালী কষ্টকর বলিয়াই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বর্ণমালার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। বর্ণমালা পরিবর্ত্তনের অন্য কারণও আছে। বৌদ্ধবাদীরা অনেকস্থানে জনসাধারণের জ্ঞানকে বেদবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া বর্ণমালার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কোনসময় পৌরোহিত্যবাদীরাও অব্রাহ্মণকে দেবভাষার বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। বঙ্গদেশের বিদ্বানগণ সংস্কৃত বর্ণমালাকে সহজে লিখিবার জন্য বর্ণমালার গঠন পরিবর্ত্তন করেন। এই পরিবর্ত্তনকে দৃঢ়মূল করিবার জন্য বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণ ''বর্ণমালা তন্ত্র'' প্রকাশ করেন। ঐ তন্ত্রে প্রত্যেকটী বর্ণমালার গঠনকে বঙ্গীয় রূপ দিবার জন্য যে গবেষণা করিয়াছেন ইহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। বর্ণমালাকে সহজে লিখিবার বিজ্ঞানকে স্থায়ী ভিত্তি দিবার চেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। হিন্দী লিখিবার সময় প্রত্যেক বর্ণ লিখিবার কালে একবার বা দুইবার করিয়া নীচের দিকে ছাড় দিতে হয়। ইংরেজীতে a b c d e f ইত্যাদি একই টানে লেখা চলে। বাংলায়ও দুই চারিটী বর্ণ বাদে সব বর্ণই একটানে লেখা যায়। কিন্তু হিন্দী লেখায় ইহা অসম্ভব। ইংরেজী লেখায় ও পড়ায় দুই অক্ষর ব্যবহার করা হয়। যেমন A B C D E এবং a b c d e ইত্যাদি। হিন্দী ভাষায় পাঠে ও লেখায় দুই প্রকারের বর্ণ প্রচলন প্রয়োজন হইবে। হিন্দীতে ক লিখিতে একবার নীচে ছাড় দিতে হয় এবং একবার মাত্রায় টান দিতে হয়। খ লিখিতে দুইবার নীচে ছাড় দিতে হয়, একবার মাত্রায় টান দিতে হয়। গ লিখিতে দুইবার নীচে ছাড় দিতে হয় এবং একবার মাত্রা টানিতে হয়। বাংলা ভাষায় এইরূপ অসুবিধা খুবই কম। বাংলায় ক খ গ ঘ ঙ এক টানে লেখা চলে। এখানের সবচেয়ে সুবিধা যে বর্ণগুলি মাত্রায় যাইয়া শেষ হয় এবং মাত্রা টানিতে হয় না। আমরা হিন্দী বর্ণমালাকে দুই রকমে ব্যবহার করিতে বলি। পড়িবার জন্য হিন্দী বর্ণমালা যাহা আছে তাহাই থাকিবে কিন্তু লিখিবার বেলায় ইহাকে বাংলা বর্ণমালায় লিখিবার নিয়ম করিতে হইবে। বাংলায় যে সব বর্ণমালা লিখিবার বিজ্ঞানে অসুবিধা আছে সেইগুলিকে সংস্কার করিতে হইবে। যদি উহার অনুকূল বর্ণলিখন ভারতের অন্য কোন প্রান্তের বর্ণমালায় থাকে তবে আমরা সেই কয়টি বর্ণমালা সেই সব প্রান্ত হইতে গ্রহণ করিব। আমরা হিন্দী ভাষায় পঠনীয় বর্ণমালার সংস্কার চাই না। ইহার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অতীতের চিন্তাধারা আর পড়িতে পারে না। ফলে জাতীয় জীবনের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যায় এবং জাতীয় চিন্তা শক্তি দুর্ব্বল হয়। যবনরা দেশের জাতীয়তা ভাঙ্গিবার জন্যই নাগরী বর্ণমালাকে পারশ্য বর্ণমালায় পরিবর্ত্তন করে। হিন্দীকে উর্দ্দূর সংশ্রব ত্যাগ করাইয়া সংস্কৃত ভাষায় মিল করা হইয়াছে। কাজেই হিন্দী ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে হিন্দী ব্যাকরণে সন্ধি, সমাস, ণত্ববিধান, ষত্ববিধান, ধাতু-প্রত্যয়, কৃৎ তদ্ধিৎ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইতে

বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। আমাদের মতে ইহার ফলে ছাত্র ছাত্রীদের মোটেই সুবিধা হয় নাই, বরং অনেক বিষয়ে জটিলতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ কঠিন হইয়াছে। বঙ্গ ভাষার নব্য ব্যাকরণে যে সব স্থানে যথেষ্ট চিন্তাশীলতার অভাব লক্ষিত হইতেছে আমরা সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিলাম না। কারণ আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য রাষ্ট্রভাষা। প্রত্যেক প্রান্তেই প্রাদেশিক ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যতটা মিল আছে উহা রক্ষিত হইলে আমাদের রাষ্ট্রভাষা সুন্দর ও সরল হইবে। বাংলার নব্য প্রগতিবাদীরা ভাষাকে বিকৃত করিতেছেন। দৃঢ় ব্যাকরণ সম্মত ভাষা জাতির মেরুদণ্ড শক্ত করে। বঙ্গভাষার স্বরবর্ণের চিহ্ন দান সম্বন্ধে অনেকের মনে দ্বিধা জাগিয়াছে, কি, কে, কৈ, কৌ প্রভৃতি স্বর চিহ্নগুলি ক টী লিখিবার পূর্ব্বে দেওয়া হয়। হিন্দীতে ও সংস্কৃতে কেবল 'কি' কে সংশোধন করিলেই চলে কিন্তু বাংলায় ে, ৈ, ো শব্দ কয়টিরও সংস্কার প্রয়োজন বলিয়া অনেকের ধারণা। যদি ''কি'' = ক্ + ই হয় তাহা হইলে ক লিখিবার পরই চিহ্ন দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু কি = ক্ + ই মানা হইলে ক্ একটি হলন্ত শব্দ; ইহার সঠিক কোন উচ্চারণ নাই। কাজেই 'কি' একটি মৌলিক শব্দ। এইরূপ অবস্থায় ই চিহ্নটিকে ক এর পূর্ব্বে বা পরে দিলে ক্ষতির কোন কারণ নাই। আমরা বলিব, লিখিতে যাহা সুবিধাজনক মৌলিক ধ্বনিকে সেইভাবেই রূপ দেওয়া কর্ত্তব্য। কি শব্দকে ক্ ি লিখিলে লেখার সুবিধা কমিয়াই যায়। আমরা সর্ব্বদা ভাষার রূপদাতা বর্ণমালার পরিবর্ত্তন কম সমর্থন করি। কারণ ইহাতে পূর্ব্বজগণের লিখিত গ্রন্থাবলী ভবিষ্যৎ বংশজগণের নিকট সহজ পাঠ্য থাকে না। বাংলার সংযুক্ত অক্ষরগুলির গঠন অবৈজ্ঞানিক।

১১১। আমরা সংস্কৃতকেই রাষ্ট্রভাষা ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ইহা করিতে হইলে সংস্কৃত সহজ ও সরল করিতে হইবে। ইহাকে এত সরল করা প্রয়োজন যে যে কোন লোক উহা বলিতে ও লিখিতে পারে। ইহাকে সরল করিয়া দিলে আমাদের কোনই ক্ষতি নাই বরং ইহা দ্বারা আমাদের সব বিষয়েই সুবিধা হইবে। কি ভাবে সংস্কৃতকে সহজ করা প্রয়োজন এ সম্বন্ধে আমরা মাত্র কয়েকটী নির্দ্দেশ দিব। (১) অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের মত যে কোন শব্দের রূপ করিয়া বলা ও লেখা শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। যেমন 'দেবস্য' বলা ভুল নয় তেমনি পিতৃস্য, মাতৃস্য, ভগ্নিস্য, ভাতৃস্য, প্রভুস্য সবই শুদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবে। লিখিতে পড়িতে ইহা শুদ্ধ মানিলেও প্রাচীন সংস্কৃত পদ্ধতিরও মোটামুটী শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রাচীন বা আধুনিক যে কোন ভাবের বা মিশ্র ভাবের সংস্কৃতকে একই রূপে বিশুদ্ধ বলিয়া ধরিতে হইবে। (২) একটী মাত্র ধাতুর রূপগুলিতে যে কোন ধাতুকে রূপদান করা চলিবে। একমাত্র 'ভূ' ধাতু জানা থাকিলে যে কোন ক্রিয়ার মূলকে ঐ ধাতুর রূপে রূপ দিলে উহা শুদ্ধ বলিয়া ধরা হইবে। (৩) সন্ধি সংগঠনের নিয়মকেও বাধাহীন করিতে হইবে। যেমন - দেবালয় বা দেব আলয়। মনু অন্তর বা মন্বন্তর। গতিঃ ভর্ত্তাঃ বা গতির্ভর্ত্তাঃ। সোঽহম্, সো অহম্, বা সঃ অহম্ সবই শুদ্ধ মানিতে হইবে। (৪) প্রত্যয়গুলি সম্বন্ধেও ভাষায় বন্ধন শিথিল করিতে হইবে। (৫) সংস্কৃত সর্ব্বনাম শব্দগুলি একটী সর্ব্বনাম শব্দের নিয়মে শুদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবে।

১১২। এইভাবে সংস্কৃতকে কাজের মত ভাষায় পরিণত করিয়া লইলে ভারতের রাষ্ট্রভাষার এক শক্তিশালী অধ্যায় আরম্ভ হইবে। সংস্কৃত লিখন ও পঠন সম্বন্ধেও হিন্দী ভাষায় নির্দ্দেশানুসারে দুই প্রকারের বর্ণমালা গ্রহণ প্রয়োজন। যাঁহারা সংস্কৃতকে রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া পাইতে চাহেন তাঁহারা এইভাবে বলিতে ও বলাইতে চেষ্টা করুন। প্রত্যেকটী সংস্কৃত বিদ্যার্থী ও যে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কিছুদিন অভ্যাস করিলে সংস্কৃত এবং হিন্দী দুইটী ভাষাই আমাদের কাজের মতন হইয়া গড়িয়া উঠিবে। বাংলার ছাপার বর্ণমালা দেবনাগর করা এবং হিন্দীর লিখন বর্ণমালা বাংলা করা এবং ব্রাহ্মীসহ সমস্ত ভারতের ছাপার বর্ণমালা হিন্দী করিয়া দিলে আমাদের কাজের বিশেষ সুবিধা হইবে। যখন একটা জাতির জাতীয় জীবনে জীবনী শক্তি আসে তখন তাহাদের চিন্তাধারায়ও নবীনতা দেখা দেয়। এক শ্রেণীর হতভাগ্য আমাদিগকে শিখাইয়াছে সংস্কৃত মৃত ভাষা আর আমরাও এমন হতভাগ্য যে আমরা নির্ব্বিবাদে বলিতেছি 'সংস্কৃত মৃতভাষা'। সংস্কৃত মোটেই মৃত ভাষা নহে। ইহা ভারতের ভাষার জীবন এবং ইহা জীবন্ত ভাষা। ইহাকে বাদ দিলে ভারতের ভাষার অস্তিত্বই থাকে না। আমাদের ভাষার প্রতি শতে অন্ততঃ ৯৫টি শব্দই সংস্কৃত। বিশুদ্ধ সংস্কৃত এদেশে কথ্য ভাষা কখনই ছিল না। তোমরা 'দেব' শব্দের রূপ শিক্ষা কর এবং 'ভু' ধাতুর রূপ জান, দেখিবে যে কোন বালকবালিকাই প্রাদেশিক ভাষার মতই সংস্কৃত বলিতে পারিবে। আমাদের দেশের প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে সংস্কার করিলে উহা সংস্কৃত ভাষাই হয়। আমরা ভারতের জন্য হিন্দী অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্কৃত ভাষাকেই অধিক উপযোগী মনে করি। আমরা শক্তিবাদী জনতাকে সরল সংস্কৃতে কথা বলিয়া পথ দেখাইতে বলি। অহং, হম, আমি; ত্বম্, তুম, তুমি; সঃ, সে, সো; পিতৃ, পিতর, father, পিতা; মাতৃ, মাতা, mother; ভ্রাতৃ, brother; দুহিতৃ, দুহিতা, daughter; দ্বৌ, দো, দুই, two; তৃ, ত্রয়, three; ছয়, ছ, six; অষ্টম, আট, আঠ, eight; কৃ, করি, করতি, কর্‌তা; ধৃ, ধরি, ধরতি, ধর্‌তা ইত্যাদি সবই সংস্কৃত ভাষার রূপভেদ মাত্র।

তৃতীয় ভাগ

একাদশ অধ্যায়

শক্তিশালী সমাজে কুরাণবাদ

১। কুরাণ অধ্যায় আরম্ভের পূর্ব্বে কুরাণ সম্বন্ধে আমাদের মত স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কুরাণ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ একজন সমাজ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সমাজবাদ আমাদের মতে অসুরবাদ মাত্র। তিনি কলিযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্মষবাদীয় নেতা। তাঁহার কুরাণকে আমরা কোন ঈশ্বরাদেশ বলিয়া মানি না। যদি মানা যায় ইহা কোন অলৌকিক আদেশ, তবে ইহা কোন আসুরিক বা পিশাচের প্রেতাত্মার আদেশ বলিয়া মানিতে হইবে। পৃথিবীতে বৌদ্ধগণ প্রথম সঙ্ঘবাদ স্থাপন করেন। মহম্মদ এই সঙ্ঘবাদকে আসুরিক ভিত্তিতে গড়িয়া যান। লেলিনের* What is to be done নামক পুস্তক খানা রুষিয়াতে লাল বিপ্লব আনিবার কর্ম্মবিজ্ঞান রূপে লেখেন। কুরাণের কর্ম্মধারা ও লেলিনের কর্ম্মধারায় আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। কুরাণের আল্লার ভক্তিতে কোনই আধ্যাত্মিকতা নাই। আল্লা ভজিয়া হূর পাওয়া ভিন্ন আল্লা ভজিয়া জ্ঞান বা আল্লা পাওয়ার কোন নীতি কুরাণ মানে নাই। কাজেই ইহাতে ভোগ ও জড় বাদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। হুরবাদিতা, নারী ও কাফেরের ধন বিত্ত কাড়িয়া লইয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া আল্লার ভক্ত প্রস্তুত করিতে করিতে ইঁহারা সমস্ত পৃথিবীকে মক্কায় পদানত করিবার কার্য্যবিজ্ঞান দাঁড় করান। লেলিন মস্কোকে কেন্দ্র করেন। কম্যুনিজম, সোসিয়ালিজম, ডেমোক্রেশী প্রভৃতি পৃথিবীর আধুনিক সব আসুরিক মতবাদেরই গুরু যে মহম্মদ ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এই পৃথিবীতে এক সাংঘাতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করেন। এই বিপ্লবী গুরুর নিকট অধ্যাত্মবাদী ভারতকে যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। অধ্যাত্মবাদী ভারতকে মহম্মদের প্রচার বিজ্ঞানের সব টুকুই গ্রহণ করিতে হইবে। ভালভাবে শক্তিবাদী প্রচার করিয়া যবনবাদগুলির দোষ ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন ভিন্ন অধ্যাত্মধর্ম্ম রক্ষা হওয়া অসম্ভব; ইহা ভিন্ন মানবকে পশুর আসনে বসিতে হইবে। অসুরবাদী রাবণের মৃত্যুকালে রাম তাঁহার নিকট রাজনীতি শিক্ষা প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। পৃথিবীর আধুনিক সব মতবাদী রাই মহম্মদের ছাত্র। তাঁহারা মহম্মদের নিকট ইহাই শিক্ষা করিয়া ছিলেন - ''ভোগবাদে সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়ের বালাই নাই। সকলে মিলিয়া একই কথা বলিতে থাক এবং সব রকম দুষ্কৃতি করিয়া বলিতে থাক, ''ধর্ম্ম করিতেছি''; তোমাদের নেতা পৃথিবী জয় করিতে পারিবেন।'' শক্তিবাদী ভারতকে আমরা বলি ''যদি তোমরা সমবেত ভাবে প্রচার করিতে না পার তবে তোমরা বিলুপ্ত

* প্রকাশকের নিবেদন - ''লেনিন'' শুদ্ধ হইলেও আর্ষপ্রয়োগ বিচারে আমরা ''লেলিন''ই বজায় রাখিলাম।

হইবে। বেদ দুর্ব্বলবাদ কোথাও সমর্থন করেন নাই, তোমরাও সমর্থন করিও না। বেদ কোথাও অসুরবাদকে ক্ষমা করেন নাই। বেদ, বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার সীমাহীন প্রচার কামনা করেন। তোমরাও সীমাহীন ভাবে বেদবাদ প্রচার কর ও বেদবাদী সমাজ গড়।'' অধ্যাত্মবাদী ভারতের তিন ভাগের এক ভাগ আজ হিন্দুহীন, বাকী দুই ভাগের শাসন কর্ত্তৃত্ব যাহাদের হাতে তাহারা সকলে বেদবাদের শত্রু। ভারত আজ ভিতরে ও বাইরে মহম্মদের ছাত্রগণ দ্বারা (অর্থাৎ ইসলাম, ডেমোক্রেট, কম্যুনিষ্ট, ও সোসিয়ালিষ্টদের দ্বারা) পরিবেষ্টিত। এই দুর্দ্দিনেও ভারতে দুর্ব্বলবাদিতার প্রভাব প্রবল। কাজেই মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ অত্যন্তই অন্ধকার।

কুরাণবাদের সঙ্গে কম্যুনিজম ধর্ম্ম ও সোসিয়ালিষ্ট ধর্ম্মের হুবহু মিল আছে। ইহারা সকলেই জড়বাদী ধার্ম্মিক। বেদ বলেন, ''মা গৃধঃ কস্যাস্বৎ ধনম্'' কাহারও ধনের আশা করিও না। কুরাণ বলে কাফেরের ধন লুট কর। কম্যুনিজম ধর্ম্ম বলে ধনীর ধন রাজার রাজ্য কাড়িয়া লও। কুরাণ বলে কাফেরের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া সও। ইহার ধর্ম্ম হইতেছে লুণ্ঠন ও ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া মারিয়া কাটিয়া তস্ নস করা ও দেবতার মন্দির কাড়িয়া লইয়া সেখানে পিশাচ উপাসনার কেন্দ্র করা। কম্যুনিষ্ট ধর্ম্মীরাও দেবস্থানকে কাড়িয়া লইয়া নেতার আসন করে। আইন করিয়া ধনী, রাজা ও জমীদারকে ভিক্ষুকে পরিণত করে। এ সব মতবাদকে আমরা কোন সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করি না। আমরা প্রত্যেক স্তরের মানবের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গৃহের প্রাচুর্য্য চাই; কিন্তু লুণ্ঠনবাদ চাই না। রাত্রের চুরি এবং ডাকাতির সঙ্গে ইসলামের আল্লা মিঞার শত্রু কাফেরের ধন ও নারী লুণ্ঠন এবং কম্যুনিজমের প্রগতির নামে মানুষকে আইনের বলে নিঃস্ব করায় কোনই ভেদ নাই। লুণ্ঠনের ধন ও নারীকে মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার সহিত প্রগতিবাদের নামে ধন জমি ও সম্পদকে ষ্টেট্ প্রপারটী করিয়া দলের লোকদিগকে সেই সব কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিরোধকারীগণকে আইন করিয়া নির্য্যাতন করা বা হত্যা করার সহিত পৃথিবীর উন্নতির কোনই সম্বন্ধ নাই। সভ্যতার নামে এই পৃথিবীতে কিরূপ ধাপ্পাবাজী ও চুরি ডাকাতি ও লুণ্ঠনলীলা চলিয়াছে ইহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে। এ সব অসভ্যতাকে পত্রিকার বলে সভ্যতা বলিয়া প্রচার করা হয়। আধ্যাত্মিকতার অভাবে মানব জাতির কি ভীষণ অধঃপতন! জড়বাদী কলির গুরু মহম্মদকে ধন্যবাদ।

যবনবাদ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। যাহারা বেদবিরুদ্ধ (জ্ঞানবিরুদ্ধ) মতবাদী তাহাদিগকে যবন বলে। মহারাজ যযাতি - তাঁহার দুই পুত্রকে বেদহীন করিয়া হিমালয়ের পশ্চিমে নির্ব্বাসন করেন। তাঁহারা ঐ সব দেশে যবনবাদ বা বেদহীন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে থাকেন। যবনবাদ ঐ সব দেশে ক্রমে বেশ প্রবল হইতে থাকে। ক্রমে ঐ সব দেশের বেদ বাদীদের বিরুদ্ধে যবনবাদীরা অত্যন্ত প্রবল হয়।

''ম্লেচ্ছাধীনা গুণাঃ সর্ব্বে ২গুণং আর্য্য দেশকে।''

''ম্লেচ্ছরা তাহাকেই গুণ (শীল) বলে আর্য্য দেশে যাহা দোষ নামে খ্যাত''। তাহারা সর্ব্ব প্রকার বেদ বাদ বিরুদ্ধ আচারে দীক্ষা শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকে।

২। যবন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য ভারতের পৌরোহিত্য বাদিতাই দায়ী। দ্বাপর যুগের মহারাজ নির্ম্মিতের পুত্র ক্ষেমক রাজ্য ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তিনি

ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার পুত্র মহারাজ প্রদ্যোত এই দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধে ম্লেচ্ছযজ্ঞ করেন এবং ম্লেচ্ছ রাজাদিগকে বেদবাদ হইতে বহিষ্কার করিয়া বেদহীন জাতি করিয়া ছাড়িয়া দেন।

৩। আচার্য্য শঙ্করের পর ও বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করিবার পর আমাদের দেশে বৈদিক গায়ত্রী উপাসনা প্রবর্ত্তন হয় নাই। যাহার ফলে আমাদের দেশে ভাববাদীয় অবতার উপাসনা ও দুর্ব্বলস্তরের মহাপুরুষদের প্রভাব বৃদ্ধি হয় এবং সমাজ দুর্ব্বল হয়। আমরা ভারতবাসীকে বলি, তাহাদিগকে দুর্ব্বলবাদ ও পৌরোহিত্যবাদ দুইই ত্যাগ করিতে হইবে এবং সকলের মধ্যে বেদবাদীয় সমাজ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। মানুষকে বেদহীন করিয়া রাখা নিশ্চয়ই পুণ্য কার্য্য নহে। প্রত্যেক অত্যাচারেরই প্রতিক্রিয়া আছে। একদিন আর্য্যগণ যে যবনবাদের ভিত্তিদান করিয়াছিলেন অন্য যুগে সেই যবনবাদীরাই ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর দ্বারা যে বৈদিক উপাসনা হীন পৌরোহিত্যবাদ প্রবর্ত্তিত হয় সেই ভাববাদী সমাজই গান্ধিবাদের দ্রৌর্ব্বল্যের প্রধান সহায়ক হয় এবং ভারতভাগ ও ভারতের সর্ব্বনাশকারী সেকুলারিষ্টদের সহায়ক হয়। সমাজজীবনে কর্ম্মের এই গতিকে চিন্তাশীল ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন :- ''আর্য্য দেশাঃ ক্ষীণবন্তো ম্লেচ্ছদেশাঃ বলান্বিতাঃ। ভবিষ্যতি ভৃগুশ্রেষ্ঠ তস্মাচ্চ তুহিনাচলম্॥'' ''হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! সেই কারণ হিমালয় বা আর্য্য দেশ বলহীন হইবে, কিন্তু ম্লেচ্ছদেশ বলবান হইবে।''

অন্যত্র :- ''দ্বিশতাষ্ট সহস্রে দ্বে শেষে তু দ্বাপরে যুগে।
ম্লেচ্ছ দেশস্য যা ভূমির্ভবিতা কীর্ত্তিমালিনী॥''

''২৮০২ বৎসর দ্বাপরের পর সেই কীর্ত্তিমালিনী দেশ ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছাধীন হইবে।'' যবনবাদ প্রবর্ত্তন যে ভাবে করা হইয়াছিল এবং প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে লহু শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাদের শির মুণ্ডন করা হইয়াছিল, শিখা ও সূত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। এ ঘটনা অনেকবার হইয়াছিল।

''তবারাতী নিমান্ সর্ব্বান্ মুণ্ডয়িত্বা শিরাংসিতু।
বেদাচার বহির্ভূতান্ কারয়ামাস দূরতঃ॥
হিমাদ্রি পশ্চিমে ভাগে দেশে তু যবনো নৃপঃ॥''

''সেই আরতিগণকে শির মুণ্ডন করা হইয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে বেদাচার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। হিমাদ্রির পশ্চিমে যবনগণ নৃপতি হইয়াছিলেন।''

কালং তথেন্দুষ্টনবান (১৮১) গতেশকে কলৌযুগে।
পুণ্যদেশাধিপায়ুয়ং ভবিষ্যথ স্থনিশ্চিতম্॥
এবমেব মহাদেবি কামরূপাধিপো শবে।
যবনো মৎ প্রসাদেন তথান্য পুণ্যভূমিষু॥

''১৮১ শকাব্দে কলিযুগে, ইহারা উক্ত সময় পর্য্যন্ত পুণ্যদেশের রাজা হইবেন। এইজন্য কামরূপের রাজারা শব (নিস্তেজ) হইবেন। আমার বরে যবনগণ কামরূপ ও অন্যান্য পুণ্য ভারতের রাজা হইবেন।''

যোগিনী তন্ত্রে যবনদের সম্বন্ধে যে সব ভবিষ্যতবাণী করা হইয়াছে সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সেইমতে শকাব্দ ৯৮১ তে যবনদের ভারতে প্রবেশ এবং ৯৮১ বৎসর ভারতে কোন না কোন স্থানে রাজ্য করিবার কথা আছে। অবশ্যই কামরূপে (আসামে) যবনরাজ্য কাল অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম বলা হইয়াছে। ইহাদের স্বভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহারা জপকালে উল্টা মালা ঘুরায়। যাহার ফলে ইহাদের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি আসুরিক হইবে। ইহাদের স্বভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহারা তামস ভাবকে আশ্রয় করিবার দরুণ ইহারা অত্যন্ত ক্রোধী হইবে - ''তামসাস্তে মহাদেবী তামসং ভাবমাশ্রিতাঃ''। যবনবাদ এত প্রাচীন যে তন্ত্র বলে ''বেদেও ইহার প্রমাণ আছে''। যযাতির বংশধরগণকে যে ভাবে বেদহীন করিয়া বহিষ্কার করা হইয়াছে, যবনরাও ঠিক সেই ভাবেই নূতন সমাজ গড়েন। মহম্মদ এই মতবাদের শেষ গুরু। এই বিশ্ববিপ্লবী যবনবাদ হইতে বাঁচিবার এক আশ্চর্য্য উপায় যোগিনী তন্ত্র বলিয়াছেন - ''তোমরা কুমারী পূজা কর, আর্য্য সভ্যতা সেই পুণ্যফলে রক্ষা পাইবে।'' যে সব পুণ্যাত্মাগণ কুমারী পূজার অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন এই পূজায় জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববর্ণের কুমারীদের পূজা করেন। ''জাতির্ভেদো ন কর্ত্তব্যঃ কুমারী পূজনে শিবে। জাতিভেদান্মহেশানি নরকান্ন নিবর্ত্ততে।'' মুসলমানেরা যে দেশেই কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে সেই দেশকেই তাহারা যবনের দেশ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা পারে নাই ভারতবর্ষকে। কুমারী পূজায় কি হইতে পারে বা পারেনা ইহা আমরা জানিনা; কিন্তু ভারত বাঁচিয়া গিয়াছে এবং বাঁচিয়া যাইবে। অহিংসাবাদী (?) কাপুরুষ ও যবনতোষক পাপীরা দেশের নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব করিবার সময় ইহাদের নপুংসকতায় এবং ইহাদের সমর্থনে শত শত লক্ষ লক্ষ নারী যবনবাদী বর্ব্বরদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হইয়াছে। কুমারীপূজক শক্তিবাদী হিন্দু সমাজের অংশ, এই মহা পাপীদের কথা ভাবিতে লজ্জা লাগে। ইহাদের অধঃপতনের গভীরতা ইহাদের সঙ্গে কথা বলিলেই বুঝা যাইবে। নারী নির্য্যাতনের প্রতিবাদ এদের অসহ্য।

৪। দেখা যায় যবনবাদ একটী প্রাচীন মতবাদ। ইহা ভারতের আর্য্যগণই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মানুষকে বেদবাদহীন করিয়া দিয়া পৌরোহিত্যবাদীরাই এই মতবাদের জন্মদাতা হন। আমরা কুরাণবক্তা আল্লাকে ঈশ্বর স্বীকার করিনা, কোন যুক্তিবাদীই এই ব্যক্তিকে ঈশ্বর স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এই ব্যক্তিকে যদি কোন আসুরিক প্রেতাত্মা মানা যায় তবে এই ব্যক্তি যে কোন আর্য্যাবর্ত্তীয় অত্যাচারিত লোক হইবে কোনই সন্দেহ নাই। মহম্মদ বা আল্লাহ ভারতেরই যবনকৃত আর্য্য সন্তান, যাহারা জন্মান্তরে মহম্মদ বা সূক্ষ্মশরীরী আল্লাহ। এ সম্বন্ধে আমাদের ইচ্ছা সত্ত্বেও বিস্তারিত আলোচনা স্থগিত রাখিলাম। মহম্মদ এবং আল্লাহ মিঞার বৈদিক সভ্যতার উপর কিরূপ অসাধারণ বিদ্বেষ ইহা কুরাণেই প্রকাশ পায় নাই, ইহা ১৪ শত বৎসরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বর্ব্বরতায় প্রকাশ পাইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে ভারতে ইহার আয়ু আর ৮০।৯০ বৎসর আছে। আমাদের কথা, যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে যবন করা হইয়াছিল, এবং যাহারা শক্তিশালী হইয়া যবনবাদীয় ধর্ম্মস্থাপনা দ্বারা আর্য্যসভ্যতা ভাঙ্গিয়া যবনধর্ম্ম বৃদ্ধি

করিয়াছিল, আমরা তাহাদের বৈদিক সংস্কার চাই। এবং মানুষ মাত্রকেই বৈদিক ধর্ম্ম দিবার ভারতরাষ্ট্র চাই।

৫। আচার্য্য শঙ্কর প্রায় ১৬শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করিলেন। বৌদ্ধবাদের পতন হইবার ইহাই কারণ ছিল যে ইহা সর্ব্বতোভাবে শক্তিশালী সমাজবাদ ছিল না। বৌদ্ধবাদ খণ্ডিত হইবার প্রায় ৭ শত বৎসর পর ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। আচার্য্য শঙ্করের পর আমাদের সমাজ পৌরোহিত্যবাদীয় সমাজ হয় এবং এই পৌরোহিত্যবাদকে স্থায়ী করিবার জন্য ভাববাদীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। ভাববাদ সমাজকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়াছিল।

৬। মুসলমানেরা লুণ্ঠন ও গুণ্ডামীর জন্য প্রথম এদেশে প্রবেশ করে, পরে ভাববাদিতা ও দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করে। তাহারা খুব তীব্রভাবে এই দেশের সমাজবাদকে ভাঙ্গিয়া দিতে আরম্ভ করিল এবং যবন সমাজ গড়িতে থাকিল। ভারতবর্ষ অত্যন্ত বড় দেশ এবং মুসলমান সম্রাটগণকে এতবড় দেশ হাতের মধ্যে আনিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইতেছিল। যেখানেই তাহারা রাজ্য স্থাপন করে সেই খানেই নানা প্রকারে বাধা পাইতে লাগিল। তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া হিন্দুদের সঙ্গে মিতালী করিয়া রাজ্য বিস্তারে মন দিতে হইয়াছিল। এইভাবে রাজ্য বিস্তারের ফলে রাজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু শক্তি রহিয়া গেল। তাহারাও সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজা, মহারাষ্ট্র ও শিখসমাজ এবং বঙ্গদেশের বার ভুঁইয়া হইতে ইহারা প্রবল বাধা পাইল। এইভাবে প্রায় ৬, ৭ শত বৎসর চলিবার পর ইংরেজ আসিল। হিন্দুরা ইহাদের সাহায্যে মুসলমানদের বর্ব্বরতা নরম করিবার সুযোগ পাইল। ইংরেজ প্রায় ২০০ বৎসর রাজত্ব করিল। ইংরেজ এই দেশ ত্যাগ করিবার ৩০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মুসলমানগণকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। কংগ্রেসবাদীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মুসলমানদের বর্ব্বরতায় ইন্ধন দিতে থাকিল। ইয়ুরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এইরূপ জটীল হইল যে ইংরেজ ভারতের শাসনদণ্ড ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তাহারা যাইবার সময় কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের সহিত একমত হইয়া ভারতকে পাকিস্থান ও ভারত দুইভাগে ভাগ করিল।

৭। দেশ ভাগ হইবার পর ৬ মাসের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্থান হিন্দু শূন্য হইয়া গিয়াছে। আশা করা যায় কয়েক বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্থানও মুসলমানেরা হিন্দু হীন করিতে পারিবে। ভারতের রাজদণ্ড কংগ্রেসীদের হাতে। তাহারা পূর্ব্ববৎ পাকিস্থানবাদীদের এবং পাকিস্থান রাষ্ট্রের সহায়ক ও বন্ধু হইল। পাকিস্থানবাসী হিন্দুরা নির্ম্মম অত্যাচারে বিতাড়িত, নারীরা লাঞ্ছিত হইল। এজন্য কোন ব্যথা কংগ্রেসের নাই। ব্যথা থাকিতেও পারে না, কারণ ভোট পাওয়া ভিন্ন ইহাদের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহারা যবনবাদে চলিয়া গিয়াছে।

৮। পাকিস্থান হইবার পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষের মুসলমানেরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পাকিস্থান গড়িবার এক আন্দোলন আরম্ভ করে। ইহার একদল দেশকে ভাগ করিবার সংকল্প করে এবং নিজদিগকে অন্য জাতি বলিয়া দাবী করে। অন্যদল আজাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসে প্রবেশ করে এবং শাসন ক্ষেত্রে প্রতিশত ৫০টী আসন (আজাদের সভাপতি ভাষণ দ্রষ্টব্য) দাবী করে। ইহাদের সংখ্যা প্রতিশত ১টী এবং ভিন্ন জাতির দাবীর

সংখ্যায় প্রতিশতে ৯৯টী হইবে। ভারত ভাগ হইবার পরও এইসব বিজাতিরা কোন মতলবে পাকিস্থান গেল না এবং পাকিস্থানের হিন্দুরা কেন বিতাড়িত হইল ইহা যে কোন চিন্তাশীল বুঝিতে পারে। কিন্তু ভারতের এই যুগের কংগ্রেস পন্থীরা এত মূর্খ যে তাহারা বুঝিল না। তাহারা এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিজাতিগণকে সংখ্যালঘুর আবরণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। বর্ত্তমানে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রতিশতে ১৩টী হইতে পারে। ১৩টী বিজাতীয় ভোট এবং হিন্দুদের ৩৮টী ভোট অর্থাৎ ৫১টী ভোটে এই দল ভারতের উপর ২০ বৎসর রাজত্ব করিবার সাহস রাখে। প্রতিশত ২৫টী ভোটার ভোট দিলে ১৩ ভোটেই রাজ্য চলে।

৯। শক্তিবাদের মতে সমাজবাদ, উপাসনা, রাষ্ট্রবাদ সবেরই শক্তিবাদীয় দৃষ্টিকোণ আছে। সেই মতে মক্কাবাদ সমাজ অসুরবাদীয় সমাজ। ইহা আমাদের দেশের পৌরোহিত্যবাদীয় সমাজ, বৌদ্ধবাদীয় সমাজ ও ভাববাদীয় সমাজ হইতে সবল। কিন্তু এই সমাজবাদ শক্তিবাদীয় সমাজবাদ হইতে অত্যন্ত দুর্ব্বল। কারণ ইহার দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদিতা অত্যন্ত ভিত্তিহীন। ভারত যদি কুরাণবাদের কঠোর সমালোচনা করিতে থাকে এবং শক্তিবাদীয় সমাজবাদে দীক্ষা লইতে থাকে তাহা হইলে কুরাণবাদ ১২ বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। ভারতে শক্তিবাদীয় সমাজবাদের প্রচার একটু শক্তিশালী হইবার সঙ্গে সঙ্গে মক্কাবাদীয় সমাজ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিবে। ইহারা পাকিস্থান প্রস্তুত করিয়া ভারতের জাতীয়তা হারাইয়াছে। ফলে ইহারা ভিত্তিহীন হইয়া গিয়াছে। সোসিয়ালিজম, কংগ্রেসবাদ বা কম্যুনিজম যাহাই এ দেশের অদ্যকার নীতি হউক না, ইহা সাময়িক হইবে এবং ইসলাম এ দেশের মাটিতে আর থাকিতে পারিবে না। শক্তিবাদ সমাজকেই পৌরোহিত্যবাদীরা, বৌদ্ধবাদীরা ও ভাববাদীরা দুর্ব্বল সমাজে পরিণত করিয়াছে। সিংহশাবককে মেষশাবকের সঙ্গে পালন করিলে সে সাময়িক মেষস্বভাব পাইতে পারে; কিন্তু এমন সময় সেই সিংহশাবকের জীবনে আসা অসম্ভব নহে, যখন সিংহ তাহার নিজের সংস্কার স্বভাব ও আত্মরূপ জানিতে পারিবে। সেই সময় সে আর মেষ থাকিবে না। এ দেশে যে মুসলমান হইয়াছে ইহার কারণ হিন্দু সমাজ দুর্ব্বলতা বরণ করিয়াছিল। প্রায় এক হাজার বৎসর একটা দুর্ব্বল সমাজ কি ভাবে একটা বর্ব্বর ও অসুরসমাজবাদের সুপরিকল্পিত চেষ্টার সামনে আত্মরক্ষা করিল ইহা ভাবিতে বিস্ময় বোধ হয়। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। মহর্ষিগণের আশীর্ব্বাদ যে এই জাতিকে রক্ষা করিয়াছে, ইহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। যে বর্ব্বরতার চাপে আরব, কাবুল, পারস্য, তুরস্ক, পূর্ব্বভারত দ্বীপপুঞ্জ, নিজেদের সংস্কৃতি ধর্ম্ম ও সভ্যতা হারাইয়াছে সেই বর্ব্বরতা ভারতে ভাল ভাবেই বাধা পাইল। যতদিন ভারতে দুর্ব্বল রাষ্ট্রবাদ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন ভারতে এই বর্ব্বর মতবাদ দাঁড়াইয়া থাকিবে। যেদিন দুর্ব্বল রাষ্ট্রবাদের ভিত্তি ভারত হইতে ভাঙ্গিয়া যাইবে সেইদিন কুরাণবাদও শেষ হইয়া যাইবে। একদিন পুরোহিত সম্প্রদায় যেমন আমাদের দেশে বড় আদরের ও সুবিধা গ্রহণের সম্প্রদায় ছিল এখন ভারতে মুসলমানদেরও সেই স্থিতি হইয়াছে। দুর্ব্বল রাষ্ট্রবাদ যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সুযোগ সুবিধা ও তোষণ শেষ হইবে। আফগানিস্থান, পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশগুলি পূর্ব্বে হিন্দুর দেশ ছিল। এ সব দেশ হইতে বর্ব্বরবাদীরা হিন্দুবাদী সভ্যতাকে এমন ভাবে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে যে ঐ সব সমাজ দেহে সেই

প্রাচীন সভ্যতার কোন নিদর্শন বাহির করা কষ্টকর। ইহারা কিরূপ সাংঘাতিক সভ্যতাবিরোধী ও বর্ব্বর তাহা ইহাদের এই সব কার্য্যকলাপ ও ইতিহাস দেখিলে বুঝা যাইবে। আমরা পৃথিবীতে পুনঃ বেদবাদীয় সমাজ, ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্লাবনের এক শক্তিশালী বন্যার কথা ভাবিতেছি। বৌদ্ধবাদ যেমন ভাবে একটা প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছিল ঠিক সেইরূপ একটা শক্তিশালী প্লাবন আনিতে হইবে যাহার সামনে কুরাণবাদ ভাসিয়া যাইবে। ইহাকে আমরা শক্তিবাদের বিপ্লব বলিতে পারি।

১০। অস্থরবাদের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে ইহাতে দুর্ব্বলবাদীরা দাঁত বসাতে পারে না। অস্থরবাদের ভিত্তিতে যুক্তিবাদ ও দার্শনিকতা অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে। এ জন্য এই মতবাদের ভিত্তি দুর্ব্বল। মানুষ জ্ঞান ও যুক্তিবাদ প্রধান জীব। জ্ঞানের ও যুক্তিবাদিতার আলোতে যে মতবাদ দুর্ব্বল থাকে মানুষের মন উহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। কুরাণবাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়গুলি সবই হিন্দুবাদী সম্প্রদায় ছিল। যাহারা কুরাণবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের রক্তে বেদবাদী সভ্যতার সংস্কার বিদ্যমান। কাজেই পৃথিবী হইতে কুরাণবাদ বহিষ্কার অত্যন্ত সহজ। ভারত ইংরাজের শাসনাধিকার ছিন্ন করিয়াছে, কাজেই এখন ভারতের বুকে অবৈদিক সভ্যতার মূল উৎপাটিত হইবেই। ইতিপূর্ব্বে আমরা সিংহ শাবকের ও মেষ সংস্কারের কথা বলিয়াছি। কুরাণবাদীদের সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে। যাহাদের রক্তে উচ্চ স্তরের বৈদিক সভ্যতা ও দার্শনিকতার বীজ বিদ্যমান তাহাদের পক্ষে একটা বর্ব্বর বাদীয় সভ্যতা ধরিয়া রাখিয়া অপদস্থ হইয়া থাকা সম্ভব হইবে না। কাজেই ভারতে ইহাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। বৌদ্ধবাদ ধ্বংসের পূর্ব্বে বৌদ্ধগণকে সমাজে কি ভাবে স্থান দেওয়া হইবে এ সম্বন্ধে গবেষণা হইয়াছিল। ঠিক সেইরূপ কুরাণবাদকে ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্ব্বে ইহাদের সমাজধর্ম্মে স্থান দিবার জন্য একটা গবেষণার প্রয়োজন হইবে। আমরা ভারতবর্ষের সাধু সম্প্রদায় ও ব্রহ্মণ্যবাদী ব্রাহ্মণগণকে এজন্য সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতে অনুরোধ করি। আমরা হিন্দুসমাজের সংস্কার চাই এবং ইহাদেরও সংস্কার দ্বারা সমাজ জীবনের সম্মানজনক স্থান করিয়া দিতে চাই। পাকিস্থান প্রস্তুত হইবার পর পাকিস্থানের হিন্দুরা যেমন মনের তেজ ও বীর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল ঠিক সেইরূপ ভারতের মুসলমানদেরও সেই পরিস্থিতি আসিবে। ইহারা বহু দুষ্কৃতি সাধনের পর কখনও আর মানবতার উচ্চশিরে ভারতে থাকিতে পারিবে না। ইহারা মনমরা হইতে বাধ্য। যাহারা বিজাতি বলিয়া দাবী করিয়া দেশ ভাগ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহারা আর এই দেশে সসম্মানে থাকিতে পারে না। আমরা এই বিজাতি সম্প্রদায়কে পাকিস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। নয় তো ইহারা ভারতের সমাজ জীবনে অত্যন্ত অসম্মানজনক স্থান প্রাপ্ত হইতে বাধ্য হইবে। ভারতের রাষ্ট্রজীবনের উপর কৃত দুষ্কৃতির ফলে ইহাদের পরিস্থিতি কিরূপ হইবে ইহা যে কোন চিন্তাশীল বুঝিতে পারেন। দেশ ভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ বৎসরের বর্ব্বরতা, গুণ্ডামী, নারীলাঞ্ছনা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, কলিকাতা ও নোয়াখালীর মত পশুতা ভারতের গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠানের কার্য্যে ইহারা লিপ্ত ছিল। একথা কেহই ভুলিবে না। এবং দেশ ভাগ হইয়া যাইবার পর যে গুণ্ডামী পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের হিন্দুদের উপর হইয়াছে উহার স্মৃতি দেশ ভুলিতে পারে না। কাজেই এই বর্ব্বরতার অনুষ্ঠানকারী সমাজকে কেহই আজ সম্মানের চক্ষে দেখিবে না। গীতা বলেন - ''বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্''॥ চণ্ডী বলেন - ''যূয়ং

প্রয়াত পাতালম্''। ইহারা যতই ভালমানুষের ভান করুক না কেন ইহারা কিরূপ মানুষ তাহা পৃথিবী খুব ভাল ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ভারতও উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আমরা বলিতে পারি যদি ভারতে শক্তিবাদের যুগ আসে তবে পাকিস্থানের কালরূপেই আসিয়াছে জানিতে হইবে। যদি ভারত শক্তিবাদ গ্রহণ করে তবে পাকিস্থান ও কুরাণবাদ দুইটীই শেষ হইবে। আর যদি ভারত দুর্ব্বলবাদে জড়াইয়া থাকে তবে ভারতরাষ্ট্র ও হিন্দু সভ্যতা বিলুপ্ত হইবে। আমাদের বিশ্বাস ভারতে শক্তিবাদ পুনঃ জাগ্রত হইবে।

১১। কুরাণবাদী সম্প্রদায়ের কথা বলা হইল। এবার কুরাণবাদ সম্বন্ধে সমাজের ধারণা স্পষ্ট করিবার জন্য আমরা কুরাণ হইতে আয়াৎ উদ্ধৃত করিব এবং সেই সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ সহ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

১২। বিস্মিল্লার্রহমানির্রহীম্ (১)। অল্হম্দো লিল্লাহে রাব্বিল আলমীন্ (২)। রহমানির্রহীম্ (৩)। মালিকে য়ো মদ্দীন্ (৪)। ইয়্যাক ন অবুদো ব ইয়্যাক না স্তা অঙ্গীন্ (৫)। ইহ্দিনাস্মিরা তাল্ম স্তাকীন্ (৬)। সিরা তাল্লা জীনা অন্ অম্তা অলয় হিম্ গয় রিল্মন্ জূবে অলয় হিম্ ব লজ্জাল্লীন্ (৭)॥ (অমীন)॥ স্থরা ফতেহা॥

আল্লার নামে (আরম্ভ) যিনি দয়া করেন দয়ালু (১)। সবস্তুতি আল্লার জন্য যিনি সংসারের প্রতিপালক (২)। কৃপালু, দয়ালু (৩)। বিচারের দিনের অধিপতি (৪)। একমাত্র তোমার বন্দনা করি এবং তোমারই সহায়তা চাই (৫)। আমাদিগকে স্থপথ দেখাও (৬)। উহা সেই পথ যে পথে তোমার অনুগ্রহ, এবং সেই পথ দেখাইও না যে পথে তোমার ক্রোধ এবং যাহা পথভ্রষ্টের পথ (৭)। (তাহাই হউক)॥

টিপ্পনী। ইহা আল্লাহ্মিঞার স্তুতি। এই সাতটী স্থরায় নিত্য নমাজ হইয়া থাকে। প্রত্যেকটী নমাজে এই স্তুতিটী উঠা বসার সহিত ৬ বার করিয়া পাঠ করা হয়। এই স্তুতিটীর মর্ম্ম বুঝিলে সমস্ত কুরাণ খানা বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত কুরাণটী এই স্তুতিটীরই ব্যাখ্যা।

এখানে প্রথম আয়াতে তাঁহাকে দয়ালু বলা হইয়াছে, কিন্তু সপ্তম আয়াতে তাঁহাকে ক্রোধী বলা হইয়াছে এবং দুইটী পথের নির্দ্দেশক বলা হইয়াছে, যাহার একটী স্থপথ ও অন্যটী কুপথ। এই স্থপথটী অস্থর ভাব এবং কুপথটী দৈবীভাব, পাঠক কুরাণতত্ত্বে প্রবেশ করুন, সব বুঝিতে পারিবেন। স্থপথ ও কুপথ নামক দুইটী বড় পথের চৌমাথায় একটী পুলিসের মত আল্লাহ্ মিঞা একবার স্থপথটী দেখান এবং অন্যবার কুপথটী দেখান। তিনি দয়ালু ও ক্রোধী এবং স্থপথ ও কুপথ দুইএরই নির্দ্দেশক। স্তুতিটীর ইহাই আসল অর্থ। কুরাণে ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান ''তিনি যাহাকে ইচ্ছা ভ্রান্ত করেন, যাহাকে ইচ্ছা বিপথে চালিত করেন''। স্থরা (১৫) হেজর, আ ১১। স্থরা ১০ যুনস, আ ৯৭॥

অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে লইয়া যাওয়া বা স্থপথে লইয়া যাওয়ার প্রার্থনা বেদে অনেকস্থানেই বিদ্যমান। কিন্তু একই উপাস্যকে দুইটা বিরুদ্ধ পথের দ্রষ্টা বলিবার কথা বেদবিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক।

আল্লাহ্ মিঞা তাহা হইলে চৌমাথার পুলিশের ডিওটীতে ব্যস্তই থাকেন। এই স্থপথ ও কুপথের প্রস্তুত কে করিলেন, আমরা জানিতে চেষ্টা করিতে পারি তো? কুরাণে ইহার উত্তর নাই। আল্লাহ্ মিঞার চৌমাথার ডিউটীর চক্করে কাহার ভাগ্যে কখন যে স্থপথ

এবং কাহার ভাগ্যে কখন যে কুপথ মিলিবে ইহা বোধ হয় আল্লাহ্ মিঞাই জানেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ্ মিঞা একবার সুমার্গ ও একবার কুমার্গ দেখাইবেন কেন? একই ব্যক্তি যদি একবার সুমার্গ ও একবার কুমার্গ দেখান তাহাকে চালিয়াত ছাড়া কি বলা যায়? তাঁহাকে দয়াল বলা হইয়াছে। দয়ালু ইহা কি করিয়া বলা যায়? আমরা কাফের এবং আমরা জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। কিন্তু আল্লাহ্ মিঞার সৃষ্ট জীব ইমানদারদের মধ্যে অনেক কুষ্ঠরোগীকে রাস্তা ঘাটে ভিক্ষা করিতে দেখা যায়, কেন? আবার জন্মান্ধ খোঁড়া, জন্মাবধি অঙ্গহীন অকর্ম্মণ্য ও ঘৃণ্য ব্যাধিগ্রস্ত মুসলমানেরও অভাব নাই; এসব দেখিয়া যে সব মানুষ আল্লা মিঞাকে দয়ালু স্তুতি করে তাহারা কি মিথ্যার প্রশ্রয় দিতেছে না? আমরা বলি, মানুষ এইরূপ দুষ্কৃতিকারী হইলে তাহাকে সকলে মিলিয়া চৌমাথার মধ্যখানে শীখলে বাঁধিয়া এইরূপ দুষ্কৃতির খুব ভাল প্রতিশোধ দিত। এই তো তাঁহার সৃষ্টি ও দয়ার নমুনা? কাহার উপর কখন কুপথ দেখাইয়া কোন ভাল মানুষের সর্ব্বনাশ করিবেন তাহারও স্থিরতা নাই। এমন ব্যক্তির যাহারা স্তুতি করে তাহাদের মতিস্থির থাকিবে কি?

মহম্মদ আক্রাম খাঁ আল্লাহ্ শব্দের বঙ্গানুবাদে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম শব্দের গ্রহণ কেন করেন নাই উহার কারণ দেখাইয়াছেন। আমরাও ইহার বঙ্গানুবাদে আল্লাহ্ই রাখিলাম। কারণ আল্লাহ্ নামক অতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিটীর সহিত আমাদের ব্রহ্ম, ঈশ্বর, দেবতা বা যমরাজা, কাহারও সামঞ্জস্য করা কঠিন। ইহার সঙ্গে আমরা এক পিশাচ বা ব্রহ্ম দৈত্যের তুলনা করিতে পারি। হিন্দুশাস্ত্র ঐরূপ উপাসনাও স্বীকার করিয়াছে। নিম্ন স্তরের শৈববাদী উপাসনা। তামস প্রকৃতির লোক ঐ উপাসনা ভালবাসে। গীতায় তামস লক্ষণ দেখো।

হিন্দুধর্ম্মের উপাসনা স্তুতি আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে দিয়াছি। উহাতে বেদ হইতে গায়ত্রী, তন্ত্র হইতে ব্রহ্মস্তুতি এবং উপনিষদ হইতে মহামন্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমানগণকে দুইটা স্তুতির তুলনা করিতে বলি।

ক্রোধং পারুষ্য মেব চ অজ্ঞান ঞ্চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ গীতা ১৬ অঃ॥ ‘‘হে পার্থ, ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহারা অসুর বৃত্তি।’’ কাজেই দেখা যায় অতিক্রোধী আল্লামিঞার উপাসনা অসুর বৃত্তিরই উপাসনা।

‘‘সমং সর্ব্বেসু ভূতেসু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বং’’। (গীতা অঃ ১৩) ‘‘সমস্ত ভূতে সমান ভাবে স্থিত পরমেশ্বরকে ...’’। ‘‘নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম’’ (গীতা) ‘‘ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম স্বরূপ’’। তাঁহাকে ক্রোধী বলা যায় কি?

আমরা যতবারই কুরাণের অনুবাদগুলি পড়িয়াছি ততবারই মনে হইয়াছে মহম্মদ কোন ইষ্ট প্রেতাত্মার উপাসক ছিলেন। অথবা তিনি নিজেই পিশাচ প্রবৃত্তিকে সফল করিবার জন্য ধর্ম্মের নামে নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে একটী দল গড়েন। পরবর্ত্তী কালে এই দলের নামে অনেকেরই পিশাচ প্রবৃত্তি সফল হইতে চলিয়াছে।

উপনিষদে ঈশ্বর লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন :- ‘‘স পর্য্যগাচ্ছূ ক্রমকায়মব্রণ মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্’’ (ঈশঃ)। ‘‘তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর রহিত, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, জ্ঞানময়, সর্ব্বদর্শী, মনীষি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, স্বয়ং প্রকাশ ও ব্যাপক’’।

কুরাণদ্বারা প্রমাণ হয় না যে তিনি মূর্ত্তিহীন। তাঁহার মূর্ত্তি আছে এবং তাঁহার মূর্ত্তিটা যে মানুষেরই মত ইহার প্রমাণ কুরাণেই বিদ্যমান। দেখো স্থরা আরাজ, আঃ ১১। এখানে তিনি বলিতেছেন ''আদমের মূর্ত্তি তিনি নিজের মতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন''। তিনি উহা যে নিজের দুইহাতে গড়িয়াছেন একথাও অনেক স্থানে আছে। তাঁহার স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান। নয় তো তিনি (আয়াৎ ৪ এর মত) বিচারের দিনে বিচার করিবেন কেমন করিয়া? এই বিচারের সঙ্গে যমরাজার বিচারের কতকটা তুলনা হয়, কারণ কুরাণের মতে আল্লাহ্ মৃতের বিচারক। সেখানে মানুষের কৃতকার্য্যের হিসাব রাখা হয়। ইহা চিত্রগুপ্তের খাতারই কথা। দেখো, স্থরা মরিয়ম আঃ ১৩। কিন্তু যমরাজার বিচারের সঙ্গে আল্লামিঞার বিচারের সামঞ্জস্য নাই। যমরাজার বিচার যুক্তিপূর্ণ কারণ সেখানে ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, সত্য, মিথ্যা, দান, চৌর্য্য, ও সর্ব্বপ্রকারের পাপ পুণ্যের ফলে সাময়িক নরক সাময়িক স্বর্গের ব্যবস্থা আছে। গীতা বলেন, ক্ষীণপুণ্যে মর্ত্তলোকে বিশন্তি। অর্থাৎ পুণ্য ক্ষয়দ্বারা মর্ত্তলোক প্রাপ্ত হয়। আল্লার বিচারকে আমরা অবিচার বলিতে পারি। কারণ, ইহাতে ইমানদারীর জন্য সাময়িক বহিস্ত বলেন নাই, আবার কাফ্রামীর জন্য সাময়িক দুজকও বলেন নাই। এখানে দুজক অনন্ত বহিস্তও অনন্ত। যে সব মিঞারা আল্লাহ্কে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া কাফেরামী করেন তাঁহারা যদি অনন্তকালের জন্য দুজখে থাকেন তবে নিত্য নমাজ পড়িবার দরুণ এবং কাফেরদের উপর গুণ্ডামীর সমর্থন করিবার দরুণ ইহাদের যে পুণ্য উহার ফল কি ভাবে পাইবেন? হিন্দুদের বেদান্তবাদের দার্শনিকতার সামনে মিঃ গড্ ও আল্লাহ্ মিঞার চালবাজী সবই বানচাল হইয়া গিয়াছে। এমন দুঃসময়ে অনেক ইমানদার, ও যিশুবাদীকে আল্লাহ্ বা গড্কে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরসম প্রমাণের চেষ্টায় বহির্গত হইতে দেখা যাইতেছে।

আমরা এ সব ব্রহ্মবাদী ইমানদারগণকে শক্তিশালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে বলি। ধোকাবাজ বিদ্যা চালাইয়া লাভ নাই। দুর্ব্বলবাদীয় সমাজ বা অসুরবাদীয় সমাজ ব্রহ্মবিদ্যা ধারণে মোটেই উপযুক্ত হইতে পারে না। একমাত্র শক্তিশালী সমাজ ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্ম কর্ম্ম ধারণে উপযুক্ত। শক্তিবাদ হারাইয়া ভারত এ জন্য দুর্ব্বল হইয়াছিল।

১৩। স্থরা বগ্রা। (২) এই পুস্তক নিঃসন্দেহ এবং ইহা ধর্ম্ম ভীরুদের জন্য শিক্ষক, (৩) যাহারা অদৃষ্টে বিশ্বাস করে, নমাজ পড়ে, আমার প্রদত্ত বস্তু হইতে খরচ করে, (৪) আর যাহারা তোমার (মহম্মদের) নিকট যাহা নামানো হইয়াছে এবং তোমার পূর্ব্বে যাহা নামানো হইয়াছে এবং যাহাদের কয়ামতে বিশ্বাস আছে, (৫) ইনি (মহম্মদ) নিজের পালকের আদেশ লাভ করিয়াছেন। মাত্র তাহারাই ছুটকারা পাইবে॥

টিপ্পনী। এই ৪টী আয়াতে বিশ্বাসবাদীদের লক্ষণ বলা হইয়াছে। কুরাণখানা সত্যই আসমান হইতে আল্লা মিঞা নামাইয়াছেন অথবা ইহা মহম্মদ সাহেবের গুরু গিরি ও ব্যবসা করিবার একটী ফন্দী এ সম্বন্ধে মক্কায় ভীষণ সন্দেহ জাগিয়াছিল। এই সব সন্দেহকারীদের সঙ্গে কোথায় কি করা বা বলা হইবে সেই সম্বন্ধে বহু কুবুদ্ধির শিক্ষা পাঠকগণ কুরাণে দেখিতে পাইবেন। পাঠকগণ একবার একখানা কুরাণ পাঠ করুন এবং কোন মুসলমানকে কুরাণের উপর আক্রমণ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, দেখিতে পাইবেন তাহারা সেই সব শিখানো মিথ্যা কথা বলিতেছে। কুরাণের পূর্ব্বেও অনেক গ্রন্থ আল্লা

মিঞা পৃথিবীতে নামাইয়াছেন, সেই সব পুস্তকের মধ্যে বাইবেলও একখানা। যাহা হউক কুরাণ নামাইবার ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে আল্লা মিঞা বাইবেল নামাইয়াছেন। লোকে শেষ পর্য্যন্ত উহাকে বিশ্বাসও করিয়াছে। এবার কুরাণের পালা। ইহাকে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। এই বিশ্বাসের প্রথম লক্ষণ এই পুস্তক খানা যে আসমান হইতে নামিয়াছে ইহাতে সন্দেহ করা চলিবেনা, ইহার শিক্ষার উপর জীবন চালাইতে হইবে। কয়ামতে বিশ্বাস করিতে হইবে, নামাজ পড়িতে হইবে। ইহা মহম্মদের নিকটই নামানো হইয়াছে, দলের অন্য কোন লোক যদি দাবী করে যে কুরাণ তাহাদের কাছে নামিয়াছে তবে যেন লোক সেটা বিশ্বাস না করে, প্রত্যেকটী লোকের যিনি প্রভু মহম্মদ তাঁহার আদেশ লাভ করিয়াছেন ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে। এতগুলি সর্ত্তে চলিলে দুজখের আগুন হইতে ছুটকারা পাওয়া যাইবে নয় তো নিশ্চয়ই দুজখ্। এই দলে কেবলই মহম্মদ ছিলেননা। তাঁহার অনেক সাথীও ছিল।

বড় দিদির স্বর্গ কথা। আমার বাল্য কালের একটী সত্য ঘটনা বলি। ইহাতে পাঠকগণ কুরাণবাদের মূল কোথায় বুঝিতে পারিবেন। শারদীয় দুর্গাপূজার পর সম বয়সী কয়েকজন বালক আমাকে স্বর্গে দুর্গাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দিবে বলিয়া লোভ দেখায়। আমি বিশ্বাস করিলাম না। তাহারা তাহাতে নিরস্ত হইল না। তাহারা বার বার এবং প্রতিদিন আমাকে গায়ে পড়িয়া স্বর্গের কথা বলিতে লাগিল। কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সঙ্গে খেলা করা ও দুর্গা মায়ের প্রসাদ দান ইত্যাদি কথা তাহারা আমাকে রোজই বলে এবং স্বর্গে যাইয়া এ সব দেখিয়া আসিতেও বলে। আমি কোন প্রশ্ন করিলে তাহারা সকলে ঠিক একই উত্তর দেয়। এদিকে গ্রামের প্রায় সব সমবয়সী বালকরাই দল বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন দিন তাহারা দুর্গামায়ের প্রসাদে রসগোল্লা খায়, বলে। কোন দিন কলা চিনি ও ফলাদির কথাও বলে। আমি যদিও কোন কিছুতেই বিশ্বাস করি না কিন্তু ওরা ছাড়ে না। শেষ কালে একদিন আমাকে বেকায়দায় পাইয়া তাহারা বলিল, দুর্গা মায়ের আদেশ তোমাকে স্বর্গে যাইতেই হইবে। তুমি চল, এ স্থানে কিছুক্ষণ থাকো। দেখিবে তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য দেবতারা আসিবেন। আমাকে একটা নির্জ্জন সীম গাছের তলায় বসাইয়া ওরা চলিয়া গেল। তুমি দুইঘণ্টার জন্য এখানে থাকো। এরই মধ্যে তুমি স্বর্গে যাইবে এবং ফিরিয়া আসিবে। আমি সেই সীমতলায় বসিয়া থাকিলাম। মশায় আমার শরীরের রক্ত চুষিতে লাগিল। প্রায় ২ ঘণ্টার পর কয়েকটী বালক আসিল এবং আমাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বলিল, মা দুর্গা বলিয়াছেন তোমার আজ আর স্বর্গে যাওয়া হইল না। কাল সকাল বেলা তোমাকে মা দুর্গা রসগোল্লা পাঠাইবেন এবং পরে কিছুদিন বাদ তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন। একথা তাহারা আমাকে বড়দিদির আদেশে বলিল। রসগোল্লার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম "আমি কিছুতেই রসগোল্লা খাইব না।" আমি এতদিনে বুঝিলাম বড়দিদি এই দলের নেতা (বা মহম্মদ)। গ্রামে এক বড়দিদি ছিলেন। তিনি শ্বশুর বাড়ীতে যাইতেন না। বাবার বাড়ী থাকিতেন। তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। যাহা হউক বালকগণ যখন বুঝিল আমি ওদের ফন্দীতে জড়াই নাই তখন ওরা আমাকে একদিকে স্বর্গ ও রসগোল্লার লোভ এবং অন্যদিকে এসব কথা গোপনে না রাখিলে দলবদ্ধভাবে মারিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। আমি অবশ্যই কাহাকেই কিছু বলি নাই। কিন্তু দূরে দূরে থাকিতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে

গ্রামের সব বালকের মধ্যেই এই স্বর্গে যাওয়ার কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সকলেই বলে, তাহারা স্বর্গে গিয়াছে। তাহারা নিত্য নানা রকম মিষ্টান্নও খায়। রসগোল্লার লীলা ও স্বর্গলীলা জানি না কি ভাবে অভিভাবকদের কানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। জানা গেল, কোন কোন বালক মায়ের আঁচল হইতে চাবি লইয়া মার টাকা চুরি করিয়া বড় দিদিকে দিয়াছে এবং সেই সব ধরা পড়িয়াছে। গ্রামের বৃদ্ধ ও অভিভাবকগণ খুব করিয়া নিজ নিজ সন্তানগণকে প্রহার দেন এবং স্বর্গলীলা ঐখানে শেষ হয়। পাঠকগণ কুরাণখানা পড়ুন, দেখিবেন স্বর্গের চিহ্ন, বিশ্বাসের চিহ্ন যে তাহারা অনেকেই দেখিয়াছে, এসব কথার শিক্ষা বেশ প্রবল ভাবেই বিদ্যমান। আবার অনেক স্থানে এইরূপও বলা হইয়াছে যে আল্লাহ্ মিঞা যে ভাবে বৃষ্টি নামান সেই ভাবে আসমান হইতে কুরাণখানা নামাইয়াছেন। বৃষ্টির জল যে সমুদ্র হইতে আসে, ইহা বৈদিক যুগ হইতেই মানুষ জানে, কিন্তু মহম্মদ সাহেবের দল সংঘবদ্ধভাবে একই মিথ্যা কথার প্রচার ও গুণ্ডামীতে পারদর্শী হইতে চলিল। যদি কোন দিন ভীষণ সাংঘাতিক চাবুক মারার দল পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় তবেই এই বড় দিদি ও রসগোল্লার লীলা শেষ হইবে, নয় তো কুরাণবাদ পৃথিবীর সব দেশ ও সব জাতির সভ্যতা বিলুপ্ত করিয়া দিবে। যাহারা ইহাকে ধর্ম্ম মনে করে তাহারা বুঝুক ইহা কোন শ্রেণীর ধর্ম্ম।

১৪। (৬) যাহারা কাফের তাহাদের উপর তোমার ভয় দেখানো বা না দেখানো সমান। (৭) তাহারা মানিবে না। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় কাণ ও নেত্র মোহর করিয়া দিয়াছেন। উহাদের নেত্র আবরণে আচ্ছাদিত। উহাদের জন্য ভীষণ কষ্ট আছে। (সুরা বগ্‌রা হইতে)

টিপ্পনী। যাহারা পূর্ব্বোক্ত আয়াৎ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিশ্বাস করিবে না তাহাদিগকে কাফের বলা হইয়াছে। এখানে আল্লাহ্ মিঞা হৃদয় কাণ নেত্র সবই মোহর করিলেন, কিন্তু মুখটী মোহর করিলেন না! ফলে আল্লাহ্ মিঞাকে ভীষণ তর্কযুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমাদের মতে আল্লাহ্ মিঞা যদি মুখটী মোহর করিয়া দিতেন তবে কাফেররা সকলেই বোবা হইয়া যাইত, ফলে কুরাণ সত্য কি মিথ্যা এ কথাই কেহ জিজ্ঞাসাই করিতে পারিত না। আমরা জানি, কাফেররা সত্যই হৃদয়, নেত্র, কাণহীন জীব নহে। কাজেই, এ সব মিথ্যা কথা বলিয়া আল্লামিঞা খেলো হইতেছেন। আমরা বলি, আল্লাহ্ মিঞা নিজের দুষ্কৃতির কথা ভাব। তোমার এ সব চালবাজীর কথা বুঝিবার শক্তি যে কোন মানুষেরই আছে; তবে চুরি ডাকাতি নারী হরণ ও গুণ্ডামীর ঠিকেদারদিগকে বুঝানো কঠিন। তাহাদের দমনের জন্য প্রচুর শক্তি সমাজকে অর্জ্জন করিতে হইবে।

১৫। "আনন্দের খবর উহাদিগকে দাও যাহারা কুরাণের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভাল করিয়াছে। তাহাদের জন্য বহিস্ত রহিয়াছে। যেখানে ঝরণা রহিয়াছে, মেওয়া ফল খাইতে পাইবে এবং সুন্দরী বিবিরা যেখানে তাহাদের জন্য সব সময় অবস্থান করিতেছে। এইরূপ যখন প্রত্যক্ষ হইবে তখন বুঝিতে পারিবে কিরূপ বস্তু বেহেস্তটী।" আঃ ২৫॥ সুঃ বগ্‌রা॥

টিপ্পনী। পাঠক দেখিতেছেন - কুরাণ জড়বাদের কথাই বলিতেছে। বিবি, টাকা, ধন, এ সব তো ভোগবাদ ভিত্তি। এ কারণ ১৪ শত বৎসরের ইসলামের ইতিহাস জড়বাদী

অসুরদের মত গুণ্ডামীতে পরিপূর্ণ। এখানে দেখা যাইতেছে পশুর মত ভোগ ও বিবিই আল্লাহ্ বাদের ভিত্তি। ইহাকে অধ্যাত্মবাদ মানা যায় না। পাঠক জানিয়া রাখুন বিবিবাদ ভোগবাদ মাত্র। কাজেই কুরাণ ঈশ্বর ভক্তির আড়ালে অনীশ্বরবাদ ও ভোগবাদ এবং জড়বাদ শাস্ত্র। বহিস্ত প্রত্যক্ষ হইবে ৫০,০০০ বৎসর বাদ, যখন কয়ামত হইবে। এতদিন মিঞারা কবরে সুখেই থাকিবেন। কারণ উহা মাটীরই গর্ত্ত। (গর্ত্তে থাকা কুরাণের মত, কিন্তু হাদিসের মতে ইহারা গর্ত্তে থাকিবে না।) এই সুদীর্ঘ কাল ঐ সব সুন্দরী যুবতীগণকে যুবকহীন করিয়া রাখিলে বেচারাগণের কি সুখ হইল? আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ্ মিঞা এই ৫০ হাজার বৎসর কাল ইহাদের সুখের কারণ হইয়া বেচারীদের বিরহজ্বালা কম করিয়া বহিস্তের সুনাম রক্ষা করিবেন। নয় তো বহিস্তঃ এই সুদীর্ঘ কালের জন্য এই সব কোটী কোটী যুবতীর জন্য নরক তুল্য হইবে।

এক এক জন ইমানদার ৭২টী করিয়া বিবি পাইবেন। কিন্তু মিঞানীরা যখন দেখিবে স্বামীগণ অন্য সুন্দরীর রসে মত্ত তখন মিঞানীদের নিশ্চয়ই জ্বালা হইবে। আবার যদি বলা যায় মিঞানীগণও ৭২টী করিয়া ছোকড়া পাইবে এবং মজা করিতে পারিবে, সেটাও মিঞাগণের মনোপূত হইবে না। কে চায় নিজের বিবি অন্য যুবকের সঙ্গে লীলা করে? যদি বল মিঞানীরা ৭২ ছোকড়া পাইবে না, তাহা হইলে মিঞানীদের মুসলমান হইয়া লাভ কি? ইহকালে ৪ সতীনের সংসার, পরকালে ৭২ সতীনের জ্বালা, লাভ কি? আরও কথা আছে, সকলেই তো একেবারে বৃদ্ধ হইয়া মরে না। অনেকেই শিশু ও বাল্যকালেও তো মরিবে? সেই সব শিশুদের ভাগে যে সব বিবিরা পড়িবে এবং যে বালিকাগণকে যুবক দেওয়া হইবে তাহাদের উভয়ের জন্যই কষ্টকর ঘটনা ঘটিবে। যদি বল সেখানে সকলকেই যুবক ও যুবতী করিয়া পাঠানো হইবে। আমাদের মতে সেটাও ভাল কথা নহে; বালিকা ও বালকগণকে সময় না হইতেই কাম লীলার যোগ্য করিয়া দিলে আল্লাহ মিঞা নিন্দিত হইবেন। যে সময় বাচ্চার মায়ের মাই পান করিবার কথা বা পুতুল খেলার কথা, সেই সময়ই যদি তাহাদিগকে ছুন্নৎ করিয়া কামলীলা শিক্ষা দেওয়া যায়, সেটা নিশ্চয়ই সভ্যতা হইবে না। যদি আল্লাহ্ মিঞার কেরামতে শিশুকে দিয়া যোয়ানলীলা সম্ভব তাহা হইলে আর মুসলমান শিশুকে মায়ের মাই চুষিবার অভ্যাস আল্লাহ্ মিঞা না দিয়া একেবারে যোয়ান ও হূর লীলার শক্তিটা মুসলমানদের ঘরে ঘরে করিয়া দিন না? আমরা তাঁহার বহিস্তের কেরামতিটা এখানেই দেখিয়া নয়ন শীতল করি! এবং সত্যই বুঝি তিনি সত্য সত্যই বৃষ্টির জলের মতনই কুরাণখানা তাঁহার যোগ্যভক্ত রসুল মহম্মদের নিকট নামাইয়াছেন।

১৬। "আর উহার পূর্ব্বে কাফেরদের উপর বিজয় চাহিয়াছিল। যাহা কিছু পরিচয় পাইয়াছিল যখন কাছে আসিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহারা কাফের হইয়া গেল। কাফেরগণকে আল্লাহ ঘৃণা করেন।" সুরা বাগ্‌রা॥ আঃ ৮৯॥

টিপ্পনী। আল্লাহ্ মিঞা বিজয় চাহিলেন এতে হারিয়া গেলেন কেন? তিনি হুকুম করিলেই সব সৃষ্টি হয়, কিন্তু তিনি চেষ্টা করিয়া কাফেরদের উপর বিজয় কেন পাইলেন না ? তবে কি আল্লাহ্ মিথ্যা কথা বলিতেছেন যে তিনিই হুকুমের দাপটে সৃষ্টি করিয়াছেন ? আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ঘৃণা করেন বলা হইয়াছে। তাহা হইলে কাফেররাও আল্লাহ্

মিঞাকে ঘৃণা করিবে, কারণ ইহা মনো বিজ্ঞানের নিয়ম। আল্লাহ্ মিঞার ধর্ম্মে যাহারা পদাঘাত করিয়াছে তাহাদিগকে আমরা প্রশংসাই করি। কারণ যুক্তিহীন ও মিথ্যাকথায় বিভ্রান্ত না হওয়া প্রশংসারই কার্য্য এবং মিথ্যা ও ছলনায় আবদ্ধ হইয়া লুণ্ঠন ও গুণ্ডামী দুষ্কৃতিরই লক্ষণ। আল্লা মিঞার কাফেরদের উপর এত ক্রোধ যে তাহাদিগকে দুজকে ফেলিবার সময় থুথু, গয়ার, তামা গলানো তরল পদার্থ পান করাইবার প্রতিজ্ঞা আছে। আমরা আল্লাহ্ মিঞাকে বলি থুথু গয়ের তাঁহার মুখে কাফেররাও দিবার শক্তি রাখে।

১৭। ''আল্লাহ্ যাহা নামাইয়াছেন উহাকে তাহারা অশ্রদ্ধা বশতঃ অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা নিজেদের এই অপকর্ম্মদ্বারা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র দাস তাহাদের উপর আল্লাহ্ কৃপা বর্ষণ করিবেন। কাজেই কাফেররা আল্লার অতি ক্রোধের কারণ হইয়াছে, তাহাদের জন্য সাংঘাতিক কষ্টদায়ক ব্যবস্থা আছে।'' স্থরা বগ্রা আঃ ৯০॥

টিপ্পনী। এ তো আমাদের বড়দিদির কথার মতই কথা হইল! কয়েকজন দুষ্ট লোক জোট পাকাইয়া বলিতে লাগিল ঈশ্বর তাহাদিগকে আকাশ হইতে বই পাঠাইয়াছেন, এই বইকে যাহারা বিশ্বাস করিবে না, তাহাদের উপর অত্যাচার এর ব্যবস্থা আছে। আমার বাল্যকালের সেই বড়দিদির স্বর্গের ঘটনা বিশ্বাস না করিবার জন্য আমার ভাগ্যে কিরূপ অত্যাচার হইত, ইহা আমি সর্ব্বদাই অনুভব করিতে ছিলাম। যদি গ্রামের অভিভাবকগণের খুব জোর মার বালকগণের উপর না হইত তবে সেই দলটীর পরিণতিতে একটী আল্লাহ্ বাদ হইয়া দাঁড়াইত, ইহাতে সন্দেহ কি?

১৮। ''খবর ইমানদারদের জন্য। আল্লাহ্ একদিকে ফারিস্তে পয়গম্বর, জিব্রাইল, মকাইলগণ সহ কাফিরদের শত্রু, তেমনি আল্লাহ্ও কাফেরদের শত্রু।'' স্থরা বাগ্রা॥ আঃ ৯৭।৯৮॥

টিপ্পনী। মহম্মদ আল্লাহ্ মিঞা এবং ফারিস্তেগণকে সামনে রাখিয়া কাফেরদের সঙ্গে ঝগড়ার ফন্দি করিবার জন্য কুরাণ বাদীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন ইহা স্বীকার করিবার দরুণ আমাদের কুরাণ তত্ত্ব স্পষ্ট করিতে স্থবিধা হইল। আমরা বলিয়া রাখি, কাফেররাও আল্লা মিঞা ও তাঁহার দলের শত্রু। যাহারা বলেন ''আল্লাহ্ লাশরীক।'' সেই সব ইমানদারগণ এই আয়াৎগুলির কি ব্যাখ্যা দিবেন? লাশরীক কোন ব্যক্তি কি দলবদ্ধ হইয়া ঝগড়া করিতে পারেন?

১৯। ''এবং মসেস্ তাঁহার অনুচরগণকে বলিলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদেশ দিতেছেন যে তোমরা গোবধ কর।' .....অনুচরগণ বলিল: তোমরা প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, এবং স্পষ্ট করিয়া বল সেই গাভীটী কিরূপ। মসেস্ বলিল সে নিশ্চয়ই বেশী বয়সী বা খুব কম বয়সী গাভী নহে, সে মাঝামাঝি বয়সের গাভী, অতএব তাহাকে বধ কর।'' স্থরা ২, আঃ ৬৭।৬৮॥

টিপ্পনী। আল্লাহ্ মিঞা গোরক্ত পিপাস্থ হইয়াছেন। জনতা গোবধ সমর্থন করে নাই কিন্তু আল্লাহ্ মিঞা এই দুষ্কৃতির আদেশ দিতেছেন। আল্লাহ্ মিঞা গোরক্ত পিপাস্থ পিশাচ কি?

আমরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণকে অনেক স্থানে পিশাচ উপাসনায় দেখিয়াছি। সেই সব পূজায় গ্রামসুদ্ধ মানুষ একত্র হয়। একজন নর বা নারীতে উপদেবতার ভর হয়। তাহাতে জনতা নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। বেশ সঠিক উত্তর দিতেও অনেকস্থানে আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু বেশীর ভাগ কথাই প্রচলিত কথার প্রতিধ্বনি থাকে। একটা বৃহৎ বৃক্ষের কোটরে অনেক সময় ফোঁস ফোঁস শব্দ হইত। আমাদের ধারণা ছিল উহাতে সর্প আছে। আমরা ভরপ্রাপ্ত হাবু মিঞাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সে বলিল সর্প। কিন্তু কয়েক দিন বাদেই দেখা গেল পেচক শাবকগণ কোঠরের মুখে আসিয়া দর্শন দিতেছে এবং মানুষ দেখিলেই ফোঁস করিতেছে। হাবু মিঞা দেখিয়া একটু লজ্জিত হইল।

কথিত আছে মহম্মদ সাহেবের বাল্যকাল হইতেই উপদেবতার আবেশ হইত। যখন তাঁহার বয়স দুই বৎসর তখন তাঁহার পালিতা মা ''ছেলেতে উপদেবতার'' আদেশ হয় বলিয়া মহম্মদ সাহেবকে তাঁহার কাকীমার নিকট (মহম্মদ মাতৃহীন ছিলেন) দিতে আসেন। কথিত আছে মহম্মদের জীবনে এইরূপ উপদেবতার আবেশ অনেকবার হইয়াছিল। মহম্মদ ইহাকে আল্লাহ্‌র আবেশ বলিয়া প্রচার করিতেন। সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত ভক্তগণে পিশাচ ও প্রেতের আবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সব পিশাচেরা জীব হত্যা ও রক্ত দাবী করে।

২০। ''এমন যেন না হয় কি কাফেররা ঈর্ষা পরায়ণ হইয়া তোমার ধর্ম্ম বদলাইয়া না দেয়। কারণ ইহাদের মধ্যে ইমানদারদের অনেক বন্ধুও রহিয়াছে।'' সু ২। আঃ ১০৯॥

টিপ্পনী। আল্লাহ্‌ মিঞার ভয় হইয়াছে যে ইমানদারদের ধর্ম্ম হয় তো বদলাইয়া যাইতে পারে। আমরা বলি, ভারতে যতকাল দুর্ব্বল বাদের রাজত্ব থাকিবে ততদিন ইমানদারদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবার ভয় মোটেই নাই। কারণ তাহাতে গুণ্ডামী লুট ও বর্ব্বরতার সুযোগ পূর্ণ ভাবেই থাকিবে। যে দিন সেই সুযোগ আর থাকিবে না, যে দিন কাফেররা শক্তিবাদীয় নীতি গ্রহণ করিবে সেই দিন আল্লাহ্‌বাদের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

২১। ''আমি আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমার মুখ দেখিতে থাকিব, কিন্তু তুমি কিব্‌লার দিকে মুখ ফিরাইয়াছ কিনা, যাহা আমি দেখিতে পছন্দ করি। মসজিদে বা অন্যত্র যে কোন স্থানে তুমি ঐ দিকে মুখ ফিরাইয়া লইও।'' সু ২। আঃ ১৪৪॥

টিপ্পনী। কিবলার দিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িতে বলিতেছেন। এই কিবলা কেবলেশ্বর শিবের মূর্ত্তি। ইহা ইব্রাহিম পূজিত শিবলিঙ্গ। মক্কার মন্দিরে এই শিবলিঙ্গ এখনও ম্লেচ্ছাচারে অর্থাৎ চুম্বনে পূজিত হইতেছেন। মহম্মদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বাবধি এই কিবলা বা শিবলিঙ্গ হিন্দুদের তীর্থস্থান ছিল। মহম্মদ আলী টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন ইহা সমস্ত আরবের পরিচিত মন্দির ছিল। এবং সমস্ত আরবদেশই মূর্ত্তিপূজক বা হিন্দু ছিল। যাঁহারা চিরজীবন বুৎপরস্তির বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহারা একবার মক্কার মন্দিরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবেন, সেই হিন্দুবাদীয় মুণ্ডন পরিক্রমা ও লিঙ্গপূজা করিতেই হইতেছে। নিত্য নমাজকালে এই শিবলিঙ্গের দিকেই মুখ করিতে হয়। আমরা বলি প্রত্যেক মসজিদে শিবমূর্ত্তি রাখিলে ক্ষতি কি! কুরাণের মতেও এই মন্দির প্রাচীন মূর্ত্তি পূজকদের পূজাস্থান। মহম্মদ তাহাদের পূজা অধিকার বাতিল করেন (দেখো সুরা বরায়ত॥ আঃ ১৭)। মসজিদের অশ্বত্থ পত্রাকার গম্বুজ, অশ্বত্থ পত্রকার দ্বারশ্রী ও মীনার

গুলিতে পর পর সাজানো মঙ্গলঘট হিন্দু ধর্ম্মেরই নিদর্শন। অশ্বত্থ বৃক্ষ আরবে হয় না। ইহা আমাদের দেশেরই সংস্কার। ''অশ্বত্থ সর্ব্ব বৃক্ষানাং'' ''অশ্বত্থমেনাং সুবিরুঢ় মূলং'' (গীতা)। ''সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ'' ''এই অশ্বত্থ, ইহার মূল সুদৃঢ়'' ইত্যাদি গীতারই কথা। অশ্বত্থ পত্রের মত গম্বুজ করা ও দ্বারের শ্রী প্রস্তুত করা এবং মন্দিরের চার কোণে মঙ্গলঘট সাজাইয়া দেওয়া, হিন্দু ধর্ম্মেরই সংস্কার। আমাদের প্রাচীন বহু মন্দিরে ঐরূপ গম্বুজ আছে এবং হিন্দুর প্রত্যেক পূজায় মঙ্গল ঘট দেওয়া হয়। কুরাণ বাদের আল্লাহ্ শব্দ আমাদের তন্ত্র শাস্ত্রের 'হ্লা' বীজের অপভ্রংশ। 'কিবলা' কেবলেশ্বর শিব। হ্লা বীজ ষোড়শীর বীজ মন্ত্র। কেবলেশ্বর ষোড়শীর ভৈরব। বিশ্বনাথ মন্দিরের চারিদিকে পাঠক চতুরস্র দ্বার দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেক শিব মন্দিরে ঐরূপ চতুরস্র দ্বার আছে। আমাদের দেশের মসজিদগুলির দ্বার পশ্চিমদিকে। বিশ্বনাথ মন্দিরের চতুরস্রদ্বারের একটী মাত্র দ্বার দেওয়া হয়। বিভিন্ন দিকে যদিও মক্কার মন্দিরে দ্বার চিহ্ন চারটী। আমাদের দেশের মসজিদের পশ্চিম দিকের ছোট বারান্দার মত যে স্থানটুকু থাকে উহা দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন চন্দ্রের ষোড়শ কলার প্রতীক। ইহাই ইসলামের পতাকাতে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই চন্দ্রকলার প্রতীক এখনও মক্কার মন্দিরে বিদ্যমান। তান্ত্রিক ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠানের নিয়ম হইতেই কিবলার চারিদিকে ছত্রাকারে অবস্থিত থাকিয়া সমাজের নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইতেছে। এই সব নিয়মগুলি মহম্মদ নিজের স্বার্থ সাধনের অনুকূল বলিয়া রক্ষা করেন। এবং ইহার সঙ্গে বাইবেলের ঈশ্বরবাদ ও আদম, ইভ্, শয়তানের ও ফরিস্তের লীলা খেলা যোগ করিয়া এক বিচিত্র ধর্ম্ম স্থাপনা করেন। ইহা আজ বাইবেল বাদ ধর্ম্মও নাই হিন্দুবাদ ধর্ম্মও নাই! ধর্ম্মের নামে এই রাজনৈতিক বিপ্লব পারস্যের সভ্যতা ভাঙ্গিয়া দিবার পর সেখানের চিন্তাশীলগণ ইহার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া নিজেদের প্রাচীন দার্শনিকতা ও তান্ত্রিক সাধনার ধারা কতকটা রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, উহা আজকাল 'সুফীবাদ' নামে খ্যাত। সুফীবাদীরা মার খাইয়া ইসলামের সমাজবাদের ভিত্তি মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু ইসলামের ''দার্শনিকতা বা শয়তানবাদ'' মানিতে পারে নাই। যখন বিপ্লব কোন দেশে আসে তখন মানব সভ্যতার মানদণ্ড গুণ্ডামীর চাপে ভাল ভাবেই ভাঙ্গিয়া যায়। আবার গুণ্ডাবাদও ঐ নিয়মেই ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। মক্কার শিবমন্দির সম্বন্ধে আমরা আবার বলিব। সর্ব্বোচ্চ আকাশে আল্লাহ্র স্থান হইবার দরুণ ভক্তগণের অসুবিধা অনেক। দিনের বেলায় আকাশখানা রাত্রিবেলায় পায়ের তলায় চলিয়া যায়, আবার রাত্রি বেলায় উপরের আকাশ খানা দিনের বেলায় পায়ের তলায় থাকে। কাজেই আল্লাহ্ মিঞা ইহার যে কোন একখানা আকাশে থাকিলে তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টা মানুষের পায়ের তলেই থাকিতে হইবে। অথবা দুইটী আল্লাহ্ মানিতে হইবে। মূর্খেরা ইহাই বলিতে চান যে ৭ খানা আসমান জ্ঞানের সপ্তভূমি। আমরা ইসলামী শাস্ত্রের মতানুসারে সাতখানা আসমানের বিবরণ দিতেছি। তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ঐ সাতখানা আসমান মোটেই জ্ঞান ভূমি নহে - (১) জলীয় আসমান, (২) তামার আসমান, (৩) লোহার আসমান, (৪) রূপার আসমান, (৫) সোনার আসমান, (৬) সর্ব্বারিদ আসমান, (৭) ইয়র্কুত লাল আসমান। আশা করি, বিভ্রান্তদের ভ্রান্তি কাটিবে।

২২। "এমন কোন মনুষ্য আছে যে আল্লাহ্‌কে উধার দিবে। যে দিবে আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া দিবেন।" স্থরা ২॥ আঃ ২৪৫॥

টিপ্পনী। আমরা জানি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরাই উধার চায়। আল্লাহ্‌ মিঞা কি দরিদ্র নাকি? এমন দরিদ্রের উপাসনা কে করে?

আল্লাহ্‌ মিঞার নামে উধারের ব্যবসাটী একদল দুষ্ট লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক স্থানে ঐরূপ এক চালবাজ দরবেশ আসিয়াছিল। সে লোককে আল্লাহ্‌র নামে ধার দিতে বলিত। এবং সেই ধারের মূল্য দ্বিগুণ করিয়া আল্লাহ্‌ দিবেন বলিত। প্রথম প্রথম ২, ১ টাকার ধার দেনেওলা জুটিল, তাহারা এই জুয়াখেলায় সত্যই দ্বিগুণ পাইল। এবং কম লেনদেন করিয়া পস্তাইল। শেষ কালে লোকের বিশ্বাস খুব বাড়িয়া গেল। কয়েকজন ধনী দ্বিগুণের লোভে ১০০০ টাকা করিয়া ধার দেয়। দরবেশটী এক চড়ের উপর আড্ডা করিয়াছিল। ধার দিবার ইহাই নিয়ম ছিল যে বালির নিম্নে টাকা গুজিয়া রাখিয়া যাইতে হইত। যে ধার দিবে সে ঐ দরবেশের সাক্ষাতে বালিতে গুজিয়া রাখিবে। ইহা নির্জ্জনে গুজিতে হইবে ইহাই নিয়ম ছিল। সাত দিন বাদ সেই স্থানে উহার দ্বিগুণ ধন পাওয়া যায়। এক ব্যক্তির পক্ষে মাত্র একবার উধার দেওয়া চলিত। বার বার ধার দেওয়ার নিয়ম ছিল না। ১০০০ করিয়া ধার দেওয়ার ব্যক্তিরা ধার দিবার পর আল্লাহ্‌ মিঞার এজেণ্টটী সে স্থান হইতে গা ঢাকা দেয়। আল্লাহ্‌ মিঞার এই ধারের ব্যবসায়ে অনেক লোকেরই সর্ব্বনাশ হইতে শুনা গেছে। আমাদের পরিচিত এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক আল্লাহ্‌ মিঞাকে দ্বিগুণের লোভে ১৫০০০ টাকা ধার দিয়াছিলেন। তিনিও দ্বিগুণের লোভে আসলই ডুবান। আল্লাহ্‌ মিঞার এই ধারের ব্যবসা বাস্তবিকই বেশ লোভনীয়। আমরা প্রত্যেক ইমানদারকে এইরূপ ধারের ব্যবসা খুলিয়া বেশ অর্থ করিয়া লইয়া গা ঢাকা দিতে বলি। আমরা আল্লাহ্‌ মিঞার দুষ্ট পুষিবার এইরূপ পাকা বুদ্ধির প্রশংসা করি। ইহাতে ইমানদারেরা ধর্ম্মও করিলেন টাকাও পাইলেন।

২৩। ইহা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নহে কি আল্লাহ্‌ তোমাকে ৩০০০ ফারিস্তে দ্বারা সহায়তা করিবেন? স্থরা ৩॥ আঃ ১২৩॥

টিপ্পনী। যখন স্পেনে যবন যজ্ঞ চলিয়াছিল তখন এসব ফরিস্তেগণ কোথায় ছিল? উহারা ঐ রক্ত বিপ্লবে সব কচুকাটা হইয়া গিয়াছিল কি? ভারতবর্ষ হইতে মোঘল পাঠানের রাজ্য ভাঙ্গা কালে ৩০০০ ফারিস্তের সাহায্য কোনই কাজ দেয় নাই কেন? মনে হয়, ইহাদ্বারা আল্লাহ্‌ মিঞা ইমানদারগণকে ধোকা দিতেছেন। শাস্ত্রের সামনে আল্লাহ্‌ মিঞার চালবাজী বানচাল হইয়া কেন গেল?

২৪। "আমরা অনেক জীন্‌ ও মানবকে নরকের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি" স্থরা আরাফ (৭)। আঃ ১৭৮॥

টিপ্পনী। কেহ যদি নিজের দুষ্কৃতির জন্য দুঃখ বা নরক ভোগ করে সেটাতে যুক্তি আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌ এইরূপ কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি কেন করিবেন? আল্লাহ্‌ কি বর্ব্বর নাকি? এইরূপ কথা অনেক স্থানেই বিদ্যমান। আমরা জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ্‌ মিঞা এত নিষ্ঠুর ও দুর্জ্জন কেন যে তিনি জীব এবং জীবকে কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি করিবেন? ইঁহাকে দয়াল বলিয়া উপাসনা করা যায় না।

২৫। "তুমি লুটের পর লুট করিতে বল, আল্লার জন্য ও রসুলের জন্য, ভয় করিবে শুধু আল্লাহ্‌কে।" সু ৮। আঃ ১॥

টিপ্পনী। রসুলের লুটের মালের প্রয়োজন আছে ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কারণ ১৪ জন বিবি পুষিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা কামাই করা কঠিন। কিন্তু কেবল বিবি পুষিলেই তো চলিবে না? পুষ্টিকর খাদ্য না খাইলে অতগুলি বিবিকে সুখী করাও কঠিন। আল্লাহ্‌র নামে ধারে যতটা পাওয়া গেল সেটা ভালই, কিন্তু তাহাতেও না কুলাইলে লুটের যে প্রয়োজন আছে তাহাও স্বীকার করি। রসুলের না হয় প্রয়োজনটা বুঝিলাম; কিন্তু আল্লাহ্‌ মিঞার লুটের মালের প্রয়োজন কি? তিনিও গুণ্ডাদলের সর্দ্দার কি? ঐতিহাসিকরা বলেন, মহম্মদ তাঁহার জীবিতকালে সহস্রাধিক সহর লুণ্ঠন করাইয়াছিলেন।

২৬। "আর লড়াই কর কাফেরদের সঙ্গে যাহাতে ওদের আর বল না থাকে আর সব রাজত্ব আল্লাহ্‌র জন্য। আরও জান কি তুমি যতটা পার লুটীবে, উহা লুটীবে আল্লাহ্‌র জন্য এবং উহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ রসুলের হইবে।" সু ৮। আঃ ৩৯।৪১॥

টিপ্পনী। এখানে ঝগড়ার উস্কানী আল্লাহ্‌র রাজত্ব ও লুটের কথা বলা হইতেছে। লুটের মাত্র ৫ ভাগের ১ ভাগ রসুলের হওয়াটা আমাদের মতে অন্যায় হইল। আমরা বলি ইমানদারগণ, লুটের অর্দ্ধেকটা তোমরা রসুলকে দিবে। যিনি পৃথিবীতে এমন চমৎকার গুণ্ডামী ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাকে এত কম দিলে তাঁহাকে সত্যই ঠকানো হয়। যিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌ মিঞার রসুল তাঁহাকে অন্ততঃ অর্দ্ধেক দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং সে সঙ্গে রসুলিনীদেরও কিছু কিছু না দিলে তাঁহাদের হাত খরচা কি করিয়া চলে? কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ, লুট, রাজ্যবিস্তার এবং নারীর সঙ্গে কাম লীলায় সিদ্ধ মহাপুরুষকে অর্দ্ধেকেরও বেশী লুটের মাল দেওয়া কর্ত্তব্য।

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্র পাণি ধনাপহঃ।
ভূমি দারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্‌॥ মনু।

অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রসহ আক্রমণকারী, ধন লুণ্ঠক, ভূমি ও স্ত্রীকে যাহারা কাড়িয়া লয়, উহাদিগকে আততায়ী (গুণ্ডা) জানিবে। এবং আততায়ীকে আসিতে দেখিলেই তাহাকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিবে। মানুষ দস্যুদিগকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। আর যদি ইহাদিগকে কোন জাতি বিশ্বাসের চক্ষে দেখে তবে তাহারা নিশ্চয়ই গৃহে বিষধর সর্প পোষণ করিবে। এজন্যই ইয়ুরোপে ইসলামের বিরুদ্ধে কচুকাটা বিপ্লব আসিয়াছিল।

২৭। "আর যখন দেখিবে ফরিস্তেগণ কাফেরদের উপর আধিপত্য করিবার চেষ্টা করিতেছে, উহাদের মুখে পিঠে মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সময় আওয়াজ দিবে, আমিও যাইতেছি।" সুঃ ৮। আঃ ৫০॥

টিপ্পনী। ফরিস্তেগণ কি ভাবে মারিবে? তাহারা কি মানুষ বিশেষ নাকি? যাহা হউক আমরা বলিয়া রাখিতেছি, সব খানে গায়ে পড়িয়া গুণ্ডামী করিতে যাইবে না। শক্তিবাদী স্পেনের কথা স্মরণ রাখিও। সেখানে বর্ব্বর বাদীগণকে ২৪ ঘণ্টায় বেহস্তে পাঠানো

হইয়াছিল। আমরা পারশ্য, আরব, ইরাণ, তুরস্ক, আলবানিয়া, মিশর, কাবুল প্রভৃতি জাতিকে বর্ব্বরবাদের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন দাঁড় করাইতে বলিতেছি।

২৮। ''আল্লাহ্ এবং রসুলের নিকট হইতে হজ যাত্রীদের প্রতি আদেশ যে আল্লাহ্ এবং মহম্মদ কাফেরদের সঙ্গে সন্ধি সূত্র হইতে মুক্ত। কাজেই তোমরা যদি দুঃখিত হও এবং সন্ধি হইতে পশ্চাৎপদ হও তবে তোমাদের পক্ষে মঙ্গলের কথা। কারণ তোমরা যদি সন্ধি হইতে সরিয়া আস তাহা হইলে আল্লাহ্কে দুর্ব্বল করা হইবে না। এবং সে সঙ্গে ঘোষণা কর যে কাফেরদের জন্য দুঃখপূর্ণ ব্যবস্থা হইবে।'' সুরা বরায়ত আঃ ৩॥

টিপ্পনী। এখানে মক্কার মন্দিরের যুদ্ধের পর যে সন্ধি হইয়াছিল সেই সন্ধি অমান্য করিতে আল্লাহ্ মিঞা আদেশ দিতেছেন। কেন সন্ধি ভঙ্গ করিতে বলিতেছেন উহার কারণ বলা হইতেছে। সন্ধি মানিলে আল্লাহ্ মিঞা দুর্ব্বল থাকিয়া যাইবেন। কেবল সন্ধি ভঙ্গ করিতেই বলেন নাই সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইতেছে যে ঘোষণা কর, আল্লাহ্ মিঞা কাফেরদের জন্য ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা যে নিরীহ হজ যাত্রীদের উপর গুণ্ডাদের অতর্কিত আক্রমণ, পাঠকগণ বুঝিতেছেন। হজ যাত্রীর ভান করিয়া অস্ত্রধারী গুপ্ত ঘাতকের দলকে মক্কায় পাঠানো হইয়াছিল। মানুষের মনে স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব জাগিলে এই দুষ্কার্য্য সম্ভব হইবে না বলিয়া মহম্মদ আল্লাহ্র আদেশ বলিয়া এই দুষ্কার্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাহারা কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে দুষ্কার্য্যের ঘটনা জানে তাহারা এই দুষ্কার্য্যের পরিমাণ করিতে পারিবে। আল্লাহ্র আদেশে কত দুষ্কার্য্যের প্রবর্ত্তন যে মহম্মদ করিয়াছেন, উহা কুরাণের পাঠকগণ ভাল ভাবেই জানিতে পারিবেন। মহম্মদের পুত্রবধু জৈনাবকে যখন মহম্মদ বিবাহ করেন তখন আত্মপক্ষ পুষ্টির জন্য সুরা আহ্জাবের ৩৭ আয়াৎ প্রচার করা হয়। উহাতে বলা হইয়াছে - ''যেহেতু জৈয়দ তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে দৃঢ় অতএব আমরা তোমার সঙ্গে (মহম্মদের সঙ্গে) তাহাকে বিবাহে মিলন করাইয়াছি। যদি কোন ইমানদার্ পুণ্যপুত্রের স্ত্রীগণকে বিবাহ করে তাহাতে তাহাদের কোন অপরাধ মানা হইবে না।'' সুরা আহ্জাবে মহম্মদ সাহেবের লীলা খেলার সব সুবিধাই আল্লাহ্ মিঞার নামে তিনি ব্যবস্থা করিয়া লন। মেরী নাম্নী অতি সুন্দরী এক ক্রীতদাসীর উপর মহম্মদ সাহেবের প্রেমাধিক্য হেতু তাঁহার স্ত্রীগণে ঈর্ষা উদয় হয়। তাঁহাদের সঙ্গে মহম্মদ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন যে ''মেরীকে তিনি আর স্পর্শ করিবেন না।'' কিন্তু তিনি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার জন্য আল্লাহ্ মিঞার আদেশ পান। সুরা তাহ্রীম। আয়াৎ ১।২॥ ''হে রসুল, তুমি কেন হারাম মনে করিতেছ? আল্লাহ্ তোমাকে তোমার স্তী গণের সঙ্গে সম্ভোগে উদারতা পোষণ করেন। তিনি দয়ালু ও উদার। আল্লাহ্ তোমাকে প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি দিলেন।'' গীতার অসুর লক্ষণে বলিয়াছেন - ''ন শৌচং নাপি চাচারং ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।'' (গীতা ১৬ অঃ) ''তাহাদের শুচিতা নাই, তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য নাই, তাহাদের সত্য নাই।'' কুরাণ ভাল কি মন্দ আমরা এখানে সেই কথা বিচার করিতে বসি নাই। আমরা কুরাণের নিন্দাও করিতে চাই না। নিন্দা করা নিন্দুকের কার্য্য। আমরা এ পৃথিবী হইতে অসুর বাদের উচ্ছেদ চাই। শক্তিবাদ নিন্দা করার মতবাদ নহে। ইহা অসুরবাদের উচ্ছেদক মতবাদ। নিন্দাদ্বারা অসুরবাদ ধ্বংস হয় না। ইহা শক্তিদ্বারা ধ্বংস করিতে হয়।

২৯। "অতএব যে দিন রমজানের মাস অতীত হইবে সেই দিন মূর্ত্তিপূজক যেখানেই পাইবে হত্যা করিবে।" সুরা বরায়ত। আঃ ৫॥

টিপ্পনী। দেখা যায় ওদের সন্ধি অতর্কিতে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ফন্দী মাত্র। এবং ভালভাবে প্রস্তুত হইয়া কাফেরগণকে সর্ব্বনাশ করা মাত্র। নিরীহ ধর্ম্ম পিপাসু জনতাকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছিল। গুণ্ডার দল হজ যাত্রীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করিয়া এই ভীষণ দুষ্কার্য্য সাধন করিয়াছিল।

৩০। "তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরই হাতে তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড দিবেন। এবং তাহাদিগকে তোমাদের নির্দ্দয়তার ক্ষেত্র করিবেন। তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন এবং ইমানদারদের হৃদয়কে তুষ্ট করিবেন।" সুরা বরায়ত। আঃ ১৪॥

টিপ্পনী। আল্লাহ্ মিঞা ইমানদারদের হাতেই কাফের মানুষকে আল্লার উপর বিশ্বাস হীনতার সাজা দিবেন কেন? তবে তিনি যে দুজকের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন সেটা কি নিজের জন্য নাকি? এই সব দুষ্কার্য্যের দ্বারা মহম্মদ ও তাহার চেলাগণের রাজ্য বিস্তারে গুণ্ডামী করিবার জন্য দুজকের ভয় দেখানো তো? দুজকতো দেখা যায় সব ইমানদারদেরই হাতে। আমি বলি, কাফেররা কেন ঐরূপ একটা দুজকবাদ অবিষ্কার ১৪ শত বৎসরে করিল না?

৩১। "এ কি! তোমরা কি মনে কর আল্লাহ্ তোমাদিগকে সকলকে জানেন না? এবং তোমাদিগকে একা ছাড়িয়া দিবেন? যাহারা কঠোর যুদ্ধ করিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রসুল ভিন্ন অন্য কাউকেও মানো নাই। আল্লাহ্ সব জানেন।" সুরা বরায়ত। আঃ ১৭॥

টিপ্পনী। একটা জনসমষ্টিকে কি ভাবে বর্ব্বর করা হয় এবং স্বার্থ সিদ্ধ করা হয়, এখানে সেই কথা বলা হইতেছে। যে দিন কুরানবাদ পৃথিবীতে আসিয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই বর্ব্বরবাদকে ভাঙ্গিয়া দিবার কেন কোনই ব্যবস্থা হয় নাই উহা ভাবিতে আশ্চর্য্য মনে হয়।

৩২। "মূর্ত্তি পূজকদের মক্কার মন্দিরে দর্শন করিবার আর অধিকার নাই। তাহারা বিশ্বাস করে না ইহাই তাহাদের অনধিকারের কারণ। তাহারা নিজেদের কাফেরামী দ্বারা নিজেদের অধিকার নষ্ট করিয়াছে।" সুরা বরায়ত। আঃ ১৭॥

টিপ্পনী। মক্কার মন্দির হিন্দুদের প্রাচীন তীর্থস্থান ছিল। আরবদেশ হিন্দুধর্ম্ম প্লাবিত দেশ ছিল। এখানের ইব্রাহীম পূজিত শিবলিঙ্গ এখনও কাবা নামে পূজিত। ঔরঙ্গজেবের সময় কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করা হইয়াছে। মূর্ত্তিও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। মক্কার কেবলেশ্বর (কেবল মানে একেশ্বর) শিবের মূর্ত্তিটী মাত্র আছে। সেই মন্দিরে আরও অনেক মূর্ত্তি ছিল সেইগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। যখন হইতে মক্কার মন্দিরে ভক্তদের প্রবেশ বাতিল হইয়া বর্ব্বরদের আধিপত্য হয় সেই বৎসরের নাম হিজরি ৯ম্ বৎসর।

৩৩। "হে ইমানদারগণ! মূর্ত্তিপূজকগণকে অপবিত্র জানিও। কাজেই তাহাদিগকে মন্দিরে এই বৎসরের পর আর প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। এবং যদি তোমরা মনে কর যে ইহার ফলে তোমাদের অর্থাভাব হইবে তবে সেটা আল্লাহ্ পূর্ণ

করিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন ও কৃপা করেন। আল্লাহ্ সব জানেন।'' স্বরা বরায়ৎ আঃ ৮॥

টিপ্পনী। উলঙ্গ সন্ন্যাসীগণও কেবলেশ্বর মন্দিরে সমবেত হইতেন। মহম্মদ আলী ১০৪৬ নং ফুট নোটে লিখিয়াছেন - ''and went naked round the Kaba.'' ''তাহারা উলঙ্গ হইয়া কাবার চারিদিকে যাইত।'' বিশ্বনাথ (কাশী) ও অন্যান্য হিন্দু তীর্থেও সন্ন্যাসীরা উলঙ্গ প্রবেশ করেন। কাবার প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানে বহু দূর দূর হইতে যাত্রী যাইতেন। যাত্রীদের যাওয়া বন্ধ হওয়ায় মন্দিরের আয় ও পাণ্ডাদের ব্যবসা সাময়িক নষ্ট হইয়াছিল এবং সাময়িক অর্থাভাবও হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। মহম্মদের জীবন কালেই বর্ব্বরদল দ্বারা সহস্র সহস্র সহর লুণ্ঠিত হইয়াছিল। লুট তান্ত্বিকতার জন্য ধনের অভাব মক্কাবাসীদের ছিল না।

মহম্মদ আলী ফুটনোটে বলিতে চান যে এই মন্দির ইব্রাহীমের যুগে মূর্ত্তিহীন মন্দির ছিল। পরে মহম্মদ ইহাকে আবার মূর্ত্তিহীন করিয়াছিলেন। ''It had long remained in the hands of the idolaters, who abode therein, visiting and repairing it, having placed a large number of idols within it'' ''ইহা বহুদিন মূর্ত্তিপূজকের অধিকারে ছিল। তাহারা ইহাকে অধিকার করিয়াছিল। তাহারা তীর্থ করিতে আসিত। ইহাকে সংস্কার করিত এবং অনেক মূর্ত্তি রাখিয়াছিল।''

মহম্মদ আলী যদি বলিতে চান যে কাবার মন্দিরে এখন আর মূর্ত্তি নাই তাহা হইলে আমরা উহা মানিলাম না। আমরা ভাল ভাবে জানি, আরবের কেবলেশ্বরের মন্দিরে এখনও ইব্রাহীম পূজিত কাবার মূর্ত্তি বিদ্যমান। মহম্মদ আলী আরও বলিতে চান কাবার মন্দির ইব্রাহীমের যুগে মূর্ত্তি হীন ছিল। আমরা তাঁহার এই কথার সঙ্গেও একমত নহি। আমাদের মতে ইব্রাহীম শিবের উপাসক ছিলেন। কাবার মন্দিরের প্রাচীন শিবলিঙ্গ তিনি পূজা করিতেন। কাবার মন্দির ইব্রাহীমেরও বহু যুগ প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান। ইহা হিন্দুদের অতীব প্রাচীন তীর্থ। এখানে যাত্রীরা নানা দেশ হইতে সমবেত হইতেন। হিন্দু তীর্থের অনুষ্ঠানের মত অনেক অনুষ্ঠান এখনও সেখানে যাত্রীদের সম্পন্ন করিতে হয়। ''মুণ্ডন করা, নখ কাটা, ব্রত পালন করা এবং মন্দিরের পরিক্রমা করা।'' দেখ স্বরা হজ্ (২২) আয়াৎ ২৯॥ এই স্বরার ২৬ আয়াতে এই মন্দির যে ইব্রাহিমের যুগ হইতে প্রাচীন এ কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ''আমরা ইহার পর এই মন্দিরের স্থান ইব্রাহীমের হাতে সমর্পণ করি।''

মহম্মদ আলী তাঁহার কুরাণের ফুট নোটে একটু ভয়ের সহিতই বলিয়াছেন - Hence the idol worshippers have nothing to do with it now...their idols could no longer be obtained here. অর্থাৎ ''অতএব মূর্ত্তি পূজকদের এই মন্দির সম্বন্ধে আর কিছুই করিবার নাই। কারণ তাহাদের মূর্ত্তিগুলি আর সেখানে পাওয়া যাইবে না।'' আমরা বলি সেখানের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিলেই সেই মন্দির ও স্থানের অধিকার মূর্ত্তি পূজকদের থাকিবে না কেন? গুণ্ডামী করিয়া কাশী বিশ্বনাথের মন্দির দখল করা হইয়াছিল বলিয়া কি চিরদিনই ঐ মন্দির বর্ব্বরদের দখলে থাকিবে? এ তো রাষ্ট্র শক্তির কথা। রাষ্ট্রশক্তি হাতে করিয়া কেবল মক্কার মন্দির দখল করা হয় নাই, উহার বলে পূর্ব্ব

পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব দিকেই মন্দির ভাঙ্গিয়া মূর্ত্তিহীন করা হইয়াছে এবং মানুষকে অসভ্য ও বর্ব্বর সমাজভুক্ত করা হইয়াছে। ভারতে রাষ্ট্রশক্তির পুনঃ প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা আজও দুর্ব্বলবাদী ও হিন্দু বিরোধী নেতাগণদ্বারা পরিচালিত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভারতের এই দুর্ব্বলতা চিরদিন থাকিবে না। ১০০০ বৎসরের বর্ব্বরবাদিতা যাহাদিগকে নিজের দেশকে ভাগ করিবার দুষ্কৃতির সংস্কার জাগাইয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই আরও অধিক দুষ্কৃতির ফন্দীতেই এই দেশে এখনও আছে। আমরা মহম্মদ আলীকে বলি, ভারতে নিশ্চয়ই একদিন যবন বিরোধী আন্দোলন আসিবে এবং সেই ঢেউ মক্কার কেবলেশ্বর মন্দির পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে। আমরা বাল্যকালে গ্রামবাসী নিরক্ষর মহিলাদের নিকট কাবার মন্দিরের কথা শুনিয়াছি। তাঁহারা বলিতেন - একদিন ঐ শিবের মাথায় গঙ্গাজল ও বেলপত্র পড়িবে এবং শিব তখন দুলিয়া উঠিবেন এবং পৃথিবী হইতে যবনবাদ শেষ হইবে। এ সম্বন্ধে গ্রাম্য মহিলারা অনেক অসম্ভব কথাও বলিতেন। তাঁহারা বলিতেন - ''কোন ব্রাহ্মণ হাতের চামড়া কাটিয়া উহার মধ্যে বেলপাতা লইয়া গিয়া শিবের মাথায় দিবার চেষ্টা করিয়া ধরা পড়েন এবং যবন কর্ত্তৃক নিহত হন।'' একদিন কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির বর্ব্বরদের হাত হইতে চলিয়া আসিবে। অযোধ্যার রামের মন্দির মুক্ত হইবে। মক্কার কেবলেশ্বরের মন্দিরও আবার হিন্দুতীর্থ হইবে। আজও আমাদের দেশের নেতৃত্ব হিন্দুধর্ম্মবিরোধী ও বর্ব্বরধর্ম্ম ও বর্ব্বরবাদ স্তাবকদের মুষ্টিগত, একদিন ঐ দিন নিশ্চয়ই থাকিবে না। আমরা বলি ঐ আর্য্য সমাজ, ঐ রাষ্ট্রীয় সংঘ, ঐ হিন্দু মহাসভা এবং সাধু সন্ন্যাসীরা এখনও অস্তিত্বহীন হয় নাই। ইহা সত্য ঘটনা যে এক হাজার বৎসর ইংরেজ ও মুসলমান যাহা করিতে পারে নাই, ভারতের দুর্ব্বলবাদী নেতারা উহা হইতেও ভারতের হিন্দু সভ্যতার অনেক বেশী ক্ষতি করিয়া দিয়াছেন - আজ তিন বৎসর ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পাকিস্তানের হিন্দুরা ধনে, প্রাণে, মানে, সম্মানে, লুণ্ঠনে, গৃহদাহে, প্রকাশ্য ও গুপ্ত হত্যায় নিঃশেষ হইয়াছে। যাহা হাজার বৎসর সম্ভব হয় নাই তাহা আজ তিন বৎসরে সম্ভব হইয়াছে। পাঠক জানিয়া রাখুন, একটা দুষ্ট পিশাচের পরমায়ু যতদিন মক্কাবাদের আয়ু উহা হইতে বেশী দিন হইবে না।

মহম্মদ পূর্ব্বে জেরুজালেমের মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিতেন। মহম্মদ আলী এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :- he used to pray with his face to the Holy temple at Jerusalem (ফুট নোট ১৮১)। অর্থাৎ ''তিনি জেরুজালেমের পবিত্র মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিতেন।'' কুরাণ স্বরা ২, আঃ ১৪২ তে এই কথার উল্লেখ আছে - ''মূর্খেরা যদি জিজ্ঞাসা করে তোমরা কিবলা বদলাইলে কেন, যে কিবলা তোমাদের ছিল? উত্তরে বলিবে - পূর্ব্ব ও পশ্চিম একই আল্লার...''। আমরা বলি, যদি পূর্ব্ব ও পশ্চিম একই আল্লার তবে তোমরা পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় মুখে নমাজ পড় না কেন? যা হউক, মহম্মদ খৃষ্টবাদী ধর্ম্মের কতক অংশ এবং মক্কাবাদী ধর্ম্মের কতক অংশ মানিতেন। তাঁহার ধর্ম্মমত হইতে আমরা হিন্দু ধর্ম্মের অনেক অংশ উদ্ধার করিতে পারি। তিনি উহার সঙ্গে ইহুদিদের বা খৃষ্টান বাদের ''শয়তান বাদ'' যোগ করিয়া ধর্ম্ম স্থাপনের ফন্দী করেন। তিনি বুঝিলেন, জেরুজালেমের মন্দির হস্তগত করা অপেক্ষা মক্কার মন্দির হস্তগত করা সহজ হইবে। কাজেই তিনি ''কিবলা'' বদলের দিকে মন দেন। তিনি

দেখিলেন, জেরুজালেমের মন্দির দখল করা সম্ভব হইবে না, তখন তিনি মক্কার শিবমন্দির দখলের মতলব করেন। পরের ধর্ম্মমন্দির দখল করিয়া লওয়া যত সহজ একটা মন্দির প্রস্তুত করা তত সহজ নহে। যুক্তিবাদ ও দার্শনিকতাকে ভিত্তি করিয়া একটা মতবাদ দাঁড় করানো যত কঠিন গুণ্ডামী করিয়া বর্ব্বরদল প্রস্তুত করা তত কঠিন নহে। মহম্মদ আলী সুরা ২, আয়াৎ ১৪২ এর টিপ্পনীতে (টিপ্পনী নং ১৮১) বলিয়াছেন The Jewish element was strong and powerful, he was directed by divine revelation to turn his face to the Kaba as his Kibla. অর্থাৎ ''জূদের দল সেখানে শক্তিশালী ছিল, কাজেই তিনি কাবার মন্দিরে মুখ ফিরাইবার জন্য দৈব আদেশ পান।'' আমরা বলি, জূরা শক্তিশালী ছিল, তাহাদের সঙ্গে সেই গুণ্ডামী বিপরীত ফল দিবে, ইহা মহম্মদ জানিতেন। কাজেই নিরীহ হিন্দুবাদী সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করিবার ফন্দীটী আল্লাহ্‌র আদেশের নামে সফল করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি - আরবে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল। তন্ত্রবাদে বহু প্রণবের উপাসনা আছে। পৃথিবীর এক এক দিকে এক একটী প্রণবের প্রাধান্য ছিল। যথা:- (১) অ + উ + ম্‌ = ওঁ। (২) অ + অ + ই + ম্‌ = ঐঁ। (৩) হ্‌ + ঋ + ই + ম্‌ = হ্রীঁ। (৪) উ + অ + ম্‌ = বম্‌। (৫) অ + ল + ম্‌ = অলম্‌ ইত্যাদি। তন্ত্রে প্রত্যেকটি বীজ মন্ত্রেরই অর্থ দেওয়া আছে (ক্রমবিকাশ ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মহম্মদ হ্লা বীজের উপাসক ছিলেন। আল্লাহ্‌ এই হ্লা বীজেরই অপভ্রংশ। ইহা ভোগবাদীর বীজ মন্ত্র। এই বীজ মন্ত্র ও 'অলম্‌' প্রণবের দেবতা ষোড়শী। ষোলটী চন্দ্র কলায় এই বীজ মন্ত্র প্রকাশিত। এই মন্ত্রের ভৈরব কেবলেশ্বর শিব। প্রত্যেকটী হিন্দুতীর্থেই এই রূপ বিভিন্ন বীজমন্ত্র, ভৈরব ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরের ভৈরব বিশ্বনাথ শিব। ইঁহার শক্তি অন্নপূর্ণা। ইঁহার বীজ ''বম্‌''। ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু, শিখ সব ধর্ম্মের মূলে তন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত। পাঠক জানিয়া রাখুন এ সব বীজ মন্ত্রে পিশাচ উপাসনা করিলে পিশাচ সিদ্ধি সহজে হয়। ইহার বলে পিশাচকে শক্তিশালী করা হয়। মহম্মদ যে পিশাচসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পিশাচদের পরমায়ু বেশী দিন নয়, এ জন্য এই মতের ধ্বংস নিশ্চয়। জগন্নাথের ভৈরব পুরুষোত্তম, শক্তি বিমলা। মক্কার ভৈরব কেবলেশ্বর শিব। (কেবল মানে একেশ্বর)। ইহার ভৈরব ষোড়শী। মক্কার মন্দিরে এখনও সেই শিব ও চন্দ্রকলার প্রতীক বিদ্যমান। ''হ্লা'' অথবা ''অল্লহ্‌'' একই বীজ মন্ত্রের দুইটী রূপ। হ্লা = ঃ + ল + অ + অ। অল্লহ্‌ বীজেও উহাই আছে। যথা - অ + ল + ল + অ + ঃ। এখানে ''ল'' দুইটী আছে। ইহার অর্থ ভোগের অত্যধিক শক্তি। যাঁহারা তন্ত্র শাস্ত্রে প্রবেশ করেন নাই তাঁহাদের শক্তি নাই বীজ মন্ত্রের অর্থ ভেদ করেন। যোগ বিদ্যায় যাহারা প্রবেশ করে নাই, তাহাদের শক্তি নাই যে শিব মূর্ত্তির বিজ্ঞান বুঝিতে পারে। এ জন্য কিবলা সম্বন্ধে মুসলমানেরা মূর্খের মত যা তা বলিয়া থাকে। কেহ বলে ইহা এক সময় শ্বেত ছিল এখন কালা হইয়াছে। কেহ বলে ইহা আদমের সঙ্গে আল্লাহ্‌ মিঞা দিয়াছেন। আমরা বলি যদি কৈবল্য দেবতার অর্থ বুঝিতে চাও তবে তান্ত্রিক যোগীর নিকট এসো। যদি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রবর্ত্তিত প্রণব গুলির বিজ্ঞান বুঝিতে ইচ্ছা কর, তবে তান্ত্রিক যোগীর নিকট এসো। আর আমার নিকট শুনিয়া রাখ, মক্কার মন্দির

শিবের মন্দির মাত্র। গুণ্ডামী করিয়া মহম্মদ উহা দখল করিয়াছেন। গুণ্ডামী করিয়া শৈববাদকে তিনি শয়তান বাদের ধর্ম্মে বা ইহুদি বাদীয় ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন করেন। কৈবল্য মানে মুক্তি। জ্ঞানে মুক্তি হয়। বিবিবাদ ও শয়তান বাদে মুক্তি কোথায়? শয়তান বাদ ত্যাগ কর এবং ব্রহ্মবাদ গ্রহণ কর। তাহাতেই জ্ঞানের সন্ধান হইবে। শয়তানী লীলাখেলার মিথ্যা কথা মহম্মদ সাহেব খৃষ্টান ধর্ম্ম হইতে ধার করিয়াছেন। দুষ্টের প্রভাবে পড়িয়া ১৪ শত বৎসর তো যথেষ্ট গুণ্ডামী করিয়াছ। এবার সব গুণ্ডামী ছাড়ো। ঐ শয়তানী কথা ত্যাগ কর। বিয়োগ গতিতে জপ ত্যাগ করিয়া সংযোগ গতিতে জপ কর। মহম্মদ ইহাকে অসুর বাদের ভিত্তি দিবার জন্য শুক্রবারকে প্রধান স্থান দেন। শুক্রবার যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের প্রতীক, ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞগণ জানেন। অসুরবাদকে কেন্দ্র করিবার জন্য তিনি বিলোপ* বিধিতে জপ প্রচলন করেন। অর্থাৎ মালাকে উল্টা করিয়া ঘুরাইবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। এই সম্বন্ধে তন্ত্রের প্রমাণ :-

তামসাস্তে মহাদেবি, তামসং ভাবমাশ্রিতাঃ।
সংযোগঞ্চ বিয়োগঞ্চ মন্ত্রাণাঞ্চ দ্বিধাঃ গতিঃ।
সাত্ত্বিকো রাজসো দেবি সংযোগঃ ফল দায়কঃ।
বাহ্যাভ্যন্তর বিয়োগেন সংযোগোহি অনুত্তমঃ।
তামসে তু বিয়োগঃ স্যাদ্ বাহ্য সিদ্ধি ফল প্রদঃ॥

যোগিনীতন্ত্র॥

হে মহাদেবি! তাহারা (যবনগণ) তামস্ (অজ্ঞান) ভাব আশ্রয় করিবার কারণ তাহারা তামসঃ বলিয়া খ্যাত (অসুর, অজ্ঞানী ও অতিক্রোধীকে তামস বলে)। সংযোগ ও বিয়োগ বিধানে জপ ক্রিয়ার নিয়ম আছে। সংযোগ বিধানে জপ করিলে সাত্ত্বিক ও রাজস ফল পাওয়া যায়। কিন্তু তামস বিধানে জপ করিলে উহাকে বিয়োগ জপ বলে। ইহা বাহ্য সিদ্ধি দান করে (অর্থাৎ ইহা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য দান করিলেও জ্ঞান দান করে না)।

এখানে দেখা যায় মহম্মদ মক্কার মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া যে ধর্ম্ম বিধানের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন উহা কখনও ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন মানুষের জন্য উদার হইতে পারিবে না। জ্ঞানহীন ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিজের দল ভিন্ন অন্য কাহারও সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবার শক্তি লাভ করিতে পারিবে না। গীতার তামস লক্ষণ ও তামসদের প্রেত উপাসনার কথা আমরা অন্যত্র বলিব।

মহম্মদ আলী কাবার শিব মূর্ত্তিকে চুম্বন করাকে কোন শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি গায়ের জোরে এই শিব মূর্ত্তিকে প্রাচীন মূর্ত্তি পূজকদের পূজ্য মূর্ত্তিও স্বীকার করেন নাই। আমরা বলি সত্য কথা স্বীকার করিলে মহম্মদ আলীর কীবলা ধ্বসিয়া যাইত না। আমরা ভালভাবেই প্রমাণ করিতে পারি - কিবলার চুম্বন ও দর্শনই মক্কার মন্দিরের আজও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান। প্রত্যেক হজ যাত্রীর এই কালা বর্ণের পাথরখানাকে ৭ বার চুম্বন করিতে হয়। মহম্মদ সাহেব ও ইব্রাহীম সকলেই এই শিবের চুম্বন করিয়া নিজেরা ধন্য হন।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - ''বিলোপ'' স্থানে ''বিয়োগ'' শব্দের প্রয়োগ স্বাভাবিক।

''হজর অল অস্বদ'' এর সামনে যাইয়া তীর্থ যাত্রী ইহাকে চুম্বন করেন। যদি লোকের ভীড়ে চুম্বন অসম্ভব হয় তবে হস্ত বা যষ্ঠি দ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া হস্ত বা যষ্টির সেই অংশ চুম্বন করিতে হয়। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরেও সন্ন্যাসীগণ দণ্ড স্পর্শ করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠান কালে এখন মক্কায় যে মন্ত্র পাঠ হয় উহার অর্থ যথা - ''হে আল্লাহ্ তোমার বিশ্বাসে, তোমার শাস্ত্রের কথানুসারে, তোমার নবীর আদর্শ মতে, (আল্লা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও রক্ষা করুন) আমি ইহা করিতেছি। আমার নিবেদন গ্রাহ্য কর। আমার বাধা ক্ষয় কর। আমার নম্রতার প্রতি করুণা কর। দয়া-পূর্ব্বক আমায় তোমার ক্ষমা প্রদান কর।'' ইহার পর মহম্মদের প্রশংসা ও তাহার জন্য প্রার্থনা করিয়া হিন্দুতীর্থের মত সঙ্কল্প করিতে হয় যথা - ''আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্ই সর্ব্বশক্তিমান, আমি সাতবার প্রদক্ষিণ করিবার অভিপ্রায় করিতেছি।'' ইহার পর যে স্থানে কাবা রক্ষিত আছে সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ বার মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়। এক একবার প্রদক্ষিণের পর কাবা চুম্বন করিতে হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি মহম্মদ আলী সত্যবক্তা, না কি এ সব ঘটনা সত্যের দৃষ্টান্ত? মহম্মদ আলী তো দূরের কথা, মহম্মদ স্বয়ং যে ইহা চুম্বন করিতেন তাহা পর্য্যন্ত এই মন্ত্র মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কাশী বিশ্বনাথ তীর্থে পিশাচমোচন তীর্থ আছে। মক্কার পিশাচমোচন এখন সয়তান স্তম্ভ হইয়াছে। কাবা অথবা কিবলা, অলম্, হুলা বা আল্লাহ্, পিশাচ মোচন বা সয়তান স্তম্ভ, ইব্রাহীম প্রস্তর, ৭ বার প্রদক্ষিণ, মুণ্ডন, মক্কার অহিংসবাদ প্রতিপালন, সবই প্রাচীন হিন্দু তীর্থের জাজ্বল্যমান সাক্ষী। পিশাচ তৃপ্তির জন্য বলিদান ভিন্ন কোনও প্রকার হিংসার কার্য্য করা যায় না। মহম্মদ তীর্থের অনুষ্ঠানগুলিকে নিজের মূর্খতা ও অহং মত্ততা দ্বারা অনেক বিকৃত করিয়াছেন।

৩৪। ''যাহারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না, কয়ামতের দিন মানে না, মহম্মদকে মানে না, কুরাণ মানে না, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। যতদিন উহারা অপদস্থ চাঁদা দিবে না এবং যতদিন তাহারা পদানত অবস্থায় আসিবে না (ততদিন যুদ্ধ কর)।'' স্থরা বরায়ৎ (৯) আঃ ২৯॥

টিপ্পনী। কাফের বলিতে কি বুঝায় এবং কাফেরদের সঙ্গে ইমানদারদের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা এই আয়াতে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পাকীস্থানবাদী বর্ব্বরদের দ্বারা ভারত ভাগ হইয়া ভারতের সর্ব্বনাশ হইবার পর ভারতে আবার এক সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। তাহারা কাফের অর্থে ভক্তিহীন অর্থ করিয়া ভারতে এক দুষ্ট মতবাদের বীজ রক্ষায় যত্নশীল হইয়াছেন। আমরা জনতাকে কুরাণ ও ১৪ শত বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিতে বলি। 'কয়ামত' যে মানে না, 'কুরাণ ঈশ্বর আদেশ' একথা যে মানে না, এবং মহম্মদকে ভক্তি করে না, সে কাফের। আমরা বলি লুণ্ঠনবাজ ভিন্ন পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য আছে যাহারা এই সব অপদার্থ বস্তুগুলিকে স্বীকার করিতে পারে?

ঈশ্বরে বিশ্বাস করা মনো বিকাশের একটা স্তরের লক্ষণ আবার অবিশ্বাস করাও মনো বিকাশের একটা স্তরের নিয়ম। কে ঈশ্বরকে মানিল বা মানিল না ইহা লইয়া ঈশ্বরের মাথা ব্যথা কিসের? পিশাচ ভিন্ন অন্য কেহই এইরূপ কুৎসিত মনোবৃত্তি পোষণ করিতে পারে না।

গীতায় বলেন - ''ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি - ন মে প্রিয়ঃ॥'' ''আমার কাহারও উপর বিদ্বেষ নাই। আমার প্রিয়ও কেহই নাই।''

৩৫। ''হে নবী, বিশ্বাসীগণকে সংগ্রামার্থ উত্তেজিত কর। কাফের এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। ব্যাপক হত্যা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শিরশ্ছেদন কর।'' স্থরা আনফাল (৮)। আঃ ৬৫॥ স্থরা বরায়ত (৯)। আঃ ৭৩॥ স্থরা মহম্মদ (৪)। আঃ ৪॥

অনেক গুণ্ডামীর আদেশের মধ্যে কোন কোন স্থরাতে এক আধটু ভাল কথাও আছে সে কেবল বিপদ কালে বা নিজেদের শক্তি-হীনতার সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ কাফের দলকে ভ্রান্তিতে রাখিবার জন্য। সে অসময় কাটিবার পরই আবার গুণ্ডামীর লীলা চলিবে। আমরা বলি, লোককে নিজেদের অসময়ে ধোকা দিবার জন্য এ সব আয়াৎ কুরাণে রাখা হইয়াছে। যাহারা নিজের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ চাহে তাহারা এই সব ধোকা কথায় জনতাকে বিভ্রান্ত করিবে; কিন্তু জনতা যদি ১৪ শত বৎসরের ইতিহাস দেখে এবং কলিকাতা ও নোয়াখালীর গুণ্ডামীর কথা মনে করে তবে আমাদের কথা বুঝিতে পারিবে। যাহারা ১০০০ বৎসর ভারতে থাকিয়াও এ দেশকে ভাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বজাতি ও ধার্ম্মিক বলিয়া কে মানিতে পারে?

গীতায় তামস লক্ষণে ''ভূতপ্রেতপিশাচাস্তে যজন্তি তামসাঃ জনাঃ'' ''তামস প্রকৃতির মানুষগুলি ভূত প্রেত ও পিশাচ উপাসনা করে'' বলা হইয়াছে। আবার তামস ভক্তির লক্ষণে বলা হইয়াছে:- ''পরস্যোৎ সাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্।'' গীতা॥ ''অন্যের উৎসাদনার্থ যে ভক্তি উহা তামস ভক্তি।'' এখানে কুরাণে ইমানদারগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যা করিতে উত্তেজিত করিতেছে।

গীতায় আরও বলিতেছেন:- মোঘাশা মোঘ কর্ম্মণো মোঘজ্ঞান বিচেতসঃ। রাক্ষসী মাস্থরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিণীং শ্রিতাঃ॥ অঃ ৯। ১২॥ অর্থাৎ ''অজ্ঞানী লোকেরা - রাক্ষসী, আস্থরী ও মোহিনী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এবং মোঘ আশা, মোঘ কর্ম্ম ও মোঘজ্ঞানকে আশ্রয় করে।'' দেখা যাইতেছে, কুরাণবাদের যাহা ধর্ম্ম উহা গীতার মতে সমাজ ও সভ্যতা নাশকারী বর্ব্বর বা আস্থরিক ধর্ম্ম মাত্র।

আমরা পাকিস্থান নিবাসী অনেক গান্ধিভক্ত, কংগ্রেসী, রামকৃষ্ণবাদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তোমরা চলিয়া আসিলে কেন? তোমাদের মতে তো মুসলমানেরা তোমাদের ভাই, বা তোমাদের স্বজাতি বা তোমাদের স্বধর্ম্মী; তোমরা পাকিস্থান ছাড়িলে কেন? তোমরা মার খাইয়া পলাইলে কেন? তোমরা তোমাদের স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই তো সব চুকিয়া যাইত? তোমরা ৩৫ বৎসর বা ১০০ বৎসর ভারতের আকাশ বাতাসকে যে সব মতবাদ প্রচার করিয়া বিষাক্ত করিয়াছিলে, ধোপে তাহা কেন টিকাইতে পারিলে না?

৩৬। ''হে নবী, ঈশ্বর যাহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহা লোকের ভয়ে তুমি গোপন করিতেছিলে কেন? ঈশ্বরকে অধিক ভয় করা তোমার কর্ত্তব্য। জৈয়েদ স্ত্রীর বিষয় স্থির করিলে, আমরা তোমাকে উহাকে বিবাহার্থ দিলাম। যাহাতে পোষ্যপুত্রবধূ বিবাহ করিলে, মুসলমানের পাপ না হয়। ইহাতে নবীর উপর কোন দোষারোপ হয় না। কারণ আল্লাহ্ মিঞা ইহাতে সম্মত হইয়াছেন।'' স্থরা আহজাব (৩৩) আ ৩২-৩৮॥

টিপ্পনী। জৈয়দ মহম্মদের পোষ্য পুত্র। মোহম্মদ সাহেব পুত্রবধুর সঙ্গে গোপন প্রেমে লিপ্ত হন এবং এই কথা রটিয়া যায়। ইহাতে জৈয়দ ব্যভিচারিণী স্ত্রী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে মহম্মদ সাহেবের গোপন প্রেমের সুবিধা নষ্ট হয়। কারণ তখন জৈয়দের স্ত্রী আর জৈয়দের বাড়ী থাকিবে কোন সূত্রে? তখন মহম্মদ সাহেব জৈয়দের স্ত্রীকে প্রকাশ্যেই বিবাহ করেন। মানুষ যখন কাম-উন্মদ হয় তখন তাহার কি আর কোন নীতিজ্ঞান থাকে? কাম উন্মত্তের উপাস্য যদি কোন পবিত্র ঈশ্বর হন, তবে তাহার কামমত্ততা থাকে কি? পাঠক জানিয়া রাখুন, ঈশ্বরীয় স্পর্শ পাইলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান ও সংযমের বাঁধন শক্ত হয়। কিন্তু পিশাচ উপাসকদের সম্বন্ধে এই নীতি খাটে না। পশু ও বর্ব্বরস্তরের মানুষেরা পূর্ব্ব যুগে পিশাচ উপাসনা করিত। মহম্মদ সাহেব এরূপ ভক্তদের জন্য যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া কুরাণ গ্রন্থখানা উদ্ধার করিয়াছেন, এ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। পিশাচ উপাসকেরা কুরাণের প্রসাদে আজ পৃথিবীতে ঈশ্বর উপাসক বলিয়া পরিচিত হইলেও গীতার তামস লক্ষণ - ''জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থাঃ'' (জঘন্য গুণ এবং বৃত্তিতে রত) ইহা সমান ভাবেই ১৪ শত বৎসরের ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমানেরা গায়ের জোরে আল্লাহ্ মিঞাকে 'শোভান' করিয়া স্মরণ করেন। ইহাই যদি শোভান (বিশুদ্ধ) লক্ষণ তবে পিশাচ আর কাহাকে বলে? আমরা জিজ্ঞাসা করি, পুত্রে ও পুষ্য পুত্রে ভেদ কি? কন্যা ও পুত্রবধূতেই বা ভেদ কি? কুকুর বিড়াল ও পশুরা মা পুত্র কন্যা কাউকেই বাদ দেয় না, তা বলিয়া মানুষও তাহাই করিবে নাকি? তাহা হইলে মহাপুরুষে ও কুকুর বিড়ালে ভেদ কোথায়? পাঁচ বেলা নমাজ পড়িলাম আর বাহাত্রামী ও গুণ্ডামী করিয়া শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিলাম এবং কুকুর বিড়ালের মত মা বোন বা কন্যার বিচার না করিয়া জন সংখ্যা বৃদ্ধি করিলাম। ইহাই মানবধর্ম্ম নাকি? আমরা এক সত্য কাহিনী বলিতেছি - আমাদের পরিচিতা এক মহিলা স্বামীসহ পূর্ব্ববঙ্গের ধলেশ্বরী নদীতে, নৌকা ডুবিয়া জলমগ্ন হন। তিনি নিজের অসীম সাহসে ও কৌশলে নিজের জামা কাপড় ছাড়িয়া দেন এবং স্বামীর জামা কাপড় দাঁত ও হাতের সাহায্যে ছাড়াইয়া দেন। তাঁহারা কোনও প্রকারে স্রোতের প্রবাহের অনুকূলে সাঁতার কাটিয়া তীরে এক জনমানব শূন্য চরে আসেন। তখন স্বামীটী প্রায় সংজ্ঞাহীন; মহিলা সেখানে বিশ্রাম করিয়া স্বামীকে একটু সুস্থ দেখিয়া লোকালয়ের সন্ধানে বাহির হন। লোকালয়ে এক সম্মান্য বৈদ্য বংশীয় মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া তিনি পিতা সম্বোধন করিয়া বস্ত্র ও আশ্রয় পান। আমরা এই কন্যা, এ কন্যার ধর্ম্মপিতার বংশ, এই কন্যার পিতৃ বংশ ও ঐ কন্যার শ্বশুরবংশের ব্যবহার বাল্যকালে দেখিয়াছি। কখনও মনে হয় নাই যে ঐ কন্যা ও ঐ ধর্ম্মপিতা এবং এই তিনটী বংশের আত্মীয়তায় কোনও প্রকার কৃত্রিমতা ছিল। এখানে একজন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার উপাস্য আল্লাহ্ মিঞা দুষ্কার্য্যের অনুমতিদাতা! পিশাচ ও প্রেতযোনি যে আছে ইহা অনেকেই জানে। আল্লাহ্ মিঞা যে একজন দুষ্ট প্রেতাত্মা এবং ইঁহার সাথী ফরিস্তেগণ যে কতগুলি প্রেত বা ভূত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। পিশাচ উপাসনা ভিন্ন মানুষে ১৪ শত বৎসর ধরিয়া জঘন্য বৃত্তিগুলি থাকিতেই পারে না। সব ধর্ম্মই অভিজ্ঞতা দ্বারা বদলায়। প্রাচীন খৃষ্টান ধর্ম্মে ও আধুনিক খৃষ্টান ধর্ম্মে রাত দিন ভেদ বিদ্যমান। হিন্দু ধর্ম্মের সংস্পর্শে থাকিয়া ইহা কত সভ্য ও যুক্তিবাদী হইয়াছে;

আর আল্লাহ্ মিঞার উপাসকেরা ১৪ শত বৎসর একই রূপ বর্ব্বরই রহিয়া গেল! আমরা বহু মুসলমানকে জানি যাহারা মা, বোন, মামী, মাসি, ধর্ম্ম পিতা ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়া হিন্দুর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনেক কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে কলঙ্কিত করিয়াছে এবং সমস্ত মুসলমানী সমাজে সম্মানিত হইয়াছে। যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার মনোবৃত্তি কুকুর ও শুকরের মত পশুস্তরের সেই ধর্ম্মের নামে যাহারা জীবন ধারণ করে, তাহাদের প্রকৃতি ইহার চেয়ে বেশী কি করিয়া হবে?

৩৭। "সত্য বিশ্বাসীরা কেমন সুখী। যাহারা প্রার্থনায় রত, দানশীল এবং যাঁহারা আপন ক্রীতদাসী ও ভার্য্যা ব্যতীত অন্য কোন রমণী সম্ভোগ বাসনা করে না। কারণ ইহাদের পক্ষে তাহারা নির্দ্দোষ।" সুরা মোমিনুন (২৩) আঃ ১॥

টিপ্পনী। এখানে ক্রীতদাসীদের সঙ্গে সম্ভোগের কথা বলা হইতেছে। ইহার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই লাম্পট্য লীলার সীমাহীন প্রশ্রয়। কুরাণ মতে এক গণ্ডা স্ত্রী বিবাহ বৈধ। অবশ্যই রসুল সাহেবের জন্য ১৪টীর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ইহার উপরে যত ইচ্ছা, শত শত হাজার হাজারও রাখা চলিবে; কিন্তু তাহাদিগকে ক্রীতদাসীর চিনিমোড়কে সম্ভোগ করিতে হইবে। এখানে অন্যের স্ত্রীকে সম্ভোগে নিষেধ করা হইয়াছে। আমরা বলি, চোর চুরি করিয়া ডাকাত ডাকাতি করিয়া বদমাইসরা ফুস্‌লাইয়া আনিয়া বিক্রয় করিলে তাহাদের ক্রীতদাসী হইতে বাধা থাকে না। পাঠক এই লাম্পট্য লীলাকে আরও জঘন্য রূপেও কল্পনা করিতে পারেন - গুণ্ডা ও চোর পুষিয়া নারী হরণ করাইয়া তাহাদিগকে নারীর বেতন বা মূল্য দিলে সেও তো ক্রীতদাসী! আল্লাহ্ মিঞার যে কত কেরামতী, এ আর কে কত বর্ণনা করিবে? আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মের আড়ালে এইরূপ স্পষ্টতঃ কামুক লীলা ও গুণ্ডামীলীলা এই পৃথিবীতে কত কাল চলিতে দেওয়া সম্ভব?

অনেকের ধারণা সাহজাহান পত্নীপ্রাণ বিশুদ্ধ চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। অনেক সরল কবি বিশ্বাস বশে এই ব্যক্তিকে শুদ্ধ লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা ভিনিসিয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক Niccoolso Manucci র কথা এখানে উল্লেখ করিব। তিনি মোগল রাজ সভায় দীর্ঘ ৪৮ বৎসর কাল বাস করিয়া ছিলেন। তিনি বলেন - মুসলমানগণ স্বভাবতঃই লম্পট প্রকৃতির, কেহ কিছু বেশী কেহ কিছু কম। ..... সম্রাট শাহজাহান যে এই লাম্পট্য বিষয়ে অপর সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চরিত্র ছিলেন না, ইহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। কারণ তাঁহার অন্তঃপুরে যে সকল রমণী ছিল তিনি তাহাদের উপভোগে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার সভাসদ্ ও ওমরাহ্ বর্গের পত্নী সকলের সহিত প্রেম লীলার গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাদের সম্মান বিনষ্ট করিতেন। সেই জন্যই তাঁহার পতন ও মৃত্যু হইয়াছিল। Storia de Mogor Vol. I P. 192-193)

মোগল সম্রাটগণের হেরামখানা ছিল সাজাহানেরও হেরাম খানা ছিল। ইহাতে দেশ বিদেশের শত শত সুন্দরী রমণীগণকে বেতনভোগী গুণ্ডা বদমাইশ ও চোরদের সাহায্যে আনা হইত এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাসীর মত রক্ষা করিয়া বাদশাহগণ কুরাণের ধর্ম্ম ও লাম্পট্য লীলা দুইই সফল করিতেন। এ সম্বন্ধে একটী ঐতিহাসিক প্রমাণসহ সুন্দর লেখা ১৩৫৭ সালের পূজা সংখ্যা বসুমতীতে আলোচিত হইয়াছে।

৩৮। ''ধার্ম্মিকেরা উদ্যান ও উৎস মধ্যে নিরাপদ স্থানে বাস করিবে। তাহারা সাটীন ও পট্টবস্ত্র পরিহিত হইয়া পরস্পর মুখামুখী হইয়া বসিবে। আমরা তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ সুন্দরী রমণীগণকে প্রদান করিব।'' সুরা দহান (৪৪) আঃ ৫১-৫৪॥

টিপ্পনী। ভজিলাম আল্লাহ্ মিঞা আর পাইলাম বিবি? আল্লাই বিবি নাকি? গীতা বলেন ''যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'' অর্থাৎ ''যাহা লাভ করিয়া অন্য লাভ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে হয় না।'' কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য কয়ামতের পর আল্লাহ্কে পাইবার পর যদি বিবি পাইয়া তাহাতে মানুষ সুখী হয় তবে তো আল্লাহ্ হইতেও বিবি উচ্চস্তরের প্রাপ্য বস্তু বলিয়া মানিতে হয়। এখন ইহা বিচার করিতে হইবে আল্লাহ্ মিঞা শ্রেষ্ঠ, না কি বিবিরা শ্রেষ্ঠ? অথবা আল্লাহ্ মিঞা ও বিবি একই বস্তু? গীতায় বলিয়াছেন -

যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্ পিতৃণ্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেভ্যঃ যান্তি মদ্যাজীনোঽপিম্যম্॥

''যাহারা দেবব্রত তাহারা দেবত্ব লাভ করে। যাহারা ভূত উপাসক তাহারা ভূত হয়। যাহারা আত্মাকে উপাসনা করে তাহারা আত্মাকে লাভ করে।'' এখানে আল্লাহ্ মিঞার উপাসকগণ ৭২ বিবি পাইবে। ইহা কোন্ যুক্তি বলে, কেউ বলিতে পারে কি? এ জন্যই লোকে বাহাত্রা বলে। তফসিরী নামক গ্রন্থের মতে - ''স্বর্গের নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিও অশীতি সহস্র ভৃত্য ও ৭২টী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইবে।'' বিবিরা স্বর্গের ইমানদারদের সঙ্গে সম্ভোগ করিয়া আনন্দ পাইবে; কিন্তু এ সব ভৃত্যেরা যদি ঐ সব বিবিদের ভাগ না পায় তবে স্বর্গের রাজ্যে এ সব ভৃত্যেরা নিশ্চয়ই দুঃখের জীবন কাটাইবে। আমাদের মতে আল্লাহ্ মিঞা তাহা হইলে স্বর্গের ভৃত্যদের উপর কোন ন্যায় করিলেন না, বলিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যায়, ন্যায় বিচারবান বলিয়া তিনি স্তুত হইবারও যোগ্য নহেন। আমাদের মতে সমস্তটা কোরাণই একটা বাহাত্রামী মাত্র। অনেকের ধারণা হিন্দু ধর্ম্মেও স্বর্গসুখ প্রাপ্তির কথা আছে। এ সম্বন্ধে আমরা পাঠকের ধারণা স্পষ্ট করিয়া দিতেছি। সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানুষ পরকালে কিছু সময়কাল সুখলোক প্রাপ্ত হইবে। এবং ''ক্ষীণ পুণ্যে'' পুনঃ মর্ত্তলোকে জন্ম হয়। এই কথার উল্লেখ গীতায়ও আছে। ইহা তো সৎকর্ম্মাদির ফলের কথা। উপাসনার ফলে, কোন স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় না; উহার ফলে যাঁহার উপাসনা করা যায় তাঁহাকে লাভ করিতে হয়। প্রলয় কালে সেই সব স্তরের দেবতা বা উপদেবতারা যখন বিলয় প্রাপ্ত হয় তখন সেই সেই পুণ্যবানেরা বিলয় প্রাপ্ত হন। উপাসক সম্প্রদায় ইতিমধ্যে নিজেদের ইচ্ছামত মর্ত্তলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া উন্নত বিকাশের দিকেও চলিতে পারেন। হিন্দু ধর্ম্মমতে আত্মজ্ঞানের ফলে মুক্তি হয়। আল্লাহ্ উপাসনার ফলে বিবি পাওয়া অত্যন্ত কুৎসিত, অযোগ্য ও অযৌক্তিক কথা।

৩৯। ''হে নবী, কাফেরদের সঙ্গে ঝগড়া কর। এবং গুপ্ত শত্রু হইতেও বেশী বল প্রয়োগ কর কাফেরদের উপর॥'' সু ৬৬। আঃ ৯॥

টিপ্পনী। আল্লাহ্ মিঞা কি জানেন না যে কাফেররাও ঠিক ঐভাবেই এই বর্ব্বরতার ভীষণ প্রতিশোধ দিবে? যে ব্যক্তি এমন বর্ব্বর, সে কি ঈশ্বর, না দেবতা? যাহার উপর এইরূপ আদেশ হয়, তাহারই নাম ''নবী''। ঐ সব নবী ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছে, না কি কোন পিশাচের উপাসনা করিয়াছে? একটা জঘন্য পিশাচ না হইলে ভক্তকে কেহ

এমন গুণ্ডামীর উপদেশ দিতে পারে কি? যাহারা এমন জঘন্য পিশাচের উপাসক তাহাদের উপর সমাজের কোন স্নেহ থাকিতে পারে কি?

গীতা বলিতেছেন - ''ভূত প্রেত পিশাচাস্তে যজন্তে তামসাঃ জনাঃ''। ''যাহারা তামস্ প্রকৃতির লোক তাহারা ভূত প্রেত ও পিশাচের উপাসনা করে।'' আবার গীতা বলিয়াছেন - ''জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থাঃ অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ''। ''যাহারা তামস্ প্রকৃতির মানুষ তাহারা অত্যন্ত জঘন্য গুণ, বৃত্তি পোষণ করে এবং অধোগতি লাভ করে।'' ইতিহাস দেখিয়া বোঝ, মুসলমানদের ব্যবহার কিরূপ জঘন্য ও হীন।

আজকাল একদল মূর্খ সমাজে গজাইয়াছে, যাহারা গীতা ও কুরাণ ও বাইবেলের সামঞ্জস্য করে। মূর্খদের বুঝা কর্ত্তব্য যে জন্মান্তর বাদের ভিত্তির বাইরে একটা কথাও গীতা স্বীকার করেন নাই। বাইবেল ও কুরাণ জন্মান্তর মানেন নাই। গীতা একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ঈশ্বর ব্যাপক। এবং তিনি কাহারও পাপ বা পুণ্যফল দেন না। নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে জীব প্রাকৃতিক নিয়মে সুখ দুঃখ ভোগ করে (ধর্ম্মশিক্ষা)। দেখ, গীতা পঞ্চম অধ্যায়॥ ১৩। ১৪। ১৬॥ আমাদের মতে কুরাণবাদের উপাস্য আল্লাহ্ মিঞা কোন দুষ্ট প্রেতাত্মা মাত্র। মহম্মদ ঐ পিশাচের উপাসনা করিতেন। আমাদের দেশে অনেক শক্তিমান পিশাচসিদ্ধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সাধারণতঃ নিম্নস্তরের তান্ত্রিক কর্ম্মাদি করিয়া ভক্ত জুটাইয়া থাকেন। গীতা যুক্তিবাদ মূলক ধর্ম্মগ্রন্থ, কুরাণে যুক্তিবাদ ও সত্যের নাম নিশানাও নাই।

আল্লাহ্ মিঞার এক বিখ্যাত উপাসক বিশ্ববিখ্যাত কবি ইক্‌বালের মন কতটা জঘন্য হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ মিঞা তাঁহাকে কিরূপ জঘন্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে ইক্‌বালের কবিতা শিকওয়াহ্ ও জবাব শিকওয়াহ্ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। (অনুবাদক সহীদুল্লাহ্)।

বিধর্ম্মী পায় হূর ও দৌলত সংসার মাঝে সহের এ'বার।
আর বেচারা মুসলিম তরে শুধুই হূরের এক অঙ্গীকার॥ প্রশ্ন (১৬)

সুন্দরী স্ত্রী ও ধন অমুসলমানদের নিকট আছে, মহাকবি ইকবাল উহা আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি নিজের উপাস্য আল্লাহ্ মিঞাকে এই বলিয়া অনুযোগ দিতেছেন যে মুসলমানগণকে বেহস্তে হূর দিবার মাত্র অঙ্গীকার করিয়াছ; কিন্তু এজগতে দেখিতে পাই কাফেররাও সুন্দরী স্ত্রী ও ধন ভোগ করে।

এবার আল্লাহ্ মিঞা কি উত্তর দিলেন বলা যাইতেছে:-

কি কব দুঃখের কথা কেউ তোমাদের চায় না হূর।
মুসা কৈ? নয়তো আজও তুর পাহাড়ে ঐ যে নূর॥ ১২॥
তারার মত জাতির আকাশ'পরে হলি তুইরে উদয়।
হিন্দু বুতের প্রেমে পড়ি তুইরে হলি বামন মশায়॥ ২৩

উত্তরে আল্লাহ্ মিঞা বলিতেছেন যে তুর (তুর ও পাহাড় একার্থ বাচক, কাশ্মীরের কন্যাদের হূরের মত কালচক্ষু বলিয়া মুসলমানেরা তুর মানে কাশ্মীর বলে) পাহাড়ে (কাশ্মীর দেশে) অনেক হূর আছে। এখন চাই মুসা। যে আদেশ করিয়া ঐসব হূরগণকে লুটিয়া লইবে। তিনি আরও বলিতেছেন ইক্‌বাল তারার মাঝখানে চন্দ্রের মতন উদয়

হইয়াছেন; কিন্তু হিন্দুর মূর্ত্তির উপর তাঁহার প্রেম থাকায় ইনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না। পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এই উত্তরটা কোন ঈশ্বরের, না কি কোন দুষ্ট পিশাচের। নারীর সতীত্ব লইয়া টানাটানি করিবার আদেশ ঈশ্বর দেন কি? আর যাহারা নারী লইয়া টানাটানি করে, তাহারা কি মানুষ? ইক্‌বাল সত্যই মানুষ, না কি নরপশু? যাঁহারা ইক্‌বালের প্রশংসা করেন, তাঁহারা কি মানুষ?

মঃ ইক্‌বাল কাশ্মীর সহ বর্ত্তমান পশ্চিম পাকিস্থানকে পাকিস্থান করিবার আন্দোলনের জন্ম দেন। ইনি "মেরী হিন্দুস্থান" সংগীতের রচনা করেন, এই বাহানাতে এই স্পষ্টতঃ জাতীয়তা বিরুদ্ধবাদীকে দেশের গান্ধীবাদী সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশ ভক্ত বলিয়া ইঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন এবং ইঁহার মৃত্যুকে একটা মহান জাতীয় সম্পদের হ্রাস মনে করিয়া মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ফলতঃ কাশ্মীরের ক্ষেত্রে পাকিস্থানের আক্রমণ ও লক্ষ নারীর অপমান এবং বহু সহস্র নারীর জহর ব্রতের জন্য এই ইক্‌বালই দায়ী। কংগ্রেসীরা এই দুষ্কার্য্যের প্রকাশ্য সহায়ক না হইলেও পরোক্ষ উৎসাহ দাতা।

৪০। "ধার্ম্মিকের সুখধাম প্রস্তুত হইয়াছে, ফলধারী বৃক্ষ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে, উন্নত পয়োধরা সমবয়স্কা কতগুলি রমণী ও পূর্ণপাত্র প্রাপ্ত হইবেন।" সুরা নবা (৭৮) আঃ ৩১-৩৪॥

টিপ্পনী। মদ ও বিবির রাজ্যই আল্লাহ মিঞার সব নাকি? ইহা হইতে উন্নত সুখ আল্লাহ্ মিঞা পরিকল্পনা না করিবার দরুণ যে সব মুসলমান সুফী ও যোগবিদ্যার অনুশীলন করেন এবং যে সব মিঞারা থিয়োসোফিষ্টদের দলে ময়ূর পুচ্ছ গুজিয়া বসেন, তাঁহাদের পক্ষে অসুবিধা হইল। যোগানুশীলন তো ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য বা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য। বিবি ও মদের নেশায় মত্ত থাকিলে যোগ ও ধ্যান হইবে কি? আমরা আশা করি, আল্লাহ্ সুফী ও যোগী থিয়োসফিষ্ট মুসলমানগণকে পানপাত্র ও বিবির সংখ্যা নিশ্চয়ই দ্বিগুণ করিয়া দিবেন। যাঁহারা ধর্ম্ম সমন্বয় করিবার ঠিকেদারী লইয়াছেন, এ সব বিবি ও মদের মধ্যে আমাদের মতে তাঁহাদেরও ভাগ থাকা প্রয়োজন। আমাদের কাছে অনেক শিক্ষিত মুসলমান যোগবিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কয়ামত ও শয়তান বাদে বিশ্বাস ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছো কিনা। তাহারা বলিল - না। তবে যোগবিদ্যা শিক্ষা আপনারা করিয়া বেহস্তে কি আর বেশী লাভ করিবেন?

কুরাণে মূর্ত্তি পূজকদের বিরুদ্ধে ভীষণ ঝগড়ার উস্কানী আছে। হিন্দুদের ঈশ্বরভক্তির অনুষ্ঠানে মূর্ত্তিগ্রহণ ও না গ্রহণ দুইই গৃহীত হইয়াছে। নানা প্রকার উচ্চ আদর্শে সমাজকল্যাণ করাকে এবং যোগধ্যান যোগে নির্ব্বাণ লাভের নিয়মকে ঈশ্বর ভক্তির অঙ্গ বলা হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি সুন্দর সুন্দর সমাজ কল্যাণের নিয়ম মাত্র। মূর্ত্তি থাকিলেই কেন ঈশ্বরভক্তি হইবে না? আল্লাহ্ মিঞা কুরাণে বলিতেছেন যে তিনি "সব জানেন, সব দেখিতে পান"। কাফেররা যখন মূর্ত্তি গড়িয়া ঈশ্বর ভক্তির অনুষ্ঠান করে তখন তিনি অন্ধ হইয়া যান কি? ঈশ্বর ভক্তির অনুষ্ঠানে মূর্ত্তির অবলম্বন থাকিলে আল্লাহ্ মিঞা মূর্খ হইয়া যান কেন? আল্লাহ্ মিঞা তো সব শুনিতে পান। আল্লাহ্ মিঞাকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার ভক্তগণ যখন মাটীকে প্রণাম করেন ও তাঁহার দিকে আসমানে গুহ্যদ্বারটী

দেখাইয়া দেন তখন ভক্তিটা মাটীর হয় না কি তাঁহার হয়? গুহ্য দ্বারের দিকে তাঁহার এত আকর্ষণ কেন? তিনি কি পিশাচ? তিনি আদেশ দিন না যে আসমানের দিকে তাকাইয়া প্রণাম কর ও নমাজ পড়। আদমের মাটীর মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাকে প্রণাম করিতে বলা কি মূর্ত্তিপূজা নয়? কাবার দিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়া ও হজে যাইয়া কাবার পরিক্রমা ও চুম্বন কি মূর্ত্তি পূজা নয়? তবে অন্য ধর্ম্মের মূর্ত্তিকে যে আঘাত সেটা পৈশাচিক আচার ছাড়া কি? কথিত আছে, তিনি ইব্রাহীমের নিকট লিঙ্গের মাথা বলিদান চাহিয়া ছিলেন। লিঙ্গের মাথা তাঁহার এত প্রিয় কেন? ইহা ঈশ্বর লক্ষণ, না কি পিশাচ লক্ষণ? যখন একজন ইমানদার নামাজ পড়িবার সময় গুহ্য উপরে তোলেন, তখন তাঁহার পিছনে থাকিয়া অন্যজন তাঁহাকে প্রণাম করেন? আমরা যদি বলি সে পূর্ব্ববর্ত্তী নমাজীর গুহ্য অঙ্গগুলির প্রণাম করে, তবে ইহার কি উত্তর আল্লাহ্ মিঞা দিবেন? একটা পাত্রে ২০০, ৫০০ লোক, সেই বাটীকে না ধুইয়া জলপান করিলে নাকি সেটা খুব শুদ্ধ হয়। ইহা যে শুদ্ধতা নহে, এবং ইহা যে স্বাস্থ্যের অত্যন্ত ক্ষতির কারণ, ইহা কোন্ বৈজ্ঞানিক জানেন না? যাহা একজন বৈজ্ঞানিক বুঝিতে পারেন, উহা আল্লাহ্ মিঞা বুঝেন না কেন? একটা পাত্রে সহস্র লোক মুখ লাগাইয়া জল পান করাটা শুদ্ধাচার না পিশাচ আচার? মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দেওয়াটা বড় কথা নয়। কিন্তু বড় কথা যাহার আদেশে ইহা করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বর না কি পিশাচ? উচ্চ সভ্যতা ও সৌন্দর্য্য গড়িয়া তোলা ভীষণ কঠিন; কিন্তু উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া অত্যন্ত সহজ। বান্দর কোন সভ্যতা গড়ে না। বান্দর সভ্যতা ভাঙ্গে। উচ্চ সভ্যতার আস্বাদ না বুঝা বান্দরামী বা পশুত্ব মাত্র।

আল্লাহ্ মিঞা আদমের মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন এবং উহাতে জীবন ফুকিয়া প্রণাম করিতে বলেন। সকলেই সিজ্‌দা করিল, কিন্তু আজাজীল করিল না। আমরা মুসলমানী শাস্ত্র হইতে আল্লাহ্ ও আজাজীলের আলাপগুলির কিছু কিছু অংশ নিম্নে দিলাম। ইহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আল্লাহ্ সত্যই ঈশ্বর কিনা এবং শক্তি কতটুকু। আমরা বলি ইহা পিশাচ মাত্র। এবার কুরাণ ও সয়তানবাদ সম্বন্ধে বলা যাইতেছে:-

আল্লাহ্ - তুমি সিজ্‌দা করিলে না কেন?

অজাজীল - হুজুরই তো আদেশ দিয়া রাখিয়াছেন, যে আমি ভিন্ন অন্য কাউকেও সিজ্‌দা করিও না। (মাথা মাটীতে লাগাইতে হইবে এবং গুহ্য যতটা উঠানো যায় ততটা উপরের দিকে উঠাইতে হইবে, ইহার নাম সিজ্‌দা।)

আল্লাহ্ - আমি এখন আদেশ দিতেছি যে আদমকে সিজ্‌দা করো।

অজাজীল - আপনি প্রথম আদেশ কেন উল্টাচ্ছেন?

আল্লাহ্ - আমার মর্জী।

অজাজীল - শেষকালে, আপনার এইরূপ মর্জীর কারণ কি?

আল্লাহ্ - আমি কারণ বলিতে প্রস্তুত নহি।

অজাজীল - তা হলে, আপনি যতক্ষণ খাস কারণ বলিবেননা ততক্ষণ আমি কিছুতেই মর্দুম্‌পরস্তীর জন্য প্রস্তুত নই।

আল্লাহ্ - তবে, নাফরমানী কাজ করিবে?

অজাজীল - যদি আপনার 'ইস্তে লাহ্' কে আপনি লাফরমালী মনে করেন, তবে ঐরূপই বুঝুন।

আল্লাহ্ - আদম তোমা হইতে বুজুর্গ।

অজাজীল - কোন্ লিহাজে? যদি বয়সের বিচারে বলেন তবে তো আমি উহার থেকে অনেক বড়।

আল্লাহ্ - না, বুদ্ধির বিচারে।

অজাজীল - তাহা হইলে আপনি ওর সঙ্গে আমার মুকাবিলা করাইয়া দেখুন।

আল্লাহ্ - দেখ, আমি ওকে দুই হাতে বানাইয়াছি।

অজাজীল - শুনুন, আপনি আমাকে প্রাকৃতিক বিধানে প্রস্তুত করিয়াছেন। হাতের প্রস্তুত বস্তু হইতে প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন বস্তু সব সময়ই ভাল হয়।

আল্লাহ্ - সে বেশী ভক্তি করিবে।

আজাজীল - আমি ৬ লক্ষ বৎসর করিয়াছি। ওর তো এতটা বয়সও হয় তো হইবে না।

আল্লাহ্ - সে তোমা হইতে বেশী শিক্ষা করিয়াছে। দেখো, যে যে নাম তুমি বলিতে পার নাই, সে সেইসব নাম বলিয়া দিয়াছে।

অজাজীল - আপনি ওকে প্রথমেই কণ্ঠস্থ করাইয়া ছিলেন। আপনি আমাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া দিন এবং আমার নিকট যাহা ইচ্ছা শুনুন। (কথিত আছে আল্লাহ্ মিঞা আজাজীলকে আদমের নিকট অপদস্থ করাইবার জন্য আদমকে বেলনী, চৌকা, লোটা, থালা, ঘড়া, ইত্যাদির নাম শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন।)

আল্লাহ্ - তুমি বেশী হুজ্জৎ করিও না, আমি যাহা বলি মানিয়া লও।

আজাজীল - আপনি কি বলিতে চান?

আল্লাহ্ - আমি ইহাই বলিতে চাই আদম তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অজাজীল - বাঃ জনাব! আপনি কি বলিতে চান? কোথায় ফরিস্তে, আর কোথায় পচা মাটীতে প্রস্তুত ইন্সান্?

আল্লাহ্ - ব্যাস, চুপ কর, তুমি অত্যন্ত পাজী।

অজাজীল - আপনি তো অকারণ গালী দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, পাইজামির কি কথা আছে?

আল্লাহ্ - ইহা কি পাজিপনা নয়? আমি সিজদা করিতে বলিতেছি, আর তুমি সিজদা না করিয়া বক্ বক্ করিতেছ।

অজাজীল - হুজুর, আপনি বিনা কারণে ক্রোধী হইতেছেন। আপনিই তো আমাকে ''লা ইলহ্ ইল্লল্লাহ্'' শিখাইয়া বলিয়া দিলেন, জীবনের সঙ্গে টক্কর দিয়াও এই কল্মা হইতে মুখ ফিরাইবে না। এখন আপনার সাধারণ ধমকানী হইতে মুসারিক হইব। আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন কি?

আল্লাহ্ - দ্যাখ, মর্দুদ! এবার তুই সীমার বাইরে গিয়াছিস। খাম্‌খা কথা প্রস্তুত করিয়া নাস্তিকদের মত বিরক্তির কারণ হইতেছিস। এবার তুমি দুইটা অক্ষরে এই কথা বলিয়া দাও, যে তুমি আমার আদেশ মান্য করিবে কি না?

অজাজীল - আপনি কি রকম কথা বলিতেছেন? আচ্ছা, এ সব আমি কাহার আদেশ মানিতেছি? আমার বিচারে আপনার আদেশের অধিক বক্‌অত হইতেছে। আপনি ইতমিনাম্ রাখুন, আমি আপনার বিচার ধারা হইতে কখনও ফেল হইব না। আপনি দুই শব্দে উত্তর চাহিয়াছেন আমি এক কথায় উত্তর দিতেছি - যতদিন প্রাণে শ্বাস থাকিবে ততদিন আমি আপনি ভিন্ন কোন স্থানেই সিজদা করিব না।

আল্লাহ্ - ব্যস, ব্যস, তুই ইবলিস্ (অবাধ্য), এখনই আমার দরবার হইতে চলিয়া যা।

অজাজীল - আমি কখনও আপনার আদেশ অমান্য করিয়াছি কি? - যে আপনি আমাকে ইবলিস্ বলিলেন? আপনি তো সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তো এতক্ষণে বুঝিতেছিলাম যে আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন এবং আমি পাশ হইয়া গেলে আমাকে উচ্চ পদ দিবেন।

আল্লাহ্ - চুপ চাপ এখান হইতে চলিয়া যাও। এখন আর কিছুই শুনিতে চাই না। আজ হইতে তোমার নাম শয়তান হইল।

শয়তান - হুজুর, (বিরক্তির সহিত) যদি আপনার ন্যায় বিচার করেন তবে আমি সত্যপথে আছি। আমি ৬০০০০০ বৎসর আপনাকে প্রণাম করিয়াছি, আদমকে প্রণাম করিয়া আমি নীতিভ্রষ্ট হইতে পারি না। আমি চাই আমার সঙ্গে ন্যায় বিচার করা হউক।

আল্লাহ্ - আমার যাহা আদেশ দিবার ছিল, দিয়াছি। উহা আর অন্যথা হইতেই পারে না। তোমার অবাধ্যতা একেবারে কারণ হীন।

অজাজীল - তবে ইহাই কি ন্যায় বিচার?

আল্লাহ্ - হাঁ, ইহাই ন্যায় বিচার। ব্যস, এখন তুমি নিজের মঙ্গল চাও তো এখান হইতে চলিয়া যাও।

শয়তান - (ক্রোধের সহিত) আপনি আর কি করিতে পারেন? আপনার এসব কথা অসার চাল মাত্র।

আল্লাহ্ - ওরে খবিস্, এ সব অসার কথা নয়। তুই যদি বলিস, তবে এখনই তোকে সেইরূপ করিয়া দেখাইয়া দিতে পারি।

শয়তান - দেখিবেন, যেন আবার কথাটা পাল্টাবেন না।

আল্লাহ্ - কখনও পাল্টাবো না। বল, কি বল্‌তে চাও।

শয়তান - আপনি আর কি করতেই পারেন! আমাকে দিয়া আদমকে প্রণামই করাইয়া দেখান না, কতটা শক্তি রাখেন।

আল্লাহ্ - (অত্যন্ত ক্রোধের সহিত) আমি পূর্ব্বেই জানিতাম যে তুই অবাধ্যতার পুতুল এবং আমার আজ্ঞা অমান্যকারী।

শয়তান - হাঁ মহাশয়, সবই ঠিক! যদি আপনি এইরূপই জানিতেন তবে আমাকে আর সিজদা করিতেই বলিলেন কেন? ইহাদ্বারা আপনার বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষা আক্কলমন্দি সাবিত হয় না কি?

আল্লাহ্ - ব্যস্, এখন তোর উপর লস্রানৎ, তুই এখানে এক সেকেণ্ডও থাকিস তবে তোর উপর গুমারাহ্ হইয়া যাইবে। তোকে নরকের আগুনে ফেলিয়া দিব।

শয়তান - এখানে আপনার বাড়ী, এখানে আপনি যত ইচ্ছা গালি দিন। আমি নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদে শান্তির সহিত চলা ভিন্ন প্রতিশোধ ও ক্রোধের কথা কিছুই বলিব না। হাঁ

এতটা বলিব, তুমি আমার উপর গুমরাহ্ করিয়াছ। তাহা হইলে আমিও তোমার ভক্তদের উপর গুমরাহ করিব।

আল্লাহ্ - আনন্দের সহিত গুমরাহ্ করিও। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে ভক্ত তোমার সেবা করিবে তাহাদের দ্বারা আমি দুজখ্ পূর্ণ করিব।

শয়তান - (চলিয়া যাইতে যাইতে) ইহার অতিরিক্ত আপনি কি আর করিতে পারেন! ব্যস, আপনার তো ইহাই শেষ ধোঁস, সেটা দেখা যাইবে। আচ্ছা, তাহা হইলে ''সলাম অলয়কুম্।''

টিপ্পনী। আমাদের ধারণায় আল্লাহ্ মিঞা কিরূপ ব্যক্তি সে সম্বন্ধে এ সব অংশ পাঠককে স্পষ্ট করিয়া দিবে। যাঁহার হুকুমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি একটা শয়তানের নিকট পরাজিত ও অপমানিত!

৪১। ''হে পয়গম্বর। আমরা তোমার সম্ভোগ অধিকার তোমার স্ত্রীগণের উপর দিয়াছি। যাহাদিগকে তুমি ডাউরী দিয়াছ। যাহাদিগকে তুমি অধিকারের মধ্যে পাইয়াছ, যাহাদিগকে তুমি যুদ্ধের বন্দিনীরূপে পাইয়াছ। তোমার খুল্লতাতের কন্যাগণ, তোমার মাসীর কন্যাগণ, কাকীমার কন্যাগণ, যাহারা পালাইয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, যে কোন আত্মদানকারী ইমানদার স্ত্রীলোক, তুমি যাহাদিগকে খুসী করিতে চাও, ইহার তোমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছি। যাহাতে তোমার উপর কলঙ্ক হইতে না পারে, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও দয়ালু।'' স্থরা অহজব (৩৩)। আয়াৎ ৫০।

টিপ্পনী। ভোগের বাধাহীন অধিকার আল্লাহ্ মিঞা মহম্মদকে দিতেছেন। এখানে মহম্মদের কন্যা ও সহোদর ভগ্নিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। মহম্মদ সাহেবের নিজের কোন বোন ছিল না। এই সব আদেশ দ্বারা আল্লাহ্ মিঞা মহম্মদকে কলঙ্কহীন করিলেন। তিনি যে নিশ্চয়ই কলঙ্কহীন, ইহাতে আর সন্দেহ কি!

৪২। ''(হে পয়গম্বর) তুমি যাহাকে ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পার। যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার। যাহাকে ইচ্ছা সাময়িকভাবে ত্যাগ করিয়া আবার গ্রহণ করিতে পার। ইহাতে কোনই দোষ হইবে না। ইহা স্বাভাবিক, যাহাতে তাহাদের চক্ষু শীতল হয় এবং তাহারা দুঃখিত না হয়। এবং তাহারা যাহাতে স্থখী হয়, তাহাদিগকে তুমি উহা দাও। তোমার অন্তরের কথা আল্লাহ্ জানেন এবং তিনি ক্ষমা করেন।'' স্থরা অহজব। আঃ ৫১।

টিপ্পনী। আমাদের মনে হয় আল্লা মিঞা কিছু বাজীকরণ ঔষধের শিক্ষা মহম্মদ সাহেবকে দিলে মহম্মদ সাহেবের স্থবিধা হইত।

মহম্মদের ১৪ ভার্য্যা -
হজরতের নেকাহার বয়ান ফসলে॥
চৌদ্দ বিবি নেকা করে আপনি সকলে॥
পাঁচ বিবি হুজুরেতে ফউত পাইল॥
নয় বিবি জিন্দা রেখে রেহলৎ করিল॥

১ - খোদেজা, ২ - সদা, ৩ - আয়েসা, ৪ - হাফেজ্জা, ৫ - ওম্মা সোনেমা, ৬ - উম্মে হানি, ৭ - জোবেরিয়া, ৮ - স্থফিয়া, ৯ - জয়নাব, ১০ - ময়মুনা, ১১ - জৈনাব॥

দ্বাদশ বারেতে বিবি বড় নেকাহার।
বলি হালেকের নিজ ঘরে ছিলা তিনি।
বিবাহ করিলা ছিলা আপনি আপনি॥
তের এ বিবি বলি কান্ধার করেন।
নবিজী দিলেন তাঁরে তালাক বায়েন॥
চৌদ্দ বলি কোলাবের এক আওরত।
মদিনা তে নেকা করেন এ সব আওরত॥

"হে ইমানদারগণ। পয়গম্বরের বাড়ীতে প্রবেশ করিও না.....। তাঁহার স্ত্রীগণকে তাঁহার মৃত্যুর পর বিবাহ করিও না। ইহা আল্লাহ্‌র চক্ষে দুঃখদায়ক হইবে। তোমরা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ঐরূপ কাজ করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ এ সব দেখিতে পান।" স্বরা অহজব, আঃ ৫৩। ৫৪॥

৪৩। আজান। ইহাকে চলিত কথায় ডাক নামাজ কহে। প্রত্যেক নামাজের পূর্ব্বে কানে আঙ্গুল টিপিয়া ক্রন্দন স্বরে চিৎকার করিতে হয়। উহা নিম্নলিখিত রূপ।

আল্লাহ্‌ হো আকবর, আল্লাহ্‌ হো আকবর॥ ১॥ (দুইবার বক্তব্য)
আস্‌হাদো আনলা ইলাহা ইলাল্লাহ্‌॥ ২॥ (দুইবার বক্তব্য)
আস্‌হাদৌ আনলা মহম্মদুর রস্তুলাল্লাহ্‌॥ ৩॥ (দুইবার বক্তব্য)
হায়ালাস্‌সালাত, হায়ালাস্‌ সালাত॥ ৪॥ (একবার)
হায়ালাল ফালাহ্‌, হায়ালাল ফালাহ্‌॥ ৫॥ (একবার)
আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আকবর॥ ৬॥ (একবার)
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ মহম্মদুর রস্তুলাল্লাহ্‌॥ ৭॥ (একবার)

টিপ্পনী। (১) "আল্লাহ্‌ মহান আল্লাহ্‌ মহান্‌"। আল্লাহ্‌ যদি মহান তবে আল্লাহ্‌র নামে ১৪ শত বৎসরের ইতিহাস গুণ্ডামী ও বর্ব্বরতায় কলঙ্কিত কেন? কোন দুষ্ট পিশাচকে ঈশ্বর ও মহান বলিয়া প্রচার করা হইতেছে না তো?

(২) "আমি সাক্ষী দিতেছি - আল্লাহ্‌ ভিন্ন আল্লাহ্‌ নাই"। ইহাও মিথ্যা সাক্ষীর কথা। কারণ যাঁহারা কানে আঙ্গুল টিপিয়া করুণ ক্রন্দন করেন তাঁহারা কেহই আল্লাহ্‌কে দেখেন নাই।

(৩) "আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মহম্মদ ঈশ্বর প্রেরিত।" ইহাও মিথ্যুক সাক্ষীরই কথা। কারণ, যিনি চিৎকার করেন, তিনি ঈশ্বরকেও দেখেন নাই, মহম্মদকে প্রেরণ করিতেও দেখেন নাই।

(৪) "প্রার্থনায় এসো, প্রার্থনায় এসো।" অতগুলি মিথ্যা কথা না বলিয়া শুধু এই কথাটুকু থাকিলে আমাদের প্রতিবাদের কিছুই ছিল না।

(৫) "সৎকার্য্য করিতে এসো, সৎকার্য্য করিতে এসো।" প্রার্থনা নিশ্চয়ই সৎকার্য্য। কিন্তু ইহার বিষয়বস্তু সৎ হওয়া প্রয়োজন। আমরা বলি, তোমরা গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা কর।

(৬) "আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ্‌ মহান।" ঈশ্বর নিশ্চয়ই মহান কিন্তু একজন পিশাচকে মহান বলা যায় না।

(৭) "আল্লাহ্ ভিন্ন আল্লাহ্ নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।" ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ হইলে মহম্মদের চরিত্র বুদ্ধের মত পবিত্র ও মহান হইত। কাজেই চিৎকারকারীর প্রোপাগাণ্ডায় বিভ্রান্তগণকে ভক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

৪৪। কুরাণ ও স্বামী বিবেকানন্দজী।

যাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মের ঠিকেদারী করেন এবং যাঁহারা কুরাণবাদের সমালোচনা করিলে মাথা গরম করেন, তাঁহাদের জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য স্বামীজীর কুরাণ সম্বন্ধে স্বমত উদ্ধৃত করিতেছি।

"The more selfish a man, the more immoral he is. And so also with the race which is bound down to itself, has been the most cruel and the most wicked in the whole world. There has not been a religion that has clung to this dualism more than that founded by the Prophet of Arabia; and there has not been a religion which has shed so much blood and been so cruel to other men. In the Koran there is the doctrine that a man who does not believe these teachings should be killed; it is a mercy to kill him! And the surest way to get to heaven, where there are beautiful hooris and all sorts of sense-enjoyments is by killing these unbelievers. Think of the bloodshed there has been in consequence of such beliefs!"

("The Complete Works of Swami Vivekananda" Mayavati Edition part II page 350)

অনুবাদ্য। "মানুষ যতই স্বার্থপর হয়, ততই পাপের মাত্রা বাড়িতে থাকে। যেমন ব্যক্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটে, জাতি সম্বন্ধেও ইহা সেইরূপ প্রযোজ্য। যে জাতি স্বার্থপর, তাহা অপেক্ষা দুষ্ট জাতি পৃথিবীতে কুত্রাপি দেখা যায় না। মহম্মদ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে পাপ এবং স্বার্থের সমন্বয় যেরূপ ভাবে হইয়াছে এইরূপ কোন ধর্ম্মে দৃষ্ট হয় না। এই ধর্ম্ম যে পরিমাণ নরহত্যা এবং অন্য মানুষের উপর নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান করিয়াছে, অন্য কোনও ধর্ম্ম সেইরূপ করে নাই। কুরাণে উক্ত হইয়াছে যে যাহারা উহাদের ধর্ম্মমত বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে হত্যা করা উচিত, তাহাদিগকে হত্যা করাই ভগবানের কৃপা। অবিশ্বাসীদিগকে হত্যা করিলে নিশ্চিত স্বর্গপ্রাপ্তি, এবং এই স্বর্গে সুন্দরী হুরী বিচরণ করে, এবং সেখানে ইন্দ্রিয় ভোগের যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। এই বিশ্বাসের ফলে যে পৃথিবীতে কত রক্তপাত হইয়াছে তাহার কথা ভাবিয়া দেখুন।"

আমরা বলি, লক্ষ বৎসরেও মক্কাবাদীরা বদলাইবে না, যদি ইঁহারা পিশাচ উপাসনা ত্যাগ না করে। পৃথিবীতে অসুরবাদী ধর্ম্মের প্রয়োজন থাকিলে মহম্মদকে শ্রদ্ধা করা উচিত। ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজমের প্রধান গুরু যে মহম্মদ, এ কথা আমরা বলিয়াছি। যদি বিশ্ব ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজমকে শ্রদ্ধা করিতে পারে, তবে মহম্মদকে কেন শ্রদ্ধা করিবে না? আমরা মহম্মদকে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ দান করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাদ্যাতঙ্ক সমস্যা

ভারত ভাগ হইয়া যাইবার পর, এই অধ্যায়টা আর না দিলেও চলিত। কিন্তু আমরা অখণ্ডভারতে বিশ্বাসী, কাজেই অধ্যায়টা দেওয়া হইল। ইহা ইতিহাসকেও সাহায্য করিবে।

১। ইসলামবাদ আমাদের দেশে যত সব কুৎসিত সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, বাদ্যাতঙ্ক রোগ তাহাদের অন্যতম। হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাদ্যধ্বনি অত্যন্ত আবশ্যকীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান। এখন আইনই হইয়া গিয়াছে যে সব রাস্তার ধারে আল্লাহ্ মিঞার বাড়ী করা হইয়াছে সেখানে হিন্দুদের কোন শোভাযাত্রা যাইতে পারিবে না। এই নিয়ম অবশ্যই মহরমের বাজনা বা গাজী মিঞার বিবাহের বাজনার সময় কার্য্যকরী হয় না। সেই সময় আল্লাহ্র বাড়ীতে (মস্‌জিদে) দিনরাত বাজনা চলিলেও দোষের হয় না। তখন আল্লাহ্র বাড়ীর উপর দিয়া, ধার দিয়া, বা যে কোন রাস্তার উপর দিয়া যে কোন সময় অত্যন্ত বিরক্তিকর, নীরস বাজনা বাজিতে থাকিলেও আল্লাহ্ মিঞার শান্তি ভঙ্গ হয় না। মুসলমান শিশুদের লিঙ্গ বলি (খৎনা) সংস্কারের সময়ও মস্‌জিদে বাজনা হইয়া থাকে। যে সময় শিশুটি অত্যন্ত চিৎকার করিতে থাকে, সেই চিৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি ঢাকিয়া দিবার জন্য এইরূপ বাদ্যানুষ্ঠান শাস্ত্র সম্মত কিনা, উহা তাহারাই জানে। কিন্তু সেই সময়কার বাদ্যানুষ্ঠানে আল্লাহ্ মিঞার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, ইহা আমরা বহুদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি।

২। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়াই এই বাদ্যাতঙ্ক রোগ মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে এই রোগের শাখা প্রশাখাও গজাইয়াছে। এখন ছুতানাতা ধরিয়া হিন্দুদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ চলিয়াছে। কিন্তু মজার কথা. মহরমের বাজনায় এই রোগের নাম নিশানাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আইন এই বিদ্বেষ রোগকে প্রশ্রয় দিতেছে। যদি বাদ্যানুষ্ঠান ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধ তবে উহারা মহরমে, গাজী মিঞার বিবাহে ও লিঙ্গবলি উৎসবে বাজায় কেন?

৩। হিন্দুদের সন্ধ্যানুষ্ঠানের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সময় হিন্দুরা প্রতি ঘরে সন্ধ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সকাল বেলা সূর্য্যোদয় কালকে কেন্দ্র করিয়া আগে পিছে একদণ্ড করিয়া দুইদণ্ড কাল, মধ্যাহ্নে ১২ টার মধ্যে দুইদণ্ড, এবং সায়ং কালে সূর্য্যাস্তকে কেন্দ্র করিয়া দুইদণ্ডকাল সন্ধ্যোপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময়। নমাজের সময় হিন্দুর বাজনা যেমন আইন দ্বারা নিয়মিত করা হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ, সন্ধ্যোপাসনার কালে মুসলমানের আজানধ্বনি, মহরম ও গাজী মিঞার বাজনা নিষিদ্ধ করিতে হইবে। নমাজ

কালে বাজনা নিষিদ্ধ আইন কেবল হিন্দু বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। ইহার জবাবী আইন না হইলে ইহাতে বিদ্বেষ অতি বৃদ্ধি পাইবে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে চিৎকারের কোনই প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি না।

৪। মুসলমানেরা মহরম কালে মসজিদের মধ্যে কবরের মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে। তাজিয়ার মধ্যে দুইটা কবরের মূর্ত্তি থাকে। জল, ফুল, নৈবেদ্য, পানীয়, ধূপাদি দ্বারা উহার পূজা মসজিদের মধ্যে হইয়া থাকে। ইহাতে কোন যোগাঙ্গের অধ্যাত্ম অনুষ্ঠান নাই। ইহাতে মুসলমানদের কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু হিন্দুদের অধ্যাত্ম ও যোগানুষ্ঠান যুক্ত দুর্গাপূজা ও সুন্দর দুর্গামূর্ত্তি দেখিলে ইহারা বিদ্বেষে জ্বলিয়া ওঠে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা যে একটা কদাকার কবরের মূর্ত্তিতে ইহাদের বুৎপরস্তি হয় না!

৫। হিন্দু ধর্ম্ম কোন মূর্খ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মহাজ্ঞানী মুনিগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাদ্যধ্বনি তাঁহারাই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মূর্খগণকে বাদ্য বিদ্যার সূক্ষ্ম বিজ্ঞান বুঝাইতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা মাত্র। উন্নত স্তরের অনুভূতিতে সাধকের মন যখন একাগ্র হয় তখন এই একাগ্র হইবার মূলে যে বোধসুখ অন্তর্জগতে স্পন্দিত হইতে থাকে, বেদে এই চক্রাকার স্পন্দনপ্রবাহকে ছন্দঃ নাম দেওয়া হইয়াছে।

যাঁহারা বেদ পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন বেদমন্ত্রগুলি এক একটি অনুভূতি মাত্র। জ্ঞান জগতে এই জ্ঞানসম্পদ অনাদি ও অনন্ত জ্ঞানরূপে সদাই বিদ্যমান। এই জ্ঞান সম্বন্ধে সাধক যখন সংযোগ লাভ করেন, তখনই তিনি ঋষি হন। প্রত্যেকটি মন্ত্রের সঙ্গে ঐ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষির নাম ও অনুভূতিতে উহার স্পন্দনের যে ছন্দঃ উহা প্রত্যেকটি বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখ আছে। ছন্দঃ যখন একটা সুনির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞানে নাচিতে (স্পন্দিত) থাকে তখনই অনুভূতি গাঢ় হয় এবং মন একাগ্র ও সমাধিস্থ হয়। সেই জ্ঞানকে যখন ঋষিগণ মন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন, তখন উহার নাম হয় 'বেদ'। ইহা মোটেই কাল্পনিক বস্তু নহে। এই ছন্দো বিজ্ঞানের সূত্রেই হিন্দুদের সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান জড়িত। সন্ধ্যা, গ্রহণ, সংক্রান্তি, মহালয়া, দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি সময়ের সঙ্গে নানা প্রকার ছন্দো (প্রাকৃতিক) জড়িত আছে। ছন্দোকে যখন আমরা সুর তালের মধ্য দিয়া বৈখরীতে প্রকাশ করি তখন উহার নাম হয় ''গন্ধর্ব্ব বিদ্যা'' বা গানবাজনা। এই সুললিত বিদ্যায় বালক বৃদ্ধ সকলেই এমন কি বৃক্ষ পশু আদি পর্য্যন্ত সতেজ হইয়া থাকে; সকলেই ইহাতে আকৃষ্ট হয় ও একাগ্র হয়; কিন্তু ইহা আশ্চর্য্য ঘটনা যে অসুরবাদীরা ইহা সহ্য করিতে চায় না। তাহারা দেখে, তাহাদের জ্ঞানহীন আচরণ ইহা দ্বারা স্তব্ধ হইয়া যাইবে। তাই তাহারা বিদ্বেষে জ্বলিয়া উঠে। পূজা আদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ঋষিগণ মন একাগ্র ও সতেজ করিবার জন্য এবং সকল ভূতকে ও সকল জীবকে সাত্ত্বিকতার মধ্য দিয়া ছন্দঃ জ্ঞানের আনন্দ দিবার জন্য, পূজাদির অঙ্গরূপে বাদ্যাদির প্রয়োগ করিয়াছেন। পূজার বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন প্রকার তালে বাদ্যধ্বনি নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা অতীব দূরদর্শী ও বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মানুষ্ঠান। বালক বৃদ্ধ ইহাতে আনন্দে মজিয়া যায়। পশু পক্ষী বৃক্ষাদিও আনন্দ লাভ করে। কিন্তু অসুরেরা ইহাতে ভয় পায়। সুর তালের ছন্দঃবদ্ধ শব্দ উচ্চাঙ্গের ধ্বনিসাধনা ও উচ্চাঙ্গের সমাধির অভ্যাস - একই বস্তু। নিত্য বৈদিক সন্ধ্যানুষ্ঠান করুন ও ''ধ্রুপদ সাধনা'' করুন, বুঝিতে পারিবেন, এ সব সমাধিরই অনুষ্ঠান। মহরমের রুক্ষ বিরক্তিকর

ও নীরস বাজনা যাহাদের মনকে চঞ্চল করে না, তাহাদের মনকে সুশৃঙ্খল মধুর বাজনা চঞ্চল করিবে কেন? ইহার একমাত্র কারণ অসুরবাদ জ্ঞান চায় না।

৬। বাদ্যধ্বনি অসুরের তেজ নাশক বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। শক্তিপূজা অসুর নাশের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া বাদ্যধ্বনি হিন্দুদের শক্তিপূজায় অলঙ্ঘনীয় পূজাঙ্গ। শ্রীচণ্ডীতে আছে - "হিনস্তি দৈত্য তেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ। সা ঘণ্টা পাতুনো দেবি পাপেভ্যোনঃ সুতানিব॥" যে ঘণ্টার ধ্বনি দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া দৈত্যতেজ নাশ করে, হে দেবি সেই ঘণ্টা আমাদিগকে মায়ের সন্তানরক্ষার মত পাপ হইতে রক্ষা করুক॥ ১১।২৭॥ "স ঘোষাঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ" অর্থাৎ সেই ধ্বনি সকল ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় গণের হৃদয় সকল বিদীর্ণ করিয়াছিল। গীতা ১।১৯॥ অসুর নাশের জন্য শঙ্খ নির্ম্মাণ কল্পে মহর্ষি দধীচি অস্থিদান করিয়াছিলেন। বাদ্যধ্বনি মন একাগ্র ও সমাধিমুখী করে, ইহা মনকে ও বিশ্বের সমস্ত জীবকে আনন্দ দান করে ও সতেজ করে। ইহা পাপ নাশ করে। ইহা দৈত্য ও অসুরগণের তেজ নষ্ট করে এবং তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ করে। কাজেই অসুরবাদীরা ইহাতে জ্বলিয়া উঠিলেও শক্তিবাদীদের জন্য পূজায় বাদ্যধ্বনি অত্যন্ত পবিত্র অনুষ্ঠান। ইহা জ্ঞান বর্দ্ধক ও অসুরনাশক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাইবেলবাদ

১। বাইবেলকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। উহা আমাদের দেশেও প্রচারিত হইতে চলিয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর ধর্ম্মহীন নেতাদের ধারণা হইয়াছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্ম্ম থাকিবে না এবং মুসলমান ও খৃষ্টান রাজাগণ যে ভাবে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভাঙ্গিয়া ভারতকে ম্লেচ্ছ সভ্যতায় প্লাবিত দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উহা থাকিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে তাহাদের আরও সুবিধা এই যে, ভারতের মুসলমান ও খৃষ্টানদের ভোট ইহাদের অনুকূলে থাকিলে দলগত ভাবে ইহারাই দেশের শাসন ব্যবস্থার রক্ষক ও সুখ সুবিধার ভক্ষক থাকিতে পারিবেন। আমাদের ধারণা, মুসলমান ও খৃষ্টানগণকে এবার বৈদিক সংস্কৃতি দেওয়া প্রয়োজন। যাহাতে মুসলমান ও খৃষ্টানগণ নিজেদের ধর্ম্ম ও নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতির কথা জানিতে পারে এবং হিন্দুরা ম্লেচ্ছ ধর্ম্মের সব রহস্য বুঝিতে পারে এ জন্য এই অধ্যায় লিখিত হইল।

২। কুরাণে বাইবেলের সমর্থন আছে। কুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব ও শয়তানের গল্প বাইবেলেরই মত। লিঙ্গবলি সম্বন্ধে কুরাণবাদ ও বাইবেল একই নীতির সমর্থক। বাইবেল পড়িলে বুঝা যায় ইহুদি দেশে ও ইয়োরোপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কুরাণের আল্লাহ্ হুলা বীজের অপভ্রংশ। বাইবেলের গড্ আমাদের মতে "গণেশ" শব্দের কোন অপভ্রংশ শব্দ হইতে পারে। গণেশকে উচ্চারণ করিলে গড়েশ হয়। এই গড়েশই গড্। গড, গণ উভয়ই একার্থ বাচক শব্দ। ইহার অর্থ সাধারণ ও সমষ্টি। খৃষ্টানগণ ধীরে ধীরে গণেশবাদে ও নাস্তিকবাদে কেন চলিয়াছে উহার মূল ঐ বাইবেলের গড্ শব্দে বিদ্যমান। আমরা বলি গড্বাদে সমাজ চলে না। গণবাদ সমাজ বাদের একটা দিক মাত্র। বিস্তারিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখুন। যীশুর পূর্ব্বের গড্বাদ ও পরের গড্বাদ এক নহে। ইহা লইয়া আমরা কোন দার্শনিক নিয়মে যাইতে চাই না। কারণ বাইবেলের ধর্ম্মে ও সমাজবাদে কোন দার্শনিকতা নাই। পাঠক এতটাই জানিয়া রাখুন, প্রাচীন বাইবেলের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মত ছিল। এবং আধুনিক বাইবেলে একটু দুর্ব্বল ধর্ম্মের আভাস আছে। খৃষ্টানগণ যদি খৃষ্টবাদীই থাকিতে চান আমরা তাহাদিগকে নিজের প্রাচীন ধর্ম্মে ফিরাইবার জন্য বল প্রয়োগ করিব না। মুসলমানদের সম্বন্ধেও আমাদের কথা স্পষ্ট। তাহারা ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই ভারত ভাগ করিয়াছে ও ভারতের ভীষণ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইহাদের কর্ত্তব্য পাকিস্থানে চলিয়া যাওয়া। তাহারা যদি নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম্মে ফিরিয়া না আসিতে চায়, সেখানেও বল প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই। তবে ইহা অতীব সত্য কথা

যে দেশ ভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ বৎসর তাহারা যেসব বর্ব্বরতা ও কলিকাতা ও নোয়াখালির মত দুষ্কার্য্য করিয়াছে, ভারত সেই সব কথা ভুলিবে না। তাহাদিগকে কেহই ভাল চক্ষে দেখিবে না। এই সব বুঝিয়া তাহারা যদি চলিয়া যায়, অথবা প্রাচীন ধর্ম্মে ফিরিয়া আসে তবে সেটা তাহাদেরই অনুকূল হইবে।

৩। ''আরম্ভে গড্ স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবীর কোন আকার ছিল না। এবং উহা শূন্য ছিল। উহাতে গভীর অন্ধকার ছিল। গডের আত্মা জলের উপর বিচরণ করিতেছিলেন।'' জেনেসিস্ ভাগ ১। সূ ১।২॥

টিপ্পনী। পৃথিবীর নিশ্চয়ই কোন না কোন আকার ছিল। কাজেই আকার ছিল না এরূপ কথা বলা ভ্রান্ত কল্পনা। আলো ও অন্ধকার একই জ্যোতিঃ তত্ত্বের দুইটা দিক। আলো পৃথিবীর বিপরীত দিকে না আসিলে অন্ধকার হইতেই পারে না। সূর্য্য সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবী সৃষ্টির কল্পনা করিবার দরুণ এরূপ মিথ্যা কথা বলা হইয়াছে। আমরা জানি একটা মিথ্যাকথা ঢাকিবার জন্য শত মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন হয়।

৪। ''গড্ বলিলেন জলের মধ্যে আকাশ হউক। ইহা জলকে জল হইতে ভাগ করুক। এবং দ্বিতীয় দিন সকাল বিকাল হইল॥'' জিনিসিস্ ভাগ ১। সূ ৬।৮॥

টিপ্পনী। গড্ যখন জলের উপর বিচরণ করিতেছিলেন তখন কি আকাশ ছিল না? আগে জল ও পৃথিবী পরে আকাশের সৃষ্টি নাকি? আকাশ জল হইতে জলকে কি ভাবে ভাগ করিবে? আকাশ কি কোন নীল কাঁচের দেওয়াল না কি? এখানে একটি সূত্রে আকাশকে স্বর্গ বলা হইয়াছে। আকাশ যদি স্বর্গ হয় তবে স্বর্গ বলিয়া কোন পদার্থ নাই জানিতে হইবে। কারণ আকাশ তো আমাদের চারিদিকে বিদ্যমান। আকাশকে ঈশ্বরের বাড়ী মনে করা বা স্বর্গ বলা একটি বালকের দার্শনিকতা মাত্র।

৫। ''তাহার পর গড্ নিজের রূপে মানুষকে গড়িলেন। মানুষকে তিনি স্ত্রীপুরুষ রূপে গড়িলেন॥'' জেনিসিস্ ভাগ ১। সূ ২৭॥

টিপ্পনী। গড্ সত্যই কি মানুষ বিশেষ?

৬। ''মানুষকে মাটীর ধূলার দ্বারা প্রস্তুত করিলেন। উহার নাকের মধ্যে জীবন শ্বাস ফুঁকিয়া দিলেন। উহা জীবিত প্রায় প্রাণী প্রস্তুত হইল।'' জেনেসিস্ ভাগ ২। সূ ৭॥

টিপ্পনী। হিন্দু মতে জীবের শরীরে ২৪টি তত্ত্বের সমাবেশ আছে। আর উহা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক। কাজেই শুধু ধূলির দ্বারা প্রস্তুত বলিবার দরুণ মানুষকে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্ধ থাকিতে প্রেরণা দেওয়া হইল। এইরূপ কথাও বালকোচিত পরিকল্পনা বলিতে হইবে। কুরাণেও এইরূপ কথাই আছে।

৭। ''গড্ বলিলেন জ্ঞান বৃক্ষের ফল তুমি খাইও না। কারণ যে দিন তুমি ইহা খাইবে সেই দিনই নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে।'' জেনিসিস্ ভাগ ২। সূ ২১॥

টিপ্পনী। জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইলে আদম নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে না। কাজেই গড্ মিথ্যা কথা বলিলেন।

৮। শয়তান নারীকে বলিল - তুমি নিশ্চয়ই মরিবে না। গড্ ইহা ভাল ভাবেই জানেন, তুমি যদি ফল খাও তবে তোমার চক্ষু খুলিয়া যাইবে এবং তুমি ঈশ্বরের

সমকক্ষ জ্ঞানী হইবে এবং ভাল মন্দ সবই জানিতে পারিবে। জেনিসিস্ ভাগ ৩। সূ ৪।৫॥

টিপ্পনী। শয়তান যাহা বলিল সবই সত্য কথা। গড্ যাহা বলিলেন সবই মিথ্যা কথা। সত্যবাদিতা কি শয়তানের লক্ষণ? এবং মিথ্যাবাদিতা কি গডের লক্ষণ?

৯। স্ত্রী দেখিল, গাছটি দেখিতে উত্তম ছিল। সে ফল পাইল, ও স্বামীকে খাইতে দিল, সেও খাইল। গড্ সাপকে বলিলেন, যেহেতু তুই এইরূপ কাজ করিয়াছিস সেই হেতু তুই সকল জীবের মধ্যে শাপান্ত হইবি। নিজের পেটে ভর করিয়া চলিবি এবং সমস্ত জীবন তুই ধুলা আহার করিবি। তোর সঙ্গে নরনারীর এবং তোর বংশের সঙ্গে এই নরনারীর শত্রুতা থাকিবে। ওরা তোদের মাথা ভাঙ্গিবে। তোরা ওদের পায়ে কাম্ড়াইবি। গড্ নারীকে বলিলেন, তোর দুঃখ অনন্ত বৃদ্ধি করিব। তোর গর্ভে সন্তান দিব। অত্যন্ত কষ্টে তোর সন্তান জন্মিবে। তোর ভোগেচ্ছা তোর পতিতে থাকিবে সে তোর উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে। আদমকে গড্ বলিলেন, তুমি আমাকে অমান্য করিয়া স্ত্রীর কথায় বৃক্ষ ফল খাইয়াছিলে। যাহা খাইতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম। এই জন্য ভূমি তোর জন্য শাপিত হইল। সমস্ত জীবন তুই খাটিয়া খাইবি। ঐ বৃক্ষ তোর জন্য কাঁটা উৎপন্ন করিবে। আর তুই খাটিয়া খাইবি॥ জেনেসিস্ ভাগ ৩ সূ ৬।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮॥

টিপ্পনী। গড্ মিথ্যা কথা বলিলেন কেন? শয়তান তিনি সৃষ্টি করিলেন কেন? জ্ঞান বৃক্ষের ফল তিনি কাহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন? দেখা যায়, গড্ই এই ঘটনার জন্য বেশী দোষী কিন্তু সেজন্য তিনি অত্যন্ত ক্রোধী হইয়া উঠেন। এবং শাপ দিতে থাকেন। ইহাদ্বারা ন্যায়পরায়ণতা মোটেই প্রমাণিত হয় না। এরূপ যুক্তিহীন কাহিনী গড্ সম্বন্ধে কল্পনা করা অত্যন্ত অন্যায়। ইহাতে মানুষ অযৌক্তিক হইতে প্রশ্রয় পাইবে। জিজ্ঞাসা করি - পশু পক্ষীর প্রসব বেদনা হয় কেন? পশু পক্ষীদের জন্ম কেন হইল? মানুষ ভিন্ন অন্য জীবগণকেও ত সাপে কামড়ায়? ইহার কারণ কি? সাপ কি ধুলা খাইয়া বাঁচে? ইহা কিরূপ পাণ্ডিত্য?

১০। আব্রাহামের লিঙ্গ বলির ইতিহাস বলা যাইতেছে॥ জেনেসিস্ ১৭ সূ ৯।১০।১১। ১২।১৩।১৪॥

গড্ আব্রাহামকে বলিলেন, তুমি এবং তোমার বংশ পরম্পরা আমার এই নিয়মকে মান্য করিবে। ...ইহা এই যে...সকলের লিঙ্গের মাথা কাটিয়া দিতে হইবে। তুমি তোমার শরীর হইতে লিঙ্গের ছাল কর্ত্তন করিবে। ইহাই তোমার সঙ্গে আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। এই নিয়ম তোমার বংশ পরম্পরায় বিদ্যমান রাখিতে হইবে। ...যাহারা বংশের নয়, যাহাকে টাকা দিয়া খরিদ করা হইবে, যাহারা তোর ঘরে উৎপন্ন হইবে, যাহাদিগকে তোর টাকায় খরিদ করা হইবে, তাহাদের অবশ্যই লিঙ্গের ছাল কাটিয়া দিতে হইবে। আর এই নিয়ম তোমার বংশে সর্ব্বদা নিয়মের জন্য থাকিবে। আর যাহাদের লিঙ্গ কাটা হয় নাই সেই মানুষকেও নিজের লোকের মধ্য হইতে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যেহেতু সে আমারই নিযম ভঙ্গ করিয়াছে।

টিপ্পনী। এই লিঙ্গ কাটার নিয়মের লক্ষণ অত্যন্ত অযৌক্তিক কুৎসিত কাণ্ড বলিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান। গডের কি মাথা খারাপ হইয়াছিল যে, তিনি এইরূপ নিষ্ঠুর আদেশ দিতে আসিয়াছিলেন? তিনি কি সত্যই সমস্ত জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা? তবে

তিনি লিঙ্গের মাথাহীন মানুষ সৃষ্টি করিলেই পারিতেন? ইহা একেত কুৎসিত ভক্তি তাহার উপর নরহত্যার উপদেশ। গডের কি মাথা খারাপ নাকি? পিশাচ ভিন্ন লিঙ্গবলি কে চায়?

ইহুদীর দেশে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ক্ষতযুক্ত বা অঙ্গ-কর্ত্তিত লোকের বৈদিক সংস্কার হওয়ায় বাধা আছে। (অবশ্য ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেলে বৈদিক সংস্কার হইতে পারে)। এই বৈদিক সংস্কারকে বাধা দিবার জন্যই ইহুদী নবীগণ এই লিঙ্গকাটা সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন।

১১। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম পুরুষ আদম। নূহ্ এই বংশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইঁহার ঘটনার সাথে হিন্দুধর্ম্মের মৎস্যাবতারের প্লাবন ঘটনার মিল আছে। নূহ মনু শব্দের অপভ্রংশ শব্দ হইতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রমতে সাতজন ঋষি ও চারজন মনু মানব বংশের প্রবর্ত্তক। ভারতবর্ষের বংশাবলীর গোড়ায় সকলেই ঋষির নাম মানিয়া থাকে। কোন কোন বংশ মনুগণ হইতে ধরা হইয়া থাকে। যযাতির দুই পুত্রকে যবন করা হইয়াছিল। ইহারা ঋষি কিম্বা মনু বংশজ, ইহাতে সন্দেহ নাই। নূহ্ এর এক পুত্রের নাম যবন রাখা হইয়াছিল। নূহ্ এর বংশেই আব্রাহাম জন্মগ্রহণ করেন। আব্রাহাম্, যবন সকলেই নূহ্ এই বংশ পরম্পরার সন্তান। ব্রহ্ম ও ব্রহম্ শব্দ এক। ব্রহম্ শব্দই ব্রাহাম্। আব্রহ্ম শব্দ হয় তো ব্রহ্ম বিরুদ্ধবাদী লোককে বুঝায় অথবা ব্রহ্ম শব্দই মনু নূহ্ এর মত আব্রহ্মরূপে অপভ্রংশ হইয়া থাকিবে। এই আব্রাহাম্ই কুরাণের ইব্রাহীম। ইনি সর্ব্বতোভাবে বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও ইনিই প্রথম বৈদিক সংস্কারকে লিঙ্গবলি প্রবর্ত্তন করিয়া হস্তক্ষেপ করেন। নূহ্ যেমন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন আব্রাহাম প্রভৃতিকে সেইরূপ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি বলা যায় না। ইহারা সকলেই গরু ও মেষ পালক জাতীয় ব্যক্তি। মূহ্ কিন্তু রাজা ও ক্ষত্রিয় গুণে ভূষিত, প্রজা ও জীবপালক ও রক্ষক রাজা ছিলেন। বৈদিক সংস্কারে বালকের দশদিনে নাম করণ সংস্কার হয়। ক্ষতযুক্ত মানবের বৈদিক সংস্কার হয় না। আব্রাহাম ৮ম দিবসে শিশুর লিঙ্গবলি প্রবর্ত্তন দ্বারা বৈদিক সংস্কারে আঘাত দিলেন। এই লিঙ্গবলির কথা বাদ দিলেও আব্রাহাম যজ্ঞ, হোম, নৈবেদ্য, বলি, ধূপ, দীপাদির সহযোগে দেবতার উপাসনা করিতেন। হোম যজ্ঞ বলি নৈবেদ্য ধূপদীপ সহ পূজা হইলেই যে উহা ব্রহ্মোপাসনা হইবে এরূপ মনে করা ভুল। উপদেবতা ও পিতৃ উপাসনায়ও যজ্ঞ ও বলির বিধান আছে। লিঙ্গবলি যাঁহার আদেশে প্রবর্ত্তিত হয় তাঁহাকে আমরা উপদেবতা ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারি না। শিব মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া উপদেতার পূজা চলে, কিন্তু তা বলিয়া ব্রহ্মপূজা ও উপদেবতার পূজা এক নহে। আব্রাহাম এক উপদেবতা সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। সেই দেবতা তাঁহাকে দর্শন দিতেন এবং আব্রাহাম সেই দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি ও পূজাদি করিতেন।

১২। বৈদিক ধর্ম্মের ১০ বিধ সংস্কার বা ১৬শ সংস্কারই আসল বৈদিক ধর্ম্ম। বেদ উপদেবতা, পিতৃ, দেবতা, মহাপুরুষ, অবতার, সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম সব উপাসনাই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে স্বীকার করিয়াছেন। শিবমূর্ত্তিতে এসব পূজা উপাসনাই চলে। আব্রাহাম শিবমূর্ত্তি, দেবমূর্ত্তি, পূজা উপাসনা সবই মানিতেন, কিন্তু হস্তক্ষেপ করিলেন বৈদিক সংস্কারগুলির উপর। ভারতে যখন প্রথম যবনবাদ প্রবর্ত্তন হইয়া যবনবাদীগণকে বহিষ্কার করা হয় তখন তাহাদের নিকট হইতে উপাসনা কাড়িয়া লওয়া হয় নাই, কিন্তু কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, বেদাচার বা বৈদিক সংস্কার। আল্লাহ্ বা

গডের উপাসনা লইয়া আমাদের কোন আলোচনা বা সমালোচনা করিবার নাই, আমরা দেখিতেছি ধীরে ধীরে যবনবাদীগণ বৈদিক ধর্ম্ম ও আচার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শেষ কালে বর্ব্বরবাদীয় মক্কাবাদে পরিণত হয়। আমরা আমাদের দেশের গড্ ও আল্লাহ্ উপাসকগণকে বেদাচার এবং বৈদিক সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে বলি। আব্রাহামের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহুদিদেশের ধর্ম্মে বৈদিক সংস্কার ও বৈদিক ধর্ম্ম দুইই ছিল। আব্রাহামের পরও বৈদিক ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু ছিল না বেদাচার; বা বৈদিক সংস্কার বা ১০ বিধ সংস্কার। এই জন্যই আব্রাহামের নাম আব্রাহাম বা অব্রহ্মবাদী হইয়া থাকিবে। (ইহুদি ভাষায় আব্রাম অর্থে প্রথম পিতা এবং আব্রাহাম অর্থে বহুর জনক বুঝায়।) আব্রাহামই কুরাণের ইব্রাহীম। মক্কার শিবলিঙ্গের সঙ্গেও এই মহাপুরুষের নাম জড়িত আছে, মক্কায় ইঁহার যোগাসন আছে। লিঙ্গবলি প্রবর্ত্তন হেতু তাঁহাকে যবনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বলা যায়।

১৩। বাইবেলে শিবলিঙ্গ সূর্য্যমূর্ত্তি ও দেবমূর্ত্তি পূজার কথা আছে। দেখ, আদিপুস্তকে মূর্ত্তিস্থাপনা; পর্ব্ব ২৮, সূ ১৭ হইতে ২২॥ যজ্ঞবেদী স্থাপনা; আদিপুস্তক পর্ব্ব ১২, সূ ৭॥ পর্ব্ব ১৩, সূ ৪। ১৮॥ পর্ব্ব ২২, সূ ৯॥ পর্ব্ব ৩৪, সূ ২০॥ শিব মূর্ত্তি ও অভিষেকের কথা; পর্ব্ব ৩১, সূ ১৩॥ ঠাকুরদেবতার মূর্ত্তির কথা; পর্ব্ব ৩১, সূত্র ৩৩, ৩৪॥

ঐ উপদেবতাই পরবর্ত্তী কালে প্রাচীন ধর্ম্ম ভঙ্গ করিতে আদেশ দেন, লবীয় পুস্তক পর্ব্ব ১৯। সূ ৪ দেখো। আমরা ঐ গড্ নামক উপদেবতাকে জিজ্ঞাসা করি, এত পূজায়ও তোমার মধ্যে দেবত্ব আসিল না কেন? আমরা খৃষ্টান ও মুসলমানগণকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি সত্যই আব্রাহাম হইতে বেশী সাধু? আব্রাহামের ধর্ম্মে তোমরা কেন হস্তক্ষেপ করিয়াছ, বলিতে পার?

১৪। আর এই সকলেতেও যদি তোমরা আমার কথা না শোন, আমার বিপরীত আচরণ কর, তবে আমি ক্রোধে তোমাদের বিরুদ্ধ আচরণ করিব। এবং আমিই তোমাদের পাপপ্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ শাস্তি দিব। আর তোমরা আপন আপন পুত্রগণের মাংস ভক্ষণ করিবে ও আপন আপন কন্যাগণের মাংস ভক্ষণ করিবে। আর আমি তোমাদের উচ্চস্থল ভঙ্গ করিব। তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা নষ্ট করিব ও তোমাদের দেবতাদের শবের উপর তোমাদের শব ফেলিয়া দিব। এবং আমার প্রাণ তোমাদের ঘৃণা করিবে, আর আমি তোমাদের নগর সকল উৎসন্ন করিব, তোমাদের ধর্ম্মধাম সকল ধ্বংস করিব। লবীয় পুস্তক, পর্ব্ব ২৬॥ সূত্র ২৭ হইতে ৩১॥

টিপ্পনী। পরবর্ত্তী কালে মূর্ত্তিতোড়ক খৃষ্টগণ এবং মহম্মদ ও তাহার অনুচরগণসহ যে সব দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, সবই দেখিতেছি, অতিক্রোধী গডেরই কীর্ত্তি। আমরা প্রত্যেক খৃষ্টান ও মুসলমানকে বলি, তোমরা আব্রাহামের ধর্ম্ম; শিবপূজন, সূর্য্যপূজন, যজ্ঞ, অভিষেকআদিতে ধর্ম্ম সংস্কার কর। মন্দিরে যজ্ঞবেদী ও শিবমূর্ত্তি স্থাপনা কর। তোমরা ধর্ম্মের নামে যাহা করিতেছ উহা ধর্ম্ম নহে, উহা তোমাদের দুষ্কর্ম্ম ও পাপের লীলা মাত্র। তোমরা আব্রাহামের পূর্ব্বধর্ম্মের কথা ভাব। তাহাতে দেখিতে পাইবে, লিঙ্গ বলি নাই। এবং দেখিবে, উহা সম্পূর্ণরূপে বৈদিক ধর্ম্ম। আল্লাহ্র মত গড্ও একটী ক্রোধী উপদেবতা মাত্র।

১৫। যজ্ঞের জন্য, শাস্ত্রীয় ও শুদ্ধ নৈবেদ্য বস্তু ও শুদ্ধ অগ্নির কথাও বাইবেলে আছে। দেখো গণনা পুস্তক, পর্ব্ব ৩॥ সূ ৩।৪॥ পর্ব্ব ৬, সূ ১৪ হইতে ১৯॥ পর্ব্ব ৭, সূ ১০ হইতে ১৪॥

অনেক স্থলে গোবৎস ও গোবধের কথা আছে। ভারতবর্ষে বেদে গোমেধ যজ্ঞের কথা আছে; কিন্তু গোবধ পাপ বলিয়া, উহার অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়। খৃষ্টান ও মুসলমানগণের ইহা এখন বন্ধ করা কর্ত্তব্য। প্রদীপদানে দেবতার পূজার কথা বহুস্থানে বাইবেলে বিদ্যমান। দেখো গণনাপুস্তক, পর্ব্ব ৮॥ সূ ১।২॥

বাইবেলের ধর্ম্ম প্রথমটায় ভক্তিভাব পূর্ণ, কিন্তু পরে দেখা যায় উহাতে রণনীতি প্রবেশ করিতেছে।

১৬। আমরা গড্‌কে একজন উপদেবতা বলিয়াছি। আমাদের দেশে প্রেত উপাসক এবং উপদেবতা উপাসকদের মধ্যে উপদেবতার ভর বা অধিষ্ঠান হয়। বাইবেলের গড্‌ও ভক্তদের উপর ভর হইতেন। দেখো গণনাপুস্তক, পর্ব্ব ১১॥ সূ ২৫। ২৬॥

যে যীশুকে বাইবেলে ঈশ্বর পুত্র বলিয়াছে, তাঁহাকে কুরাণে একজন ফরিস্তার পুত্র বলিয়া অশেষ নিন্দা করিতেছে। কুরাণের এ বিষয়ে যুক্তি খণ্ডন করা যায় না। যিশুর মার সঙ্গে ফরিস্তা কি ভাবে প্রেম করেন, কি ভাবে গর্ভ করেন, উহার বিশদ আলোচনা কুরাণে রহিয়াছে। যে দেবতা আব্রাহাম ও তাঁহার বংশধরদের পূজা, যজ্ঞ ও ভক্তি, মূর্ত্তি অবলম্বনে গ্রহণ করিয়া এত প্রীত ছিলেন, সেই গড্‌ মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে মন দিলেন কেন? ঈশ্বর ব্যাপক ও মহান, যাহার যেমন ভক্তি, সে তেমন ভক্তি করিবে। মাটী, জল, বায়ু, আকাশ, গাছ, অগ্নি, পাথর, মূর্ত্তি, সবেই তিনি সমান ভাবে আছেন। মূর্ত্তির উপর গড্‌ বাবা শেষকালে খাপ্পা হইলেন কেন? আব্রাহামকে দিয়া যিনি মূর্ত্তি পূজা করাইলেন এবং সেই গড্‌ই পরবর্ত্তীকালে মূর্ত্তির নাম শুনিলে মাথা খারাপ করেন, ইহার কারণ কি? যীশু কি গডের পুত্র, না কি ঈশ্বর পুত্র অথবা ফরিস্তার পুত্র? ঈশ্বর যুবতী নারীর সঙ্গে প্রেম করিতে আসিলেন, ইহা কিরূপ কথা! দেবতা উপদেবতার দ্বারা একাজ কতকটা সম্ভব হইতে পারে।

১৭। আর ইস্রায়েল সন্তানগণ মিয়িনের সকল স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল এবং তাহাদের সমস্ত পশু, সমস্ত সম্পত্তি লুটিয়া লইল; আর তাহাদের সমস্ত নিবাস নগর ও ছাউনী পোড়াইয়া দিল। আর তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্য, এবং মনুষ্য কি পশু, সমস্ত ধৃত জীব, সঙ্গে লইয়া চলিল। গণনা পুস্তক, পর্ব্ব ৩১, সূ ৯॥

১৮। তোমরা এখন বালক বালিকাদের মধ্যে সমস্ত বালকগণকে বধ কর এবং শয়নে পুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত সমস্ত স্ত্রীলোকগণকে হত্যাকর; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহাদিগকে নিজের জন্য রক্ষা কর। গণনা পুস্তক, পর্ব্ব ৩১। সূ ১৭, ১৮॥

টিপ্পনী। ঈশ্বরের নামে কুরাণের মত লুণ্ঠন তো আছেই - অন্য দেশের দেবতা ও মন্দির ধ্বংসেরও আদেশের অভাব বাইবেলে নাই। নারী হত্যা, শিশু হত্যা, কোন পাপ যে বাইবেলে নাই ইহাই ভাবিবার কথা। ইহাকে পাপ পুস্তক বলিব কি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলিব।

১৯। ''তোমরা তাহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাদের যজ্ঞবেদী সকল উৎপাটন করিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া দিবে, তাহাদের আশেরা মূর্ত্তি সকল ছেদন করিবে এবং তাহাদের খোদিত প্রতিমা সকল অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে।'' দ্বিতীয় বিবরণ। পর্ব্ব ৭॥ সূত্র ৫॥

টিপ্পনী। ভিন্ন জাতীয় লোক যে ঈশ্বরের উপাসনা করে, যে যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞ করে, সেটার উপর গডের এত ক্রোধ কেন? ইহা কোন পিশাচের লক্ষণ, নাকি ঈশ্বর লক্ষণ?

২০। ''আপনাদের বিষয় সাবধান, পাছে তোমাদের হৃদয় ভ্রান্ত হয় এবং তোমরা আমার পথ ছাড়িয়া অন্য দেবগণের সেবা কর ও তাঁহাদের কাছে প্রণিপাত কর।'' দ্বিতীয় বিবরণ। পর্ব্ব ১১। সূ ১৬॥

টিপ্পনী। এক দেবতা অন্য দেবতার কথা আসে কোথা হইতে? বাইবেলের গড্ও আল্লাহ্ মিঞার মতই এক মতলবী ব্যক্তি। আল্লাহ্ মিঞা যেমন মহম্মদের মতলবের সাথী, গড্ও দেখা যাইতেছে মোশির মতলবের সাথী। যতভাবেই বিচার করা যায়, সব ভাবেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, গড্ একটি উপদেবতা এবং অন্যান্য উপদেবতার উপর ইঁহার বিদ্বেষ আছে। এবং ইহাতে ঈশ্বর লক্ষণ নাই।

২১। ''তোমরা যে যে জাতিকে অধিকার চ্যুত করিবে, তাহারা উচ্চ পর্ব্বতের উপরে, পাহাড়ের উপরে ও হরিৎবর্ণ প্রত্যেক বৃক্ষের তলে যে যে স্থানে আপন আপন দেবতার সেবা করিতেছে, সেই সকল স্থান তোমরা একেবারে বিনষ্ট করিবে।'' দ্বিতীয় পুস্তক, পর্ব্ব ১২। সূত্র ২॥

টিপ্পনী। কি ভাবে পৃথিবী হইতে হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত করা হইয়াছিল; পাঠক উহার প্রমাণ দেখুন। আমরা আল্লাহ্ মিঞা ও গড্কে বলিয়া রাখিতেছি, তোমরা যে ভাবে পৃথিবীকে সভ্যতাহীন করিয়া বর্ব্বর করিয়াছ তাহা হইতে অনেক সহজে আমরা তোমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খালি মন্দিরগুলিতে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব এবং পিশাচ উপাসকগণকে পবিত্র বেদবাদে সংস্কৃত করিব ও ওঁকার দীক্ষা দিয়া বর্ব্বরতা ও মূর্খতা নষ্ট করিয়া দিব।

২২। ''তোমরা আপন ঈশ্বরের প্রতি সেরূপ কিন্তু করিবে না। আপন আপন হোম, বলি, দশমাংশ, হস্তের উত্তোলনীয় উপহার, মানতের দ্রব্য, স্বইচ্ছায় দত্ত নৈবেদ্য ও গোমেষাদি, পালের প্রথম জাতদিগকে সেই স্থানে আনয়ন করিবে॥'' পর্ব্ব ১২॥ সূ ৪।৬॥

টিপ্পনী। দেখা যাইতেছে, বাইবেলের নবীরা অত্যন্ত অন্যায় ভাবে দেবতা ও ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্বেষের বীজ রোপণ করিতেছেন। আমাদের দেশের দেবপূজনের বর্ত্তমান বিধির সঙ্গে সেই সুদূর মধ্য প্রাচ্যে, ইহুদি দেশের প্রাচীন দেবপূজনের বিধি একই ছিল।

২৩। বাইবেলবাদে একটু চিন্তাশীলতা কয়েকটী যোহন বাক্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমরা তাঁহার প্রকাশিত স্বর্গ বিবরণ দিতেছি।

(ক) যোহন বাক্য - পর্ব্ব ২১। সূ ১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১॥ ''আর ঐ নগরকে মাপেন, ৭৫০ ক্রোশ। লম্বা, উঁচু ও চওড়া এক সমান। আর উহার ভিত্তিকে ...মাপেন কি ৪০ হাত ছিল। উহার ভিত্তির গাথুনি সূর্য্যকান্ত মণির ছিল। নগর নির্ম্মল সোনার প্রস্তুত ছিল, যাহা কাঁচের মত নির্ম্মল ছিল। আর নগরের ভিত্তির নেউগুলি প্রত্যেকটি বহুমূল্য

প্রস্তরে সুসজ্জিত ছিল। প্রথম নেউ সূর্য্যকান্তি মণির, দ্বিতীয় নীলমণির, তৃতীয় লালড়ির, চতুর্থ মরকতের, পঞ্চম গোমেদের, ষষ্ঠ মাণিক্যের, সপ্তম পীতমণির, অষ্টম পিরোজ মণির, নবম পোকরাজ মণির, দশম লহসনির, একাদশ ধূম্রকান্তের, দ্বাদশ মার্টিনের। আর দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশ মণির এক একটিতে প্রস্তুত ছিল। নগরের সড়ক স্বচ্ছ কাঁচের মত সোনার প্রস্তুত ছিল।''

টিপ্পনী। গড্ আকাশকে স্বর্গ করিয়াছেন, ইহা আমরা বাইবেলে দেখিতে পাই। শূন্য আকাশে এইরূপ লৌকিক বস্তু মণি মুক্তাদি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ অযৌক্তিক কল্পনার প্রশ্রয়। যদি বল, গডের মহিমায় উহা সম্ভব কিন্তু আকাশে ভিত্তির নেউ কাটা অপ্রয়োজনীয় মিথ্যার কল্পনা।

(খ) ''আপন আপন মাথার উপর সোণার মুকুট ছিল। সাত অগ্নি-দীওক সিংহাসনের সম্মুখে জ্বলিতে ছিল। ইহারা গডের সাত আত্মা। আর সিংহাসনের সম্মুখে কাঁচের সমুদ্র রহিয়াছে যাহা আগে পিছে অনেক নেত্র দ্বারা অবস্থিত।'' পর্ব্ব ৪, সূ ৪।৫।৬॥

টিপ্পনী। এসব মূর্ত্তি পূজার অনুষ্ঠান ছাড়া আর কি? তোমরা কোন সাহসে হিন্দুগণকে মূর্ত্তিপূজক বলিয়া অবজ্ঞা কর?

(গ) ''আর শাপভ্রষ্ট হইতে হইবে না। উহাতে গডের ও যিশুর সিংহাসন হইবে। যীশুর দাস উহার সেবা করিবে, আর ঈশ্বরের মুখ দেখিবে। আর উহার নাম উহার মাথার উপর থাকিবে। আর ঐখানে রাত হইবে না। উহাদের বাতির বা সূর্য্যের প্রয়োজন হইবে না। কারণ গড্ তাহাদিগকে জ্যোতি দিবেন। ইহারা সর্ব্বদা রাজ্য করিবেন॥'' পর্ব্ব ২২। সূ ৩।৪।৫॥

টিপ্পনী। রাজত্ব করিবেন কি দাসত্ব করিবেন? ইহা শূদ্রত্ব ছাড়া আর কি? স্বর্গে যাহারা যায় তাহারা সকলেই শূদ্র নাকি? তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সুবিধা কি? এইরূপ ''দাসোঽহম্'' ফিলোসফি আমাদের দেশেও শূদ্রদের জন্য আবিষ্কার করা হইয়াছিল। কুরাণে ও বাইবেলে উহাই বিদ্যমান।

২৪। যীশুর কয়েকটী উপদেশের কথা বলা যাইতেছে।

(ক) ''যাহারা আমাকে প্রভু প্রভু বলে তাহারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।'' মত্ত রচিত ইঞ্জিল, পর্ব্ব ৭। সূ ২১॥

টিপ্পনী। আমরা তো দেখিতে পাই যীশুর ভক্ত মাত্রই যীশুকে প্রভু বলিয়া ডাকে। তবে কি ইহাদের স্বর্গে প্রবেশ হইবে না? শূদ্রেরা স্বর্গে না গেলে সেখানকার শূদ্রবৃত্তি কিভাবে চলিবে?

(খ) ''সেদিন অনেকে আমাকে বলিবে, তখন আমি পরিষ্কার বলিয়া দিব, যে আমি তোমাকে কখনও জানি না। কু-কর্ম্মকারী আমার নিকট হইতে দূর হও।'' ম, ই, প ৭, সূ ২২।২৩॥

টিপ্পনী। যীশু কি স্বর্গের ঠিকাদার নাকি? পুরোহিতগণ শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করাইয়া পয়সা লয় ও লোককে স্বর্গে পাঠায়, কিন্তু যিশু তাহাদের চেয়েও বড় কথা বলিতেছেন ও ধমক দিতেছেন যে তিনি স্বর্গে প্রতিশোধ লইবেন। বাঃ রে মহাত্মা!

(গ) ''আর তখন প্রত্যেক মানুষকেই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়া হইবে॥'' ম ই, প ১৬, সূ ২৭॥

টিপ্পনী। স্বর্গে না হয় কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়া হইল বুঝিলাম। কিন্তু এই পৃথিবীতে যে অতি সুখী ও অতি দুঃখী আমরা দেখিতে পাই, ইহার জন্য দায়ী কে? তোমরা তো জন্মান্তর মান না। তোমাদের ঈশ্বর ত ফুঁকা দিয়া দিয়া সৃষ্টি করেন। তাঁহার এইরূপ অবিচার কেন? যিনি চোখের সামনে অবিচার করিতেছেন, তিনি যে স্বর্গে যে গেলে ইহাই করিবেন না তাহার প্রমাণ কি? আমরা এসব ছোট কথায় বিশ্বাস করি না। আসল কথা এসব খাম খেয়ালী কথা মাত্র। ঈশ্বরতত্ত্ব দর্শনকারীর কথা মোটেই নহে।

(ঘ) ''তখন সে তাহাদিগকে, যাহারা শিষ্য ভিন্ন অন্য লোক, হে শাপতপ্ত লোক সকল! তোমরা আমার নিকট হইতে অনন্ত আগুনে যাও। যাহা শয়তানের জন্য ও উহার চেলাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।'' ম, ই, প ২৫। সূ ৪১॥

টিপ্পনী। যীশুর শিষ্য ভিন্ন অন্য সকলকে শয়তানের চেলা বলা ও আগুনে পাঠানোর ধম্‌কানি একজন মহাত্মার উপযুক্ত কথা নহে। নিজেরা দার্শনিক জ্ঞানে অন্ধ থাকিয়া অন্যকে শয়তানের চেলা বলার সাহস অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে।

(ঙ) ''তখন শিষ্যের মধ্যে একজন, যাহার নাম ইহুদী ইসাক্, সে প্রধান যাজকের নিকটে গেল এবং কহিল, যে আমি যীশুকে আপনাদের হাতে ধরাইয়া দিব, কিন্তু আমাকে কি দেওয়া হইবে? তাঁহারা ৩০ টাকা দিবার যুক্তি করেন।'' ম, ই, প ২৬, সূ ১৪।১৫॥

টিপ্পনী :- এই সূত্র নিজেই (ঘ) সূত্রের মাহাত্ম্য ছিন্ন করিতেছে। ৩০ টাকার লোভে যীশুর একজন প্রধান শিষ্য যীশুর ফাঁসির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বর্গে ইনি যীশুর চেলার কন্‌সেসন্ পাইবেন ত? না - শয়তানের চেলার মত অগ্নিলাভ করিবে?

২৩। যীশুর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

(ক) ''ভোরের বেলা যখন বহম বাড়ীতে ফরিয়া যাইতেছিলেন সেই সময় তাঁহার ক্ষুধা পাইয়াছিল। পথে একটা ডুমুর বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া উহার নিকট যান। কিন্তু উহাতে কিছুই পাইলেন না। কেবল পাতা। আর উহাকে বলিলেন তোমাতে আর কখনও ফল লাগিবে না। ইহাতে ডুমুর গাছটা তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া গেল॥'' ম, ই, প ২১, সূ ১৮, ১৯॥

টিপ্পনী। গাছে ফল ছিল না বলিয়া গাছের কি দোষ হইল যে তিনি গাছটাকে শাপ দিলেন? ইহা কোন মহাত্মার লক্ষণ নহে।

(খ) ''তখন ভূতগ্রস্ত মনুষ্য কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া উহার সঙ্গে আসিয়া মিলিল। যাহারা সেইখানে অত্যন্ত ছিল, কি সে পথে যাইতে পারিত না। আর দেখ, উহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল - হে যীশু, গডের পুত্র, আপনার আমাদের দ্বারা কি কাজ? আপনি কি সময় হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য আসিয়াছেন? সেই ভূত সকল তাঁহার নিকট বিনয়পূর্ব্বক কহিল - যদি আপনি আমাদিগকে বাহির করিয়া দিতেছেন তো শূকরদল তাড়াইতে দিন। তিনি বলিলেন - যাও, তাড়াও। আর উহারা বাহির হইয়া আসিল ও শূকরের দলে পড়িল। আর দেখ - শূকরের সমস্ত ঝুণ্ড তীর

হইতে সমুদ্রের মধ্যে দৌড়াইয়া গেল এবং জলে ডুবিয়া মারা গেল॥" ম, ই, প ৮, সূ ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩॥

টিপ্পনী। এই ঘটনার দ্বারাও মহাপুরুষত্ব প্রমাণ হয় না। নির্দ্দোষ শূকরদের জীবন নাশ করা হইয়াছে। অলৌকিক শক্তি থাকিলেই সে মহাত্মা হয় না। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু তান্ত্রিকদের মধ্যে অনেক অলৌকিক শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগকে এদেশে কেহই মহাত্মা বলে না। এদেশে, অলৌকিক শক্তির আবরণ লাগাইয়া, একজনকে মহাপুরুষ দাঁড় করাইয়া যাহারা ধর্ম্মপ্রচার করে, তাহারা অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর ভণ্ড। আমরা জিজ্ঞাসা করি এসব কথার সত্যতা কি আছে? এসব কাহিনী মিথ্যাও তো হইতে পারে। এজন্য আমাদের দেশে জ্ঞান, যুক্তি, ত্যাগ, উদারতার ও দার্শনিকতার কথা যাঁহারা বলিয়াছেন তাঁহারাই মাত্র মহাপুরুষ। এইরূপ মহাত্মার জীবনে অলৌকিক ঘটনা থাকুক বা না থাকুক, আমরা উহা দেখিনা। যীশুর কথায় দার্শনিকতা ও যুক্তি একটা ফোটাও নাই। যে গ্রন্থের দার্শনিক অংশ যুক্তিহীন ও মিথ্যা কল্পনা, সে গ্রন্থের অলৌকিক শক্তির কাহিনী যে মিথ্যা হইবে না, ইহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? বাইবেল সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি মিথ্যা কথা সাজাইতে পারে, তবে যীশুকে মহাপুরুষ করিবার জন্য মিথ্যা কাহিনী কেন লিখিতে পারিবে না?

খৃষ্টবাদ ও রাজনীতি

২৪। "দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না, বরং যে তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারিবে তাহাকে বাম গাল ফিরাইয়া দাও।" মথি, পর্ব্ব ৫। সূ ৩৯॥

টিপ্পনী। যীশুর পূর্ব্বেকার ধর্ম্ম ও তাঁহার পরের ধর্ম্মে ভেদ আছে। দুর্ব্বলবাদকে, আমরা আমাদের সমাজ জীবন হইতে বহিষ্কার করিতে পারি না। কারণ, মানবের মনে উহার বিকাশ ক্ষেত্র রহিয়াছে। কেহ দুর্ব্বলবাদ, কেহ অসুরবাদ ও কেহ শক্তিবাদ অনুসরণ করিবে। কিন্তু সমাজ জীবনে, শক্তিবাদ ভিন্ন অন্য মতবাদ চলিতে দিলে উহার ফল ভাল হইবে না।

খৃষ্টর জন্মের প্রায় ৪০০ বৎসর পর মহম্মদ অসুরবাদীয় ভিত্তিতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। মহম্মদ খৃষ্টবাদের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। খৃষ্টবাদীরা মহম্মদীদের দ্বারা ভীষণ অত্যাচারিত হয়। খৃষ্টানরা নিজেদের ধর্ম্মকে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে আলগা করিতে বাধ্য হয়। তাহারা ধর্ম্মকে দুর্ব্বলস্তরে রাখিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিবার জন্য যে পথ গ্রহণ করে, তাহাতে উহা শক্তিবাদীয় সমাজ হইল না। তাহারা যদি বেদবাদীয় ও অধ্যাত্মবাদীয় সমাজ গড়িতেন তবে তাহাদের সমাজ বেশী শক্তিশালী হইত; কিন্তু উহা অসুরবাদীয় সমাজ হইত না। খৃষ্টানগণ ডেমোক্রেশীর দিকে ঝুকিয়া পড়েন। তাঁহারা মহম্মদী সমাজকে বেশ ভাল ভাবেই রুদ্ধ করিলেন, অনেক স্থানে ভীষণ রক্তাক্ত প্রতিশোধদানে মহম্মদী সমাজকে বহিষ্কারও করিলেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে এমন সব অসুরবাদের (ডেমোক্রেশী, কম্যুনিজম, সোসিয়ালিজম, ফ্যাসিজম) প্রতিষ্ঠা দিলেন যে নিজেরা মারামারী কাটাকাটির বীজ বপন করিলেন।

আজ দুইটি সাংঘাতিক রকমের অসুরবাদ ভারতকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। (১) ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিমে পাকিস্থান রাষ্ট্র হইয়াছে ও ভারতের মধ্যে ৪ কোটী পাকিস্থানবাদী রহিয়াছে। ইহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে বেদবাদ বিরুদ্ধ। (২) কম্যুনিজম ও ডেমোক্রেশী ভারতের বুকে আরও একটী অসুরবাদ। এ সব অসুরবাদ বাইবেলবাদীদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত অসুরবাদ। আমাদের দেশে, সেকুলারিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট ও প্রগতিবাদীরা সকলেই বাইবেলবাদীয় অসুরবাদীদের শিষ্য। ভারতের বুকে এই দুইটি অসুরবাদীরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। কিন্তু আশ্চর্য্য ঘটনা যে দুইটী মতবাদই ভারতীয় সংস্কৃতি ও বেদবাদের শত্রু।

ভারত নিজস্ব শক্তিবাদ (বেদবাদ) হারাইয়া বৌদ্ধবাদ, পৌরোহিত্য ও ভাববাদে জড়াইয়া যে ভুল করিয়াছিল উহার ফলে ভারত আজ দুইটা শক্তিশালী বর্ব্বরবাদে ঘেরিয়া গিয়াছে। আমরা অধ্যাত্মবাদীগণকে শক্তিবাদ প্রচারে একাগ্র হইতে বলি। আমরা ভারতকে বলি - খৃষ্টানদের ত্যক্ত উচ্ছিষ্ট অহিংসবাদ এবং খৃষ্টানিদের বহু সমস্যার কারণ ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজম ভারতের দুঃখ ও অনেক অমঙ্গল করিবে। মহম্মদবাদ, ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজম একমত হইয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আরও করিবে।

২৫। ''মানুষ কেবল রুটীতে বাঁচিবে না; কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয় তাহাতেই বাঁচিবে।'' মথি, পর্ব্ব ৪, সূ ৪॥

টিপ্পনী। মহাত্মা যীশু এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলিতে কি বুঝাইতে চাহেন আমরা উহা জানি না। আমাদের মতে ''বেদ বাক্যই'' ঈশ্বর বাক্য। মানুষ সত্য, প্রেম, শান্তি, যোগ, ভক্তি, অভয়, আত্মনিষ্ঠা প্রভৃতি উচ্চ দৈবীভাব আয়ত্ত করিবে এবং সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অসুরবাদকে দমনে রাখিবে। এই ভাবে সমাজ গঠিত হইলে এই পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি আসিবে। যীশুর এই বাক্যের অর্থ যদি দুর্ব্বলবাদে জড়াইয়া যাওয়া বুঝায়, তবে ইহাও বুঝিতে হইবে, দুর্ব্বল বাক্যের দিকে দৌড়াইয়া খৃষ্টানেরা মক্কাবাদী অসুরের বর্ব্বরতার সামনে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। মধ্য প্রাচ্য হইতে যে হিন্দুধর্ম্ম লুপ্ত হইয়াছিল, ইহার কারণ, উহাতে পৌরোহিত্যবাদ প্রবল ছিল। বৌদ্ধবাদ যে মধ্যপ্রাচ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়া ছিল, ইহার কারণ বৌদ্ধবাদ দুর্ব্বলবাদ বাছিয়া লইয়াছিল। ইয়োরোপ যে নিজেরা মারামারী ও কাটাকাটীতে জড়াইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীকে যে নিত্য নবীন সমস্যায় জড়াইয়া দিয়াছে, ইহার কারণ তাহারা অসুরবাদকে ভাঙ্গিতে যাইয়া শক্তিবাদ বাছিয়া লয় নাই। মধ্যপ্রাচ্য হইতে খৃষ্টানরা যে মার খাইয়াছে ইহার কারণ খৃষ্টানরা ঐ ''ঈশ্বরবাক্য'' অর্থে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

আমরাও বলি, পৃথিবী! তুমি রুটীর পিছনে দৌড়াইও না। শক্তিবাদের দিকে এসো। যাহারা প্রচার করে কম্যুনিষ্টরা ঈশ্বরহীন দেশে রুটী দিতেছে, আমরা তাহাদিগকে মিথ্যুক বলি।

আমাদের দেশের মূর্খ নেতাগণ রাজাদের উচ্ছেদ করিয়া কম্যুনিজম করিয়াছেন। প্রজাদের উহাতে রুটী বৃদ্ধি হইয়াছে কি ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়াছে, সেটা প্রজারা এখন নিত্যই বুঝিতে পারিবেন। জমিদার উচ্ছেদ করিয়া নেতারা অনেক স্থানে কম্যুনিজম করিয়াছেন; ফলে প্রজার দুঃখ অনন্ত গুণ বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে, কি প্রজার সুখ হইয়াছে তাহারও

প্রমাণ হইবে। যাহারা মনে করে, কম্যুনিজম দেশকে রুটী দিবে ও সচ্ছল করিবে, তাহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি, সমস্ত দেশকে না ডুবাইয়া দেশের একটু সামান্য স্থানে এই সব ধাপ্পাবাজীয় অর্থনীতি প্রয়োগ করুন এবং একবার ফলটা কি হয়, দেখুন। আমরা মূর্খ নেতাগণকে বলি, তোমরা শীঘ্র শিল্পপতিগণকেও উচ্ছেদ কেন করিতেছ না? আমরাও দেখি, গড্ ও গডের চেলারা দেবতা, না কি ডেভিল? যাঁহারা মনে করেন, শক্তিবাদীরা প্রগতিবাদের বিরোধী তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। আমরা কাউকেও বাধা দিব না। আমরা বহু বৎসর পূর্ব্বাবধিই মিথ্যুকদের চিনি। গীতায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে আসুর লক্ষণ এবং উহার ফলে মানবের দুঃখের কথা লিখিয়াছেন। তাহাতে কম্যুনিজমের কথা স্পষ্ট ভাষায় আছে। আমরা অধ্যাত্মবাদী, আমাদের দৃষ্টিকোণ অন্যরূপ। আমরা জানি, নারায়ণ (নরের মধ্যে যিনি ব্যাপক ভাবে আছেন) অনন্তরূপে ছোট বড় গরীব ধনীরূপ লইয়া সমাজকে পালন করেন। যাঁহারা বলেন ষ্টেট্ রুটী দিবে, তাঁহারা জনতাকে ধাপ্পা দিয়া গদীতে বসিবার জন্যই ঐ কথা বলেন। তাঁহারা জনতাকে রুটী দিবেন না, তাঁহারা দিবেন রেসনের দোকানে ৪ ঘণ্টা প্রতীক্ষায় আধপেট অখাদ্য ও অস্পৃশ্য খাদ্য। জনতা ঈশ্বরকে ভুলিয়া রুটীর ঠিকেদারগণকে ভোট দিয়া যে পাপ করিয়াছে, উহার প্রতিফল জনতা ভোগ করিবেই করিবে। অর্থবাদী অসুরগণকে পরাস্ত করিবার জন্য অন্নবাদী অসুর সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর মঙ্গল নাই। আমরা খৃষ্টবাদকে বলি, তোমরাই অদ্যকার পৃথিবীর এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী।

আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এক লক্ষ জনতায় ৩৫০ জনকে বাদ দিলে সকলেই ৪।০ কলার মানুষ। এই সাড়ে তিন শত লোকের মধ্যে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ষোড়শ কলার লোকগুলি পাওয়া যাইবে। যেখানে নারায়ণ এতগুলি কলায় বিকশিত, সেখানে ভোটবাদে ৪।০ কলাকে (সংখ্যাধিক্য) প্রশ্রয় দিলে ইহার ফল কি হইতে পারে? খাদ্য ও সৃষ্টি ভিন্ন এস্তরের মানবে উচ্চ দৈবীভাব কি থাকিতে পারে? ইহাদের যতই শিক্ষা দাও, ইহাদের বিকাশ কি করিয়া বৃদ্ধি হইবে? ইহারা পেটে আহার করিবে, বিশ্বস্ত ভাবে পরিশ্রম করিবে, সৃষ্টি ও সংসার দেখিবে। ইহার উপর যদি ইহাদের ঈশ্বর ভক্তি একটু ফোটে, তবেই ইহাদের জীবন সুখময়। একযুগে ধনীরা ইহাদিগকে রাজা ও জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করিয়া রাজগদী কাড়িয়া লইয়া বিশ্বশোষণে নামিয়াছিল। এ যুগে যুবকগণ ইহাদিগকে ধনী, শিল্পপতি, জমিদার, মহাজন, রাজা সকলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের উস্কানী দিয়া গদীতে বসিতে চায়। কাজেই খৃষ্টবাদ মানব সমাজের কোন কল্যাণের পথ দেয় নাই। এবং দিতেও পারে না। যাহারা মিথ্যা কথা বলে, যাহারা বিদ্বেষী, যাহারা আত্মা মানে না, পরলোক মানে না, তাহাকে কোন বিশ্বাসে ভোট দিব? যে বাপ মাকে সেবা করে না, অন্ন দেয় না, ধাপ্পা দিয়া ভদ্রলোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, পরে তাহার সহিত অসৎ ব্যবহার করে, এমন পশুর দলকে ভোট দিয়া দেশের মঙ্গল হইবে?

মহাত্মা যীশু "রুটী ও ঈশ্বর" বাক্যের পার্থক্য জানিতেন, কিন্তু তিনি শক্তিশালী সমাজের কথা জানিতেন না। এজন্য আজ খৃষ্টানজগৎ ধ্বংসের পথে ধাবমান। কাজেই সমাজে ও রাষ্ট্র গঠনে বেদবাক্যকে ভিত্তি করা প্রয়োজন। শক্তিবাদীয় উপাসনা, বংশগত বৃত্তির উৎকর্ষ, পঞ্চাইতিরাষ্ট্র, চার আশ্রমের পরিকল্পনা, বিশ্বের মঙ্গল করিতে সক্ষম।

খৃষ্টবাদ, দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ, মক্কাবাদ, ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজম বিশ্বের মঙ্গল করিবে না।

খৃষ্টবাদে কোন তত্ত্ব আছে বলিয়া যাঁহাদের ধারণা তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের মত দেখুন।

"খৃষ্টবাদ পরিকল্পিত স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে অতি-মানস-অবতরণ বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্মভাব এবং মানস পবিত্রতা দ্বারা তাহারা যাহা কিছু লাভ করিয়াছে, উহা পরিবর্ত্তনশীল জগতের জন্য আর খাপ খাইবার যোগ্য নহে। ইহাতে আধ্যাত্মিকতা অথবা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি নাই। ইহা, মানবের চরিত্রগত ভিত্তিকে ভিত্তি করিয়া যে সব মনোগত, শরীরগত ও জীবনগত সমস্যা দেখা দেয়, সবকেই উপেক্ষা করিয়াছে।" (Letters of Sree Aurobindo. p. 39)